শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায়

প্রীতিভাজনেষু

শেষ পর্য্যন্ত

—— ·:○:*:○:· ——

প্রথম পর্ব্ব

এক

ফাল্গুন মাস···সবে সন্ধ্যা হয়েছে···

ভবানীপুর বকুলবাগানে প্রকাণ্ড বাড়ী—বাড়ীর সঙ্গে লাগাও বাগান··· দোতলায় বসবার ঘর···টেবল্-অর্গানটা সত্য সারিয়ে অয়েল করিয়ে আনা হয়েছে···অবনী বসে অর্গান খুলেছে···দেখচে, ঠিক হয়েছে কিনা—ঘরে ঢুকলো বন্ধু হিমাদ্রি···

ঢুকেই হিমাদ্রি বললে—তবু ভালো, তোমার দেখা পেলুম! ভাবতে ভাবতে আসছি···দেখা পাবো কি না।

অবনী তাকালো তার পানে, বললে—এ-সময়ে আমার এখানে হঠাৎ! শুনছি, কদিন টালিগঞ্জের ষ্টুডিয়োয় যাচ্ছো!

নিশ্বাস ফেলে হিমাদ্রি বললে—হুঁ···মানে, হেমন্ত ধরে নিয়ে যায়··· হেমন্ত একখানা ছবিতে ভালো চান্স পেয়েছে···হীরো সাজছে!

অবনী বললে—হেমন্ত যেন সেজন্য যায়···কিন্তু তুমি?

হিমাদ্রি বললে—মানে, বন্ধু-লোক···ধরে নিয়ে যায়। বলে, আমার মোটর আছে···মোটরে গেলে ষ্টুডিয়োয় একটু খাতির। তা যাক, তোমার কাছে এলুম···কথা আছে!

—কি কথা ?

হিমাদ্রি বললে—কথা খুব সিরিয়স···হাসি-তামাসার নয়···মানে, ইট্ কনসার্নস্ মাই হার্ট ! তাহলেই বুঝছো, মাই লাইফ···মাই হোল্ এক্সিসটেন্স !

অবনী হাসলো···বললে—আবার কার প্রেমে পড়েছো বুঝি ?

ভ্রূ কুঞ্চিত করে হিমাদ্রি বললে—আবার মানে ? তুমি ভাবো···

বাধা দিয়ে অবনী বললে—যাক, এখনকার ব্যাপার বলো···কারেণ্ট ইস্যু !

হিমাদ্রি কি ভাবলো···তারপর বললে—আচ্ছা, বনশ্রী নামটা কেমন লাগে ?

অবনী চমকে উঠলো। সে বললে—বই লিখছো···বইয়ের নাম ?

—না, না। হঠাৎ বই লিখবো কেন ? বই নয়। মানে···

হেসে অবনী বললে—হৃদয়কুঞ্জ-বনশ্রী !

—আঃ! সব তাতে রঙ্গ ! সত্যি, অবনী···তোমার বুদ্ধির তারিফ করি···তাই দায়ে পড়ে তোমার কাছে আসি। আর তুমি···

—না, না, বলো। বনশ্রী কার নাম ?

হিমাদ্রি বললে—শোনোনি এ-নাম ? আশ্চর্য্য !

অবনী বললে—না·· দুনিয়ার তিনশো পঁয়ষট্টি লক্ষ নাম শুনিনি···এ-নাম শুনবো না, এতে আশ্চর্য্য হবার কি আছে !

হিমাদ্রি বললে—তুমি বলো···তুমি আর্টের একজন কনোশার···অথচ এ-নাম শোনোনি !

—না হে, না···শুনিনি। আর্টের আদর করি···আর্টিষ্ট নই তো ! বলো তুমি···

হিমাদ্রি বললে—নিউ এম্পায়ারে সেদিন ঐ ডান্স-রিসাইটাল্ হলো··· কৃষ্ণলীলা···তাতে বৃন্দা সেজে নেমেছিলেন এই বনশ্রী !

—ও···তা তিনি বুঝি সেই ষ্টেজ থেকে তোমার হৃদয়-মঞ্চে এসে উদয় হয়েছেন!

—তামাসা করো না। হিমাদ্রি বললে—তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছে। মাণিকের ওখানে পার্টি হয়েছিল শোয়ের দুদিন পরে···সেই পার্টিতে তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ!

—সে আলাপ বেড়ে এখন প্রলাপের সৃষ্টি করেছে!

ভ্রূ কুঞ্চিত করে হিমাদ্রি বললে—আঃ···মানে, আলাপ ভালোই হয়েছে এবং তোমার কাছে গোপন করবার দরকার নেই···তাঁকে আমি ভয়ানক রকম···

কথাটা হিমাদ্রি শেষ করবার আগেই অবনী বললে—ভালো বেসেছো!

—তাই! ছোট্ট এ জবাবটুকু দিতে হিমাদ্রির কাণের ডগাগুলো হলো টকটকে লাল।

—তারপর?

হিমাদ্রি বললে—তাঁকে আমি জানাতে চাই আমার হৃদয়ের কথা।

হেসে সুর করে অবনী বললে—

আমি হৃদয়ের কথা বলিতে ব্যাকুল—
শুধাইল না সে হায়।

—আঃ! হিমাদ্রি বললে—মানে, আমি ভাবছি, ওঁকে যদি একদিন লাঞ্চ কি ডিনার খেতে বলি···চৌরঙ্গীর সোয়ান কাফেতে?

—বলতে পারো।

—কোনো দোষ হবে না?

—খরচ করে তুমি খাওয়াবে, তিনি খাবেন—এতে দোষের কি আছে?

—আহাহা, তা নয়···তিনি রাগ করবেন না তো? মানে, আমার সঙ্গে দুদিনের আলাপ বৈ নয়!

—তা কি করে বলবো ভাই! অবনী বললে—শুনেছি…এঁদের মধ্যে কেউ কেউ এসব চান—লাঞ্চ, ডিনার, সিনেমা মোটর-ড্রাইভ…আবার কেউ কেউ একটু দাম বাড়ান। ইনি কোন্ টাইপের…তুমিই ভালো জানো।

হিমাদ্রি বললে—ধরো, না-হয়…তিনিও রাজী হলেন। তারপর ঐ সময়েই যদি বলি—বিবাহ!

—তোমার পরিচয় পেলে তিনি অরাজী হবেন বলে মনে হয় না। তুমি হলে স্যর বিদ্যুৎবরণের ভাইপো…সকলে জানে, স্যর বিদ্যুৎবরণ উইডোয়ার মানুষ…নিঃসন্তান…তুমি তাঁর একমাত্র ওয়ারীশন।

হিমাদ্রি কি ভাবলো। ভেবে একটা নিশ্বাস ফেলে সে বললে—হুঁ… তাও ভেবেছি। উনি হয়তো 'না' বলবেন না। কিন্তু কাকাবাবু…মানে, বনশ্রী হলেন মিত্তির…আর আমরা ব্রাহ্মণ…চাটুয্যে। কাকাবাবু এদিকে ধর্ম্মটর্ম্ম মানেন না…তা না মানলেও গলার পৈতে ছাড়েন নি এবং বামনাইগিরি আছে বেশ! কাকাবাবু এ-বিয়েতে রাজী হবেন না!

—হুঁ…তাহলে মুস্কিল! বিবাহ যদি করো…তাঁর সম্পত্তি থেকে হবে বঞ্চিত! তাতে…

—তাই না মুস্কিল! তবে সে-সম্বন্ধেও আমি ভেবেছি…

—কি? অবনী করলে প্রশ্ন।

অবনীর সঙ্গে হিমাদ্রির অনেকদিনের ভাব…দুজনে এক স্কুলের এক ক্লাশে পড়তো। হিমাদ্রির মা-বাপ মারা গেছেন…কাকা স্যর বিদ্যুৎবরণ বিপত্নীক…ছেলেমেয়ে নেই…হিমাদ্রিকে তিনি দেখেন নিজের ছেলের মতো। বিদ্যুৎবরণ মস্ত এঞ্জিনীয়ার—সারা ভারতবর্ষে বড় বড় কত সরকারী ইমারত গড়া হয়েছে তাঁর হেফাজতে…কাজ নিয়ে সারাজীবন মত্ত এবং এই কাজের মধ্যে স্ত্রী কখন টুক্ করে মারা গেলেন…বিদ্যুৎবরণ যেন তা

উপলব্ধি করতে পারেন নি! স্ত্রী বেঁচে থাকতে তাঁর দিন যেমন কাটতো··· স্ত্রীর মৃত্যুতে তার এতটুকু ব্যতিক্রম ঘটলো না। পাশ থেকে স্ত্রী সরে গেলে সব স্বামীই একটু বিচলিত হন···কিন্তু বিদ্যুৎবরণ বোধহয় এর একমাত্র এক্সেপশন! বয়স এখন ষাট···কলকাতা থেকে নড়েন না। মস্ত ফার্ম— সে ফার্মে হিমাদ্রিকে দিয়েছেন গুঁজে···তাকে দিয়ে শিবপুর থেকে ওভারশীয়ারি পাশ করিয়ে। হিমাদ্রি অফিসে যায়···কিন্তু কাজকর্ম্মের ধার ধারে না—কাজকর্ম্ম দেখেন বিনয়ভূষণবাবু। তিনিও এঞ্জিনীয়ার···এবং বহুকাল বিদ্যুৎবরণের কাছে কাজ করছেন।

হিমাদ্রি এককালে জমাতো; সিগারেটের প্যাকেটে আগে থাকতো বিলাতী এ্যাকট্রেশদের ছবি···সেই ছবি জমাতো—তার পর সাবানের বাক্সের কুপন জড়ো করে তার বদলে নিয়ে আসতো বিলাতী ফিল্মষ্টারদের ছবি এবং এখানকার থিয়েটারের আর ফিল্মের অভিনেত্রীদের ছবি··· অর্থাৎ আর্টের দাম না বুঝলেও এই সব আর্টিষ্টদের উপর তার মোহের সীমা-পরিসীমা ছিল না। এ নিয়ে অবনী তাকে কত ঠাট্টা-তামাসা করে—হিমাদ্রির মুখ রাঙা হয়ে ওঠে। তবু এ যে কি মোহ···

অবনীর প্রশ্নে হিমাদ্রি বললে—কাকাবাবুর একটা বাতিক দেখছি, সম্প্রতি যা কোনো কালে দেখিনি, ভাই! মানে, তিনি একালের উপন্যাস পেলেই পড়ছেন···বেশ মনোযোগ দিয়ে পড়ছেন!

অবনী প্রশ্ন করলে—বই লিখবেন না কি?

হিমাদ্রি বললে—না। মানে, বাড়ীতে আছেন আমার খুড়িমার এক বোন···বিধবা। সম্পর্কে খুড়িমার কি-রকম বোন···মালতী মাসি। তাঁর স্বামী মধুসূদনবাবু মারা গেছেন আজ পাঁচ বছর—তিনি ছিলেন ওভারশীয়ার·· কাকাবাবুর ফার্মেই কাজ করতেন। তিনি আর তাঁর এই স্ত্রী···

কাকাবাবুর বাড়ীতেই তাঁদের বাস···ছেলেমেয়ে নেই। মালতী মাসি সংসার দেখেন। সে-দেখায় মেহনৎ বা সময় এমন লাগে না। তিনি লাইব্রেরীর মেম্বার···রোজ দুখানা করে বাঙলা বই আসে তাঁর জন্য লাইব্রেরী থেকে··· তিনি পড়েন···চিরকাল দেখছি। সম্প্রতি দু-তিনমাস ধরে কাকাবাবুর কি খেয়াল হয়েছে···তিনিও সে বই পড়তে সুরু করেছেন। এ সব বই পড়া তাঁর একেবারে রুটিন···

এই পর্য্যন্ত বলে হিমাদ্রি চুপ করলে···অবনী বললে—তাতে কি এমন

তার কথা শেষ হবার আগেই হিমাদ্রি বললে—এসব উপন্যাসে ভালোবাসার কথাটাই আসল কথা···আর সে ভালোবাসার নাম হৃদয়ের আবেগ। এ আবেগ ব্রাহ্মণ-বদ্যি মানে না···আই-সি-এস কি স্কুল-মিষ্ট্রেশ বা নার্শ মানে না! আবেগ···শ্রেফ আবেগ! এ আবেগের কথা পড়ে পড়ে একদিন কাকাবাবু হঠাৎ খেতে খেতে বললেন, হুঁ··· এসব গল্পে যা লিখছে···সত্যি, মালতী। মনে-মনে মিলটাই হলো বিয়ের আসল উদ্দেশ্য। বললেন, আমাদের দেশে ঐ যে বাপ-মা বর-কনে পছন্দ করে···তার পর কোষ্ঠী দেখানো···বলেন, ওসবের মানে হয় না। অত করেও এই যে সব বিয়ে···তা স্বামী-স্ত্রী···কজন বলো, মনের সুখে ভালোবাসা সার করে বাস করছে! তাই মনে হয়, তোমাকে যদি··· ধরো, পরিচয় করিয়ে দিই···এই রকম কখানা উপন্যাস তুমি অবনী লিখছো। ধরো, ঐ স্বপন বিশ্বাস···তার কলম যা চলে···উঃ, মাসে একখানা করে তার উপন্যাস বেরোয়। পরশু কাকাবাবু পড়ছিলেন তার লেখা উপন্যাস— 'মন্ত্র নয়'! সেই বই পড়ে বললেন—খুব ঠিক কথা লিখেছে···হৃদয়ের আবেগ! বললেন—কি সব বাজে বই পড়েছিলেন ছেলেবেলায় বঙ্কিমবাবুর! জীবনটা মোটে এন্‌জয় করতে পারেন নি।

অবনী বললে—বটে ! তার পর ?

হিমাদ্রি বললে—তার পর···আমি ভাবছি, এই স্বপন বিশ্বাসের লেখা একখানা করে উপন্যাস ছেপে বার করছে মনোজ্ঞ সাহিত্য মন্দির—আমি দুখানা কিনে কাকাবাবুব ঘরের টেবিলে রেখে এসেছি···তাতে লিখেছি—বন্ধুবর হিমাদ্রিকে প্রীতি-উপহার। অর্থাৎ স্বপন বিশ্বাসেব সঙ্গে যেন আমার খুব বন্ধুত্ব—বই দুখানা সে আমাকে প্রেজেণ্ট দিয়েছে। আর সেই সঙ্গে ভেবেছি···

এই পর্য্যন্ত বলে হিমাদ্রি থামলো···থেমে অবনীর দিকে চেয়ে বললে—প্লট! বুঝলে···অর্থাৎ, তোমাকে নিয়ে গিয়ে কাকাবাবুর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবো···তুমি যেন স্বপন বিশ্বাস। তার পর কথায় কথায় ঐ হৃদয়ের আবেগ নিয়ে তুমি কথা তুলবে।

হিমাদ্রি যত বলছে, অবনীর মুখ-চোখ ততই ঘোরালো হয়ে উঠছে—সে যেন গোল্‌কধাঁধার মধ্যে প্রবেশ করছে···

হিমাদ্রি বললে—কি বলো!

অবনী তুললো ঝঙ্কার—পাগল! ফল্‌স্ পার্শনেশন! তারপর ?

—মোষ্ট হার্মলেস, ভাই! হিমাদ্রি দিলে জবাব। তাব কণ্ঠে মিনতি···

হিমাদ্রি বললে—আমার উপকারার্থে···অর্থাৎ তুমি এমনভাবে কথা কইবে যাতে কাকাবাবুর মত হয়···ঐ বনশ্রীর সঙ্গে আমার বিবাহে।

অবনীর মাথার মধ্যে যেন একরাশ বোল্‌তা বোঁ বোঁ শব্দে উড়ছে। অবনী ভেবে হদিশ পায় না এ প্লটের জোরে···

হিমাদ্রি বললে—লক্ষ্মী ভাই···তোমার মাথা খাসা! আর কিছু না হোক···একটু মজা!···তুমি আসবে আমার ওখানে···আমি কথায় কথায় পরিচয় করিয়ে দেবো···বলবো, কাকাবাবু, ইনি হলেন স্বপন বিশ্বাস···যাঁর লেখা নভেল তুমি পড়ছিলে!

নিশ্বাস ফেলে অবনী হাসলো···বললে—হুঁ·· দেখা যাক! কিন্তু···

বাধা দিয়ে হিমাদ্রি বললে—এতে কিন্তু নয় অবনী···ইউ মাষ্ট, মাই ফ্রেণ্ড!

দুই

তিনদিন পরে হিমাদ্রি এসে হাজির···অবনী বললে—কি খবর?

হিমাদ্রি বললে—ভালো!···মানে, তোমাকে যে-কথা বলে গিয়েছি, ভাই···কাকাবাবু কাল রাত্রে পড়ছিলেন ঐ স্বপন বিশ্বাসের লেখা বই—'পটের বিবি'! বইখানা কিনে তার টাইটেল-পেজে আর-একজনকে দিয়ে লিখিয়ে নিয়েছিলুম—প্রিয় বন্ধু হিমাদ্রিকে প্রীতি-উপহার—ইতি স্বপন বিশ্বাস।

অবনীর দু চোখে হাসির দীপ্তি! অবনী বললে—তারপর?

হিমাদ্রি বললে—কাকাবাবুকে দিলুম বিকেলে···বললুম, আপিসে এসেছিল স্বপন বিশ্বাস—তার নতুন বই বেরিয়েছে···আমাকে প্রেজেণ্ট দিতে এসেছিল। এ-কথা বলে দিলুম তাঁকে পড়তে!

—তারপর?

হিমাদ্রি বললে—তারপর আজ সকালে চা খেতে বসেছি···কাকাবাবুর সঙ্গে এক টেবিলে···কাকাবাবু বললেন, তোর বন্ধু এই সব বই লিখেছে? আমি বললুম—হ্যাঁ! কাকাবাবু বললেন—তোর বয়সী? আমি বললুম, হ্যাঁ। কাকাবাবু একটু চুপ করে রইলেন, তারপর বললেন, খাশা লেখে তো···মনে বেশ ঘা দেয়! তা, এ বন্ধু আসে না এখানে তোর কাছে? আমি বললুম, আসে বৈ কি···কচিৎ কখনো।···উপন্যাস লিখলেও পয়সাকড়ি আছে···ভ্যাগাবণ্ড টাইপ নয়! সাহস করে আরো বললুম, তাকে আপনি দেখেছেন কাকাবাবু···ছিপছিপে মানুষ···চেহারা ভালো! আলাপ করবেন? তাতে কাকাবাবু বললেন, কাল রাত্রে তাকে

এখানে খাবার নিমন্ত্রণ কর্। তাই তোমার আজ রাত্রে নিমন্ত্রণ আমাদের বাড়ী।

অবনী চমকে উঠলো! সে বললে—ভারী মজা তো! আমাকে অথর বলে চালাতে চাও! তারপর?

হেসে হিমাদ্রি বললে—পর আবার কি! তোমার যে রকম মাথা···

বাধা দিয়ে অবনী বললে—তা বলে অথর! তাও যে-সে অথর নয়··· নভেলিষ্ট! মানে, স্বপন বিশ্বাসের কোনো বই পড়িনি। আমাকে যদি জিজ্ঞাসা করেন···এই প্রেমমঞ্জরীর শেষটা অমন করলে কেন···তেমন করলে না কেন? তখন কি জবাব দেবো? যে-বই পড়িনি···সে-বইয়ের এগজামিন কোনো প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ দিতে পারে না···তা আমি!

হিমাদ্রি বললে—একটু কষ্ট করে একখানা অন্ততঃ পড়ো ভাই···ফর মাই সেক্!···আমি কিনে এনে দেবো।

মুখখানা বিকৃত করে অবনী বললে—যা বলেছো! আমি যার তার লেখা পড়তে পারি না—জানো তো! বিশেষ, এ-যুগের ঐ সব প্রগতি-পণ্ডিতদের লেখা। প্রথম কারণ, ওদের ভাষা বুঝি না। দ্বিতীয়ত, এমন যা-তা লিখে বসে···মাথা ধরে ওঠে ভাই—তা আমাকে নিরেটই বলো, আর ব্যাকডেটেডই বলো!···আমি যাবো না। তুমি গিয়ে বলো, স্বপন বিশ্বাস একটা লিটারারি মিটিং প্রিসাইড করতে গেছে সেই জামশেদপুরে!

হিমাদ্রির মুখ হলো মলিন···বেচারীর ভঙ্গীতে সে বললে—বনশ্রী দেবী! এইটুকু বলেই অবনীর দুখানা হাত সে ধরলো চেপে···বললে—তোমাকে পড়তে হবে না···আমিই ওর দুটো নভেলের প্লট তোমাকে বলবো। একখানা পড়েছি। আর যেখানা কাল কাকাবাবুকে কিনে দিয়েছি··· কাল রাত্রেই উনি সেটা পড়ে শেষ করেছেন। ওটা পড়ে ওর গল্পটাও

তোমাকে বলবো···বিফোর ইউ কাম টু আওয়ার প্লেস ইন দী ঈভনিং।

এর পর তার কি কাকুতি-মিনতি!

অবনীর নিস্তার নেই! অবনী বললে—কথায় বলে, মানুষ প্রেমে পড়লে তার জ্ঞানবুদ্ধি লোপ পায়···সেটা খুব সত্য কথা, দেখছি! নাহলে এমন উদ্‌ভুট্টে প্ল্যান তোমার মাথায় আসবে কেন!

একটা নিশ্বাস ফেলে হিমাদ্রি বললে—একটু স্পোর্টিং স্পিরিট···

বাধা দিয়ে অবনী বললে—কিন্তু যাকে এগজামিন দিতে হবে, তার সে স্পিরিট ঐ এগজামিনের নামে ড্যাম্প হয়ে থাকে—স্পিরিট খুলবে কেন, বলো।

হিমাদ্রি বললে···তার কণ্ঠে প্রচুর আবেগ···হিমাদ্রি বললে—আমার এ হলো জীবন-মরণ সমস্যা।·· বনশ্রী দেবীকে না পেলে আমার জীবন মিথ্যা হয়ে যাবে! আমি বাঁচবো না···বিশ্বাস করো!

কথার শেষের দিকে হিমাদ্রির কণ্ঠ হলো স্খলিত!

অবনী হতবাক! হিমাদ্রিকে সে জানে। জানে, হিমাদ্রি চলতে ফিরতে প্রেমে পড়ে। এর আগে চার বার···উঁহু, পাঁচ বার সে প্রেমে জর্জরিত হয়েছিল। প্রেমিকাকে পায়নি···না পেয়ে তার প্রাণত্যাগ ঘটেনি—দুদিন তিন দিন মুষড়ে থাকতো···তার পর আবার যেমন মানুষ···তেমনি! তাই তামাসা করে অবনী বলতো—তোমার প্রেমে পড়া···যেন ভাল্লুকের জ্বর হওয়া!

হিমাদ্রির স্খলিত কণ্ঠের বচন শুনে অবনী বললে—বনশ্রী দেবীকে নিয়ে তোমার এটা সিক্সথ্ এ্যাডভেঞ্চার, না? এর আগে আরো পাঁচ বার—সেই সেবারে নিউ এম্পায়ারে 'কৃষ্ণলীলা' প্লে দেখতে গিয়ে যে-মেয়েটি বৃন্দা সেজে নাচগান করেছিল···সেই যে হে, কি নামটা···হ্যাঁ হ্যাঁ···ললিতা মৈত্র। তার জন্য···

দু চোখে ছলছল ভাব···হিমাদ্রি বললে—সেটা চোখের নেশা···গ্ল্যামর··· এবারে তা নয়। এবারে···

—সত্যিকারের প্রেম···কেমন তো ?

—বিশ্বাস করো, ভাই। হিমাদ্রি আবার ধরলো অবনীর হাত চেপে··· বললে—জানো, কখনো যা করিনি···তাই···কাল রাত্রে আমি একটা কবিতা লিখেছি।

—বটে! কৈ, দেখি।

নিশ্বাস ফেলে হিমাদ্রি বার করলো পকেট থেকে ভাঁজ-করা চিঠির কাগজ; ভাঁজ খুলে কাগজখানা সে দিলে অবনীর হাতে। অবনী পড়লো—

তুমি আমার করেছো কি যে – বলি তা কারে !
তোমার ও মুখ ভাসে মোর মনে আলোয় আঁধারে !
জেগে দেখি মোর চোখের সুমুখে বনশ্রী দেবী।
ঘুমে চোখ বুজে স্বপনের ঘোরে তোমারে সেবি !

এমনি উচ্ছ্বাস চলেছে লাইনের পর লাইন বয়ে।

অবনীর ধৈর্য্য নেই। ক লাইন পড়ে কাগজখানা ফিরিয়ে দিয়ে সে যে দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো হিমাদ্রির দিকে···হিমাদ্রি সে-দৃষ্টির স্পর্শে শিউরে উঠলো। কোনো মতে বললে—কি দেখছো ?

অবনী বললে—এবারের চোট্‌টা একটু যেন বেশী মনে হচ্ছে !—তা···

হিমাদ্রি বললে—তোমার হাতে আমার জীবন···আর বেশী কি বলবো, যা বলেছি···আজ রাত্রে তোমাকে আসতেই হবে; এবং···

তার মুখের কথা লুফে নিয়ে অবনী বললে—হুঁ···বেশ! মোদ্দা ভুলো না···স্বপন বিশ্বাসের দুটো নভেলের কথা বলো···শোনবার পর তবে! নচেৎ, কিছু হবে না মোদ্দা।

—নিশ্চয়···এসে বলে যাবো!

অবনী সন্ধ্যার পরেই হিমাদ্রির ওখানে গিয়ে হাজির। খাওয়ার আয়োজনে বেশ সমারোহ···স্যর বিদ্যুৎবরণ অভ্যর্থনা করে বসালেন অবনীকে···বললেন—তোমরা দুই বন্ধুতে গল্পস্বল্প করো···আমার একটু বৈষয়িক কাজ বাকি···সেরে নি। মানে···

বিদ্যুৎবরণ মানেটুকুও বললেন। সে-মানে, তিনি রিটায়ার করে থাকলেও গভর্ন্মেণ্ট তাঁকে ছাড়ে না···এই যে নানাদিকে অদল-বদল, ভাঙ্গা-গড়ার প্ল্যান চলেছে···এসব ব্যাপারে তাঁকে ধরে গভর্ণমেণ্ট—সময় করে অমুক জায়গায় যে বাঁধ তৈরী হচ্ছে···একটিবার দেখে আসা··· স্যর বিদ্যুৎবরণ বললেন—অবশ্য এর জন্য মোটা টাকা দেয় গভর্ণমেণ্ট··· কিন্তু টাকায় তাঁর আর রুচি নেই। যে-টাকা করেছেন···তার উপর বয়স হয়েছে···এদিকে শক্ত-সমর্থ হলে কি হবে, বয়সটা তো···তা কথা আছে···লক্ষ্মী যেচে যদি আসতে চান, তাঁকে নিষেধ করা উচিত নয়। দেশের কাজ···তাছাড়া তাঁর বাসনা আছে, বেশ কিছু টাকা তিনি দিয়ে যাবেন···পল্লী-অঞ্চলকে সুচারু ছাঁদে গড়ে তোলবার জন্য···ইত্যাদি।

অর্থাৎ বুড়ো বয়সে মানুষের স্বভাব যা হয়···বেশী বকা, তাই। এবং যাঁরা কৃতী পুরুষ, তাঁদের মুখে ভবিষ্যতের কথা সগর্ব্বে যেমন উৎসারিত হতে থাকে···স্যর বিদ্যুৎবরণের বেলায় তার ব্যতিক্রম ঘটে না! দুই বন্ধুকে এক ঘরে রেখে স্যর বিদ্যুৎবরণ গিয়ে ঢুকলেন তাঁর অফিস-কামরায় ···সেখানে সরকারী দু-চারজন অফিসার···দুজন উপমন্ত্রী তাঁর জন্য উন্মুখ হয়ে বসে আছেন। তাঁদের হাতে মোটা-মোটা ফাইল···রাজকার্য্য-সম্পাদন!

দুই বন্ধুতে একথা-ওকথা···

অবনী বললে—বনশ্রী দেবীকে ডিনার খাওয়ানো হলো?

নিশ্বাস ফেলে হিমাদ্রি বললে—বলেছিলুম। কিন্তু···

—কিন্তু…মানে ?

হিমাদ্রি বললে—মানে, ওয়েলেশলি ষ্ট্রীটে ঐ ব্লু-আইল্ রেঁস্তরা…ওখানে বাঙালীর তেমন ভিড় নেই তো—ওখানে নিমন্ত্রণ করেছিলুম। নিমন্ত্রণ এ্যাকসেপ্ট করেছিল…তারপর যেদিন খাবার কথা, বিকেলে আমার অফিসে ফোন…বললে, হিমাদ্রিবাবু ক্ষমা করবেন…একটা রিহার্শালের ব্যাপার… রাত দশটা-এগারোটা বেজে যাবে। আজকের এনগেজমেণ্ট দয়া করে ক্যান্সেল করুন…সামনের হপ্তার যে-দিন বলবেন…

—সে-দিন ঠিক করেছো ?

—করেছি। পরশু খাবার কথা আছে !

অবনী বললে—তাহলে এমন বিমলিন কেন, বন্ধু ? জানো তো, দীনবন্ধু মিত্তির কি বলে গেছেন ?

—কি ?

—তিনি বলে গেছেন—তুফানে পড়েছো, তবু ছাড়িয়ো না হাল—
আজিকে না হলো যদি, হতে পারে কাল !

হিমাদ্রি তবু নিশ্বাস ফেললো, বললে—কিন্তু…

অবনী খ্যাঁক করে উঠলো—আরে, আবার বলে, কিন্তু ! এখনো কিন্তু কিসের ? পরশু তো আসন্ন !

হিমাদ্রি বললে—এ কদিন একটিবার meet করতে পারছি না ভাই… সেই চুলোর রিহার্শাল নিয়ে মেতে আছে ! কে জানে, পরশুর কথা মনে আছে কি না।

—একটা চিঠি লিখে মনে করিয়ে দাও !

—যা বলেছো ! একথা আমার মনে হয়নি !

অবনী বললে—এখনি লেখো…আমার সামনে। শুভকাজে দেরী নয় …নিয়ে এসো কাগজ-কলম।

—আনবো?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ।

হিমাদ্রি নিয়ে এলো তার ছাপানো প্যাড, খাম…এবং ফাউণ্টেন পেন …এনে অবনীর সামনে বসে বললে—কি লিখবো…তুমি বলে দাও। বেশ ডিগনিফায়েড হয় যেন…ভিখিরীর মিনতি নয়।

অবনী হাসলো…হেসে বললে—আমাকে ড্রাফ্ট্ করে দিতে হবে! তুমি হাসালে হিমাদ্রি! তারপর ডিনারে বসে কি করে অন্তর নিবেদন করবে, তাও আমাকে বাৎলে দিতে হবে! কি তবে তোমার প্রেম?

হিমাদ্রি বললে—অপরকে এ বিষয়ে উপদেশ দেওয়া সহজ…কিন্তু নিজের বেলায়…

অবনী বললে—এত কাব্য নাটক উপন্যাস…কি তবে পড়লে এতকাল, যদি প্রেম-নিবেদনের কায়দা তাতে না রপ্ত হলো! রবীন্দ্রনাথের সেই কবিতা…আমি হবো তব মালাকর…

হিমাদ্রি বললে—কি সব বাজে কথা! বলো, কি লিখবো?

এ-কথা বলে প্যাড খুলে কলমটা হিমাদ্রি বাগিয়ে ধরলো।

অবনী দু-মিনিট ভাবলো, তারপর বললে—লেখো—মাননীয়াসু…

হিমাদ্রি লিখবে, বাধা দিয়ে অবনী বললে—রোসো…মাননীয়াসু লিখবে? যার নাম…হাই পেডেষ্টালে চড়িয়ে! উঁহু।

হিমাদ্রি বললে—তাহলে কি লিখবো?…হুট্ করে প্রিয়তমাসু লেখাটা…

—ধ্রেৎ! এমন হেষ্টি হওয়া চলে কখনো! উঁহু—নাও…ঐ মাননীয়াসুই লেখো।

হিমাদ্রি লিখলো…মাননীয়াসু…লিখে তাকালো অবনীর দিকে…বললে —তারপর?

অবনী বললে—লেখো···আপনার মনে আছে নিশ্চয়, আগামী পরশু তারিখে ব্লু-আইল্ রেস্তরায় ডিনারের এনগেজমেণ্ট। আমি আয়োজন করেছি—আশা করি, এবারে আপনার অসুবিধা হবে না। আমি বরং রাত আটটায় আপনার ওখানে গাড়ী নিয়ে যাবো এবং সেই গাড়ীতে করে ব্লু-আইল্!···দয়া করে আমার অফিসে কাল যদি ফোন করে জানিয়ে দেন, কৃতার্থ হবো। ইতি—

হিমাদ্রি লিখলো ডিকটেশন···তারপর বললে—যদি ফোন না করে?

—হুঁ···তার চেয়ে চিঠিখানা নিয়ে কাল ভোরেই তুমি যাও ওঁর ওখানে—ভোরে দেখা পাবে নিশ্চয়···

ঝাঁজালো কণ্ঠে অবনী বললে—সব তাতে তোমার কিন্তু! এত কিন্তু যার মনে···তার দ্বারা···নো গুড! আরে···নান বাট দী ব্রেভ—একথা ভুলো না। যা বললুম···করো—এ ছাড়া নান্য পন্থা বিদ্যতে অয়নায়!

ঘড়িতে সাড়ে আটটা···বেয়ারা এসে জানালো—সাব্ সেলাম দিয়েছেন।

দুজনে উঠলো···এলো খানা-কামরায়!

তিন

ভূরি-ভোজের আয়োজন···দেশী-বিলাতী মেশানো···

টেবিলে বসে খাওয়া···পরিবেষণ করছে উর্দ্দি-পরা একজন বেয়ারা এবং সুপারভিশনে আছেন মহিলা···সরুপাড় ধুতি-পরা···হাতে গহনা নেই···শুভ্র-বেশিনী বিধবা···বয়স ত্রিশ-বত্রিশ বছর···অবনী বুঝলো, ইনিই হিমাদ্রির মালতী মাসী···এঁর চার্জ্জে সংসার!

প্রথমেই স্যুপ্…বিদ্যুৎবরণ বললেন—আমার এখানে দেশী-বিলাতী খাবারের যা সেরা, তাই গ্রহণ করি! স্যুপটা যেমন মুখরোচক, তেমনি উপকারী…বুঝলে স্বপন। তুমি মস্ত লেখক হলেও হিমির বন্ধু…কাজেই আপনি-মশায় বলে খাতির করবো না, তুমি বলবো—বুঝলে!

স্বপন-নাম শুনে অবনী প্রথমে চমকে উঠেছিল…সঙ্গে সঙ্গে ধাতস্থ হলো! ঠিক…সে অবনী নয়…স্বপন বিশ্বাস…ঐসব আজগুবি নভেলের লেখক স্বপন বিশ্বাস!

অবনী বললে—আজ্ঞে, নিশ্চয়…আপনি যদি আপনি-মশায় বলেন, তাহলে আমার নরকেও স্থান হবে না।

—হা হা হা…উচ্চহাস্য করে বিদ্যুৎবরণ বললেন—নরকেও স্থান হবে না! খাশা বলেছো…তা বলবেই তো! লেখক মানুষ…তোমাদের মুখে বড় বড় কথা বেরুবে না তো কি আমরা বলবো বড় বড় কথা! হা হা হা… নরকেও স্থান হবে না! নরক! আচ্ছা…এ নরক সত্যই আছে, না…

অবনী বললে—আছে কি না, জানি না। তবে লেখায় লেখায় নরক চলে আসছে সেই আদিযুগ থেকে! আমরা বলি, নরক…য়ুরোপীয়ানরা বলে হেল…মুসলমানরা বলে জাহান্নম।

বিদ্যুৎবরণ আবার উচ্চ হাস্যরোল তুললেন…বললেন—নরক…হেল… জাহান্নম!…কেমন জায়গা, কেউ জানে না…তবু চলে আসছে লেখায় লেখায়…আদি যুগ থেকে…ঠিক!

কথার সঙ্গে সঙ্গে খাওয়া চলেছে।

স্যুপের প্লেট নিঃশেষ হলো। সে-প্লেট সরিয়ে বয় ধরে দিলে ডিশ এবং ছোট প্লেট, বাটি।

মাসিমা বললেন—পোলাও দাও…তার পর ডাল…মাছের ফ্রাই…

বয় নিয়ে এলো।

বিদ্যুৎবরণ বললেন—এসব বাবুর্চির রান্না নয়…রেঁধেছেন ইনি… মালতী। খাশা রান্না করেন। দেশী রান্না বলো, বিলাতী বলো…তার উপর সন্দেশ, বোঁদে, গজা, খাজা, কেক, পেষ্ট্রি…এভরিথিং। এবং আচার যা তৈরী করেন…ওলের আচার, ফুলকপির আচার…মায় এঁচোড়ের আচার পর্য্যন্ত! খেয়েছো কখনো হে ওলের আচার…এঁচোড়ের আচার…স্বপনবাবু!

বিনীত হাস্যে অবনী বললে—আজ্ঞে না! ওলের আচার…তাও হয়!

—আলবত হয়! বলেই তিনি তাকালেন মালতী দেবীর দিকে… বললেন—দিয়ো মালতী…একটু একটু স্যাম্পল…তোমার হাতের তৈরী যত আচার আছে।

মাথা নেড়ে মালতী বললে—দেবো।

খাওয়া চলেছে…বিদ্যুৎবরণের বয়স হলে কি হবে…তিনি খাচ্ছেন সকলের চেয়ে বেশী বেশী।

খেতে খেতে তিনি বলছেন—লজ্জা করো না স্বপনবাবু…এ-বয়সে যত পারবে, খাবে—লোড ইয়োরসেল্‌ফ্‌ টু ফুল—তবেই তো দীর্ঘজীবন লাভ করবে। যারা খায় না…তারা চট্ করে টেঁশে যায়!

ডিশের পর ডিশ…বিদ্যুৎবরণ পাড়লেন সাহিত্যের কথা। তিনি বললেন—হিমি তোমাকে বলেছে বোধ হয়…তোমার লেখা উপন্যাস আমি পড়ছি এখন…যাকে বলে গোগ্রাসে। রোজ একখানা করে পড়ে শেষ করছি। খাশা লেখা…লেখার তেজ আছে—কোনো কিছুর পরোয়া করো না…তোয়াক্কা করো না। আশ্চর্য্য হই! এই তো তোমার বয়স… এত বই কি করে লেখো! কখন লেখো!

হিমাদ্রি বলে উঠলো—বাপের পয়সা-কড়ি আছে…কাজকর্ম্ম করতে হয় না…শুধু বসে বসে উপন্যাস লেখে।

—বটে! ও…হ্যাঁ, একেই বলে লেখা! বিদ্যুৎবরণ বললেন—

ছেলেবেলায় কবে পড়তুম বাঙলা উপন্যাস···বঙ্কিমবাবুর লেখা···সে কি বই! সেই যে ফষ্টার সাহেব···সূর্য্যমুখী···সূর্য্যমুখী বাড়ী থেকে পালিয়ে যেতে ফষ্টার সাহেবের হাতে পড়ে···তার পর কাপালিক করে তাকে উদ্ধার···সে সব ঐ পড়তুমই! প্রাণে তেমন··বুঝলে কিনা···কাপালিক যখন প্রতাপকে কাটতে যাচ্ছে, তখনো বুক কাঁপেনি···মনে হতো, গল্প পড়ছি···এর সব মিথ্যা। কিন্তু তোমার লেখা উপন্যাস ··ঐ যে কাল রাত্রে মালতী পড়ে পড়ে শোনাচ্ছিলেন···হ্যাঁ, আমি নিজে পড়ি না···পড়তে পারি না···মালতী পড়ে পড়ে শোনান্·· অলমোষ্ট এ সেক্রেটারি—বুঝলে স্বপনবাবু ··ঐ যে গো···কি বইখানা—আহা নামটা মনে পড়ছে না! বলো তো মালতী!

মালতী চাইলো বিদ্যুৎবরণের দিকে···বললে—কাল রাত্রে! ও··· হ্যাঁ···সে বইয়ের নাম 'বস্তীবাসিনী'!

—ও···হ্যাঁ! বিদ্যুৎবরণ বললেন—বস্তীবাসিনী! তা বইয়ের এমন কটমট নাম দাও কেন গো? নাম···হুঁ···বঙ্কিমবাবু দিতেন ভালো। সেই যে বিষবৃক্ষ···গোবিন্দবাবুর উইল···মাধবী-কঙ্কণ। তা যাক, ও বইখানা শুনতে শুনতে···লজ্জা করবো না···আমার চোখে জল এসেছিল হে। একেই বলে লেখা! হ্যাঁ···যে পড়বে, তার আঁতে বেশ খোঁচা লাগবে··· চমৎকার! আর এসব শুনতে শুনতে···সত্যি···

এই পর্য্যন্ত বলে বিদ্যুৎবরণ চুপ করলেন···করে মস্ত একটা নিশ্বাস ফেললেন। তার পর বললেন—কি করে এমন লেখো হে? মানুষের মনের ভিতরে যে-সব কথা···সে-কথা?···জিজ্ঞাসা করো মালতীকে··· মালতী এসব বই পড়ে আমাকে শোনান···ওঁরও গলা ভারী হয়ে আসে, চোখের পাতা ভিজে ওঠে যেন! ওঁকে আমি বলছিলুম—ভারী খাঁটি কথা, মালতী···এত কথা ও জানলো কোথা থেকে? বয়স তো হিমির বয়সী! ···কি মালতী···বলিনি আমি?

মালতীর পানে তাকালো অবনী···মালতী লজ্জায় যেন এতটুকু! মালতী কোনো জবাব দিলে না!

বিদ্যুৎবরণের কপাল ঘর্ম্মাক্ত···তিনি বললেন—ঘরটা গরম বোধ হচ্ছে যেন···না? পাখা খোলা···অথচ···কি গো স্বপনবাবু গরম লাগছে না?

—আজ্ঞে, না। অবনী সঙ্গে সঙ্গে দিলে জবাব।

বিদ্যুৎবরণ বললেন—তাহলে আমার বোধহয় ঝাল লেগেছে··· মালাই-কারিটা! তোমার ঝাল লাগছে না?

—না! অবনী দিলে জবাব।

বিদ্যুৎবরণ বললেন—আমার লাগছে বোধ হয়। ঝালটা আমি একটু কম খাই কি না। মালাই-কারিটা দেশী তরকারী তো···হাজার হোক, বিলাতী খাবারের ঐ জন্যই আমি ভক্ত···ঝাল দেয় না মোটে।···তা, মালতী রাঁধেন খাশা! ওঁকে খাটাই···উপায় নেই···বাঙালীর সংসার তো ···রান্না হলো মস্ত আর্ট···যে-মেয়ে রাঁধতে জানে না···তাকে আমি বলি —ওয়ার্থলেশ!···জানো স্বপনবাবু, আমার ছেলেবেলায় দেখেছি···আমার মা খাশা রাঁধতে পারতেন···সেজন্য বাড়ীতে ভোজ হলে আমার মা নিজের হাতে রাঁধতেন। শুধু আমাদের বাড়ীতেই নয়, জ্ঞাতি বা আত্মীয়দের বাড়ী বড় বড় যজ্ঞির ভোজে মার ডাক পড়তো রাঁধবার জন্য। মা হাসিমুখে রাঁধতেন। এখন যেমন ভেনকর বামুন ছাড়া যজ্ঞির খাওয়া হলো না···সেকালে আমাদের পরিবারে ভেনকরা বামুনের রেওয়াজ ছিল না।···খেয়ে সকলে ধন্যি-ধন্যি করতো!

অবনীর কি মনে হলো···অবনী বললে—ভেনকর বামুন বলছেন আপনি ···বড় বড় বহু রইসের বাড়ীতে এখন স্যর, বড় ভোজে কন্ট্রাক্ট দেওয়া হয়··· তার াগুণে গেঁথে খাবার তৈরী করে···চপ কাটলেট ফ্রাই···মাথা পিছু

একখানা—কেউ চাইলে বড় জোর দুখানা—তার বেশী চাইলে কনট্রাক্টর পাশ কাটিয়ে সরে যায়। আর খাওয়া যা হয়…হুঁঃ!

কথা শেষ হলো না…বিদ্যুৎবরণ হো হো করে হেসে উঠলেন…বললেন —কনট্রাক্ট! যা বলেছো!…সত্যি তাই, স্বপনবাবু। ঐ স্যর অয়স্কান্তির মেয়ের বিয়েতে হাজারখানেক লোক খেলো…খাওয়া সাপ্লাই করলো কনট্রাক্টর। জানো…কাটলেটগুলো এই এতটুকুন করে…আর মাছের ফ্রাই? বিশ্বাস করো হে…যেন টিকটিকির ল্যাজ! হা হা হা! আমি বলি, মানুষজনকে শুভকার্যে খাওয়াবি তা যত্ন করে খাওয়া…না, কনট্রাক্টে খাওয়ানো! ও খাবারের চেয়ে বস্তীর খোলার ঘরের হোটেলওয়ালাও ভালো খাবার দেয়! এদের বড়লোক বলো! হুঁ…ঐ টাকাই আছে… মনগুলো অতি ইতর, অতি অভদ্র!…তা যাক…এখানে রান্না কেমন?

—ভালো…বেশ ভালো! অবনী দিলে জবাব…সঙ্গে সঙ্গে তাকালো মালতীর দিকে—মালতীর মুখ…যাকে বলে, শরম-রাগে রাঙা!

বিদ্যুৎবরণ বললেন—হ্যাঁ… আমি ওঁকে বলি, তুমি একটি জিনিয়াস্! তাছাড়া জানো, এ-বয়সে আহারে আমার রুচি এমন…মানে, একরকমের খাবার দুদিনের বেশী তিনদিন কেমন ভালো লাগে না! অদল-বদল চাই …তা মালতী ঠিক আমার রুচি বোঝে…বুঝলে স্বপনবাবু, তাই ওঁকে বলি, রান্নার ব্যাপারে মালতী জিনিয়াস্! জানো…তুমি হয়তো হাসবে… বলবে, গেঁইয়া…মালতী একদিন দেশী এক তরকারী রেঁধে খাইয়েছিলেন— খাশা! আহাহা!

এই পর্য্যন্ত বলে তিনি তাকালেন মালতীর দিকে…বললেন—সে তরকারীটা আজ তৈরী করলে না কেন মালতী? জানো স্বপনবাবু, ডাবের মুচি…জঞ্জাল বলে ফেলে দিই তো—সেই মুচি কুচিয়ে কুচিয়ে তরকারী যা বানিয়েছিলেন…তার কাছে কোথায় লাগে কচি এঁচোড়!

—হুঁ···বটে! বলে অবনী তাকালো মালতীর দিকে···ভালো করেই তাকালো। শরম-রাগে মালতীর মুখ চমৎকার লাগলো···যেন নিপুণ কারিগরের গড়া পরিপাটি মুখ!

বিদ্যুৎবরণ বললেন—আমার দু-চারজন কোলীগ বলেন, এ-বয়সে খাওয়া কমাও হে···ব্লডপ্রেশার হবে। আমি বলি, কিজন্য কমবো! হুঁ! বয়স হলেই খাওয়া কমানো! তার মানে, মুড়ি চিবুবো? ছো! নেচার যতক্ষণ এ্যালাউ করবে···বুঝলে কিনা! ওকি হে, একখানা ফ্রাই পড়ে রইলো কেন? খেয়ে ফ্যালো ইয়ংম্যান।

অবনী বললে—যা চলেছে···তারপর আরো বহু আইটেম রয়েছে···

—তাতে কি! খাও, খাও···

অবনী বললে—রোজ এমন জুটতো যদি···তাহলে অভ্যাস করতুম। কিন্তু মালতী-মাসিমার রান্না খাবার ভাগ্য তো করে আসিনি। উড়ে-বামুনের হাতের রান্না খেয়ে খেয়ে পাকস্থলীর মধ্যে চড়া পড়ে আসছে, স্যর···এই জন্যই তো বাঙালী জাতের মধ্যে শতকরা পঁচাশি জন চল্লিশ বছরে পা দেবার আগেই ডিসপেপসিয়ায় সারা হয়ে পেটেণ্ট বড়ি ধরে!

আবার হো-হো উচ্চ হাসি···বিদ্যুৎবরণ বললেন—ডিসপেপসিয়া! পেটেণ্ট বড়ি! হা হা হা···ও জিনিষ আমি আজ পর্য্যন্ত গলধঃকরণ করিনি স্বপনবাবু! এই যে তোমার বন্ধু হিমি···এক-টেবিলে বসে খাই···তা আমি যা খাই, ও খায় তার অর্দ্ধেক! আমি বলি, ক' বছর বাঁচবে বাপু··· এমনি আধপেটা খেলে? হিমি বলে, হজম হয় না কাকাবাবু! আরে, হজম কি অমনি হবে? হজম-শক্তি ডেভেলপ করা চাই এবং সে-শক্তি ডেভেলপ হয় শুধু প্রাকটিশে!

নানা গল্পে নানা আইটেমের মধ্য দিয়ে ভোজপর্ব্ব চকলো। তারপর সামনের ঢাকা বারান্দায় বসা···

উপন্যাসের কথা উঠলো···বিদ্যুৎবরণ বললেন—তোমার একখানা নভেলে ঐ যে মেয়েটা···আহা, নামটা ভুলে যাচ্ছি···মস্ত ব্যারিষ্টারের মেয়ে···বি-এ পাশ···গান-বাজনা করে—তিন-চারজন ভদ্র পাত্র ত্যাগ করে বাপের ড্রাইভারকে বরণ করে নিলে! আমার খুব ভালো লেগেছে মেয়েটাকে। পচা সোশাল সিষ্টেমের বিরুদ্ধে তার বিদ্রোহ। বাপ-মা, সমাজ···কাকেও পরোয়া করা নয়—ড্রাইভার লোয়ার র‍্যাঙ্কের মানুষ··· তাতে কি···আরে, মনে মনে যদি মিল হয়—ভারী বোল্ড তোমার লেখা।

অলক্ষ্যে অবনী চিমটি কাটলো হিমাদ্রিকে···হিমাদ্রি উঠে পাশের ঘরে গেল। অবনী বললে—আপনার ভালো লেগেছে?

—নিশ্চয়।

—সমাজের র‍্যাঙ্ক আপনি তাহলে···

—মানি না···মানি না। জানো, চণ্ডীদাস, না, কে বলে গেছেন, সবার উপরে মানুষ সত্য! আমিও বলি, ভালোবাসায় সামাজিক র‍্যাঙ্ক কি···র‍্যাঙ্ক মেনে এত বিয়ে হচ্ছে···কটা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মনে-মনে মিল আছে·· বলো তো? দেখি তো···ঐ বিধু চক্রবর্ত্তীরা···স্বামী বিজনেশ নিয়ে আছে · স্ত্রী এর সঙ্গে তার সঙ্গে হাওয়ায় ভেসে বেড়াচ্ছে। পাঁচজনে পাঁচ কথা বলে·· তা গায়েও মাখে না! আমি কি বুঝি না হে? বুঝি!

অবনী বললে—তাহলে আপনি বলতে চান, খুব বড় বোনেদী ঘরের ছেলে যদি বস্তীর একটা মেয়েকে ভালোবাসে···সে-মেয়ের সঙ্গে তার বিয়ে······

কথা শেষ হবার আগেই বিদ্যুৎবরণ বললেন—আলবত!

অবনী ভাবলো, এই ফাঁকে হিমাদ্রির কথাটা···

অবনী বললে—হিমাদ্রি আপনার ভাইপো···সে একটি মেয়েকে ভালো-বাসে···মেয়েটির সোশাল র‍্যাঙ্ক নেই···তাকে ও যদি বিয়ে করে···

বিদ্যুৎবরণ বললেন—করুক···আমি খুব এ্যাপ্রেসিয়েট করবো। এ বিয়েয় আমি আপত্তি করবো না। বলেছি তো, তোমার লেখা নভেলগুলো পড়ে বুঝেছি স্বপনবাবু···মনের মিল—দ্যাটস দী থিং এসেন্সিয়াল!···এই তো আমি···এককালে র‍্যাঙ্ক মেনে বিয়ে করেছিলুম—তা সে স্ত্রীর কাছে কি পেয়েছি? তিনি নেই···এ্যাণ্ড আই নেভার ফেল্ট ইট! কিন্তু হিমাদ্রি আমাকে একথা বলেনি তো!

অবনী বললে—এখনো বলবার মতো ওদের ভালোবাসা জমাট বাধেনি বোধ হয়···

—ও! বিদ্যুৎবরণ একটা সিগার ধরালেন।

চার

এর পাঁচ-সাতদিন পরে···হিমাদ্রির টিকি দেখা যায় না···অবনীকে আসতে হয় মাঝে মাঝে বিদ্যুৎবরণের সাদর আহ্বানে! অবনী দুটো ডাক যদি বা পাশ কাটিয়ে এড়িয়ে যায়···তিনবারের ডাকে আসতে হয়। আসে সন্ধ্যার পর···বিদ্যুংবরণের সাদর অভ্যর্থনা এবং নিত্য-পড়া স্বপন বিশ্বাসের এক-একখানা উপন্যাসের আলোচনা হয়।

বিদ্যুৎবরণ উপন্যাসের পাত্রপাত্রীর কথা তোলেন···ঘটনার কথা পাড়েন···অবনী হাঁ করে শোনে। সে-সব উপন্যাসের বিন্দুবিসর্গ সে জানে না—আলোচনায় যোগ দেবে কি করে! তার রাগ হয় হিমাদ্রির উপর··· মনে মনে গর্জ্জন তোলে—রাস্‌কেল্···এ কি দায়ে যে ফেলেছে! এমন করে নাটকের কিছু না জেনে গিরিশ ঘোষ মশায়ও বোধ হয় অভিনয় করতে পারতেন না! আর সে···

ভাবে, কলকাতা থেকে সরে পড়বে। পিসিমা আছেন নবদ্বীপে…তাঁর গুরুদেব ওখানে কি নাকি মন্দির প্রতিষ্ঠা করছেন বহু অর্থ ব্যয় করে…পিসিমা সেখানে যাবার জন্য বহু তাগিদ দিচ্ছেন…চিঠির পর চিঠি লিখিয়ে। দেবতা, মন্দির সে মানে না…তবু, স্বপন বিশ্বাস সেজে বিদ্যুৎবরণের সঙ্গে অভিনয় করার বিপদ থেকে তাতে নিস্তার মিলবে তো! ভাবে, অবনীকে লাগিয়ে দিয়েছো যদি—স্বপন বিশ্বাসের দু-চারটে বইয়ের গল্প অবনীকে বলো… তা নয়…তিনি ঘুরে বেড়াচ্ছেন ঐ বনশ্রী দেবীর আঁচলের বাতাস গায়ে লাগিয়ে! আর অবনী এখানে…

সেদিন অবনী সঙ্কল্প করে এসেছে, হিমাদ্রির ব্যাপারের আজ হেস্তনেস্ত… নিত্য এমন অভিনয় পোষায় না! আর কোনোদিকে চিন্তা নয়…কিছু নয়…এই প্লট নিয়ে চিন্তা ··পরের অধ্যায়ে কি রকম অভিনয়…কাগজ-কলম নিয়ে লিখতে বসলে একখানা উপন্যাস লিখে ফেলতে পারতো। তা লিখলে নভেলিষ্ট বলে বাজারে খ্যাতি…তা নয়, ভস্মে ঘী ঢালা! যার জন্য এত শ্রম, তার আর দেখা পাবার জো নেই! হিমাদ্রি কি ভেবেছে তার হয়ে এদিককার পালা চুকোনো হলে নিশ্বাস ফেলে বলে বসবে হয়তো, ভাই, বনশ্রীর সঙ্গে ভালোবাসার অভিনয়টাও আমার হয়ে…

অবনী ভাবলো, হিমাদ্রি যেরকম মিনমিনে মানুষ…ওকথা বলা তার পক্ষে বিচিত্র হবে না।

আজ বিদ্যুৎবরণ বললেন, স্বপন বিশ্বাসের লেখা পারুলকামিনী উপন্যাসের কথা! তিনি বললেন—এ-বইটাতে ঐ যে লিখেছো, পারুল-কামিনীর আত্মীয়-স্বজন কেউ নেই—বিধবা মানুষ—বয়স প্রায় চব্বিশ,— ভাত-কাপড়ের জন্য গার্লস স্কুলে টিচারী করে…থাকে একজনদের বাড়ীর একতলায় একখানা কামরা ভাড়া নিয়ে…অসুখ-বিসুখে স্কুল কামাই করবার উপায় নেই…সে ভাবে, পেটের জন্য এত মেহনত কেন? তার পর

স্কুলের প্রেসিডেন্ট গজপতি রায়···ষাট বছরের বৃদ্ধ···দুবছর তাঁর স্ত্রী-বিয়োগ হয়েছে···বাড়ীতে একপাল ছেলে-মেয়ে বৌ, জামাই নাতি-নাতনি, তবু দুনিয়া দেখে শূন্য! সে হঠাৎ ভালোবেসে ফেললো পারুলকে এবং তার পর সমাজ-সংস্কারকে পরোয়া না করে পারুলকে করলো বিবাহ। শুনতে শুনতে মনে হলো, ঠিক কথা! দুজনে দুদিকে এমন একা-একা···ফাঁকা-ফাঁকা—নাঃ, এই বয়সেই তোমার মানুষের মনের দিকে এমন দরদের দৃষ্টি···চমৎকার গো স্বপনবাবু!

অবনী বললে—আজ্ঞে হ্যাঁ···আমি বলি, একা-একা থেকে কেন মিথ্যা হা-হুতাশ করা! তাই, মানে···

বাধা দিয়ে বিদ্যুৎবরণ বললেন—দুজনের ভালোবাসার যে পরিচয় দিয়েছো···ঐ যে স্কুলের মিটিংয়ে গজপতি রায়ের হঠাৎ বিষম লাগলো—কাসির দমকে প্রাণ যায় বুঝি···অতগুলো মাষ্টার হাঁ করে চেয়ে র পারুলকামিনী ছুটে গিয়ে জল এনে খাওয়ালো···মাথা চাপড়ে গলায় বুকে হাত বুলোতে লাগলো—একেই তো বলে টচ্! খাশা!

অবনী বললে—হ্যাঁ···মানুষ হয়ে যদি মানুষকে দরদ না করলুম······

প্রবল ভাবে মাথা নেড়ে বিদ্যুৎবরণ বললেন—উঁহু···তাই নয় শুধু ·· তার উপর আরো কটা ঘটনা। মানে ঐ স্কুলের মেয়েদের পিকনিকের দিন···

অবনী যত শুনছে, তার মনে হেঁয়ালিতে তত জোট পড়ছে···এ-সবের কিছুই সে জানে না···

এ-কথা চাপা দেবার জন্য সে বলে উঠলো—ভাবতে ভাবতে কেমন এসব কথা মনে আসে···ইনস্পিরেশন্! কলমে কি বেরুবে, অনেক সময় আগে থেকে তার কোনো আইডিয়াও···তা যাক···আমি আজ হিমাদ্রির কথাটা বলতে চাই।

বিদ্যুৎবরণ বললেন—ও···হিমি···কেন, সে কি করেছে ?

অবনী বললে—সে ঐ মেয়েটিকে···আপনাকে বলেছি তো, ভরসা হচ্ছে না তার আপনার কাছে এ-কথা বলতে। তার কারণ, জাত্যংশে···

বিদ্যুৎবরণ বললেন—আরে, রেখে দাও তোমার জাত্যংশ···আর বনেদী বংশ। তুমি এত-বড় নভেলিষ্ট···প্রত্যেকটা বইয়ে লিখছো মনের কথা···মনে-মনে মিল। তা হিমি যদি মেয়েটাকে বিয়ে করতে চায়—করুক না!

—আপনার অনুমতি···

—খুব···খুব···খুব অনুমতি আছে আমার! কোষ্ঠী মিলিয়ে একটা অজানা মেয়েকে বিয়ে করা···মনে-মনে মিল হবে না হয়তো···এরকম বিয়ে তো বিয়ে নয়···বন্ধন।···এ-বন্ধনে মানুষ মারা যায়। কি বলো তুমি··· এ্যা এ্যাঁ? হা হা হা—

অবনী নিশ্বাস ফেলে বাঁচলো যেন! সে বললে—বেশ···আপনার অনুমতি আছে তাহলে! তাকে বলবো! তারপর হ্যাঁ, বিয়ে যে করবে··· বিয়ের আসল ব্যাপার······

—বিয়ের আবার ব্যাপার কি? বিদ্যুৎবরণ করলেন আশ্চর্য্য ভঙ্গীতে প্রশ্ন।

অবনী বললে—না···মানে, আপনি তার ফার্ম থেকে যে এ্যালাউন্সের ব্যবস্থা করেছেন···সাফিসিয়েন্ট। তবে কিনা, সে বলে, বিয়ে করলে সঙ্গে সঙ্গে খরচ বহুৎ বাড়বে তার উপর···

বিদ্যুৎবরণের ললাট হলো কুঞ্চিত। তিনি বললেন—উপস্থিত ওর বেশী দেওয়া চলবে না স্বপনবাবু! তার কারণ, আমাকে এখন বুঝে চলতে হবে। এ-বয়সে একটা বড় রকম দায়িত্ব নিচ্ছি! হিমি যা পায় তাই পাবে···ওর বেশী···উঁহু···আমি এখন ম্যানেজ করতে পারবো না।

কেন না, আমি নিজে বিবাহ করবো। করবো কেন, করেছি ধরে নাও!

—বি-বা-হ! আ-প-নি! অবনীর মনে হলো, সে যেন স্বপ্ন দেখছে।

বিদ্যুৎবরণ বললেন—হ্যাঁ···বিবাহ করিনি···তবে দুহপ্তার মধ্যেই করবো···সিভিল-ম্যারেজ···নিঃশব্দে। আমাদের পুরুত ডেকে মন্ত্র পড়ে বিবাহ! তাতে নানা লটঘটি···নমো-নমো করে সারতে গেলেও দাঁড়ায় বৃষোৎসর্গ ব্যাপারে! গায়ে হলুদ, আভ্যুদয়িক, সাতপাক ঘোরা, কুশণ্ডিকা, ফুলশয্যা, মন্ত্রপড়া, হোম। মনে আছে তো···একদিন সেরকম বিয়ে—সাচ্ নুইশান্স! সে-বিয়ে নয়···সিভিল-ম্যারেজ···টুক্ করে রেজিষ্ট্রী অফিসে গিয়ে সই করা—দুটি সাক্ষী নিয়ে যাওয়া···তা সে সাক্ষী মজুত। একজন তুমি স্বপনবাবু···আর একজন সাক্ষী হবে হিমি। সব আমি প্ল্যান করে রেখেছি।

অবনী বললে—কাকে বিবাহ করছেন?

—কাকে মনে হয়? হা হা হা! উচ্চহাস্য করে বিদ্যুৎবরণ বললেন—আমাদের মালতী। তোমাদের মালতী মাসি গো! বেচারী বিধবা হয়ে মলিন মুখে থাকে। কি রান্নাই করে!···দেশী বিলাতী···হোয়াট এভরিম্যান ওয়াণ্টস!···আমাকে কি যত্ন! তাছাড়া আগে বুঝতুম না স্বপনবাবু···এখন তোমার উপন্যাসগুলো পড়ে হৃদয়-বেদনা বুঝতে পারছি! ওঁকে দেখি, আর মনে পড়ে···আমাদের ছেলেবেলার পড়া সেই কবিতার লাইন···সেই যে ভারতের পতিহীনা নারী বুঝি ঐ রে।···বেঁচে থাকো বিদ্যাসাগর চিরজীবী হয়ে! নভেল পড়তে পড়তে মালতীর ঐ গলা চোক্‌ড্ হয়···চোখের পাতা ভিজে ওঠে। তাই থেকেই তো বুঝলুম গো স্বপনবাবু···তোমার নভেলের দৌলতে। তাঁকে বললুম, মালতী তুমিও একা···আমিও একা—লেট আস্ ম্যারি এ্যাণ্ড বী ওয়ান্!

এই পর্য্যন্ত বলে বিদ্যুৎবরণ চুপ করলেন। তাঁর দুচোখ হলো অর্দ্ধ-নিমীলিত।

অবনী বললে—তিনি কি বললেন?

—মুখে কি বলবে! তবে মাথা নীচু করে আঙুল খুঁটতে লাগলো··· ঠিক তোমার ঐ নভেলের অঞ্জলি যা করেছিল!···তা তুমি কি বলো? তোমাদের মালতী মাসি···দেখতেও ভালো—নয়?

—আজ্ঞে, নিশ্চয়।

অবনীর মুখে কথা নেই···তার চেতনাও রীতিমত ধাক্কা খেয়ে কেমন ছন্নছাড়া! হিমাদ্রি শুনলে পাগল হবে—নিজের কেস্ ঠিক করতে নভেল এনে দিয়ে···কাকার কেসটা কি ভাবেই না সে···

বাড়ী ফিরতেই সরকার গঙ্গাপদ বললে—হিমাদ্রিবাবু দুবার ফোন করে-ছিলেন। একটা ফোন-নম্বর দিয়েছেন। বলেছেন, তুমি এলেই যেন ঐ নম্বরে ফোন করা হয়···তিনি এসে দেখা করবেন।

অবনী বললে—তুমিই ফোন করে দাও গঙ্গাদা···বলো, আমি এসেছি।

গঙ্গাপদ তখন হিমাদ্রির দেওয়া নম্বরে ফোন্ করে জানালো, অবনী ফিরেছে। হিমাদ্রি জবাব দিলে—আমি এখনি আসছি!

গঙ্গাপদর একটু পরিচয়···সেই সঙ্গে অবনীর ঘর-সংসারের পরিচয় দেওয়া দরকার।

অবনীর বাবা বেশ পয়সাওয়ালা মানুষ। কলকাতা শহরে অনেকগুলো বাড়ী আছে···তার মধ্যে দুখানা চৌরঙ্গীতে—বাড়ীর ভাড়া যা পাওয়া যায়··· তা ছোটখাট একটা জমিদারির আয়! বাবা-মা মারা গেছেন, অবনী তখন ন-দশ বছরের বালক। বাড়ীতে থাকেন বিধবা পিসিমা। পিসিমা সন্তানহীনা—তিনিও স্বামীর বহু টাকা পেয়েছেন। পিসেমশায় ছিলেন ধার্মিক মানুষ···

ঠাকুর-দেবতা মন্দির এই সব নিয়ে থাকতেন এবং তাঁর কাছ থেকে পিসিমাও দেবতা-ব্রাহ্মণে ভক্তির সম্পদও পেয়েছেন। পিসিমা খুব স্নেহ করেন অবনীকে ...অবনীও পিসিমাকে খুব মেনে চলে! পিসিমা সম্প্রতি নবদ্বীপে আছেন—সেখানে তাঁর গুরুদেব মন্দির প্রতিষ্ঠা করবেন...রাধাশ্যামের মন্দির...তার যত খরচ পিসিমা দিচ্ছেন অকাতরে। মন্দির তৈরীর কাজ বেশ সমারোহে চলেছে...সামনের বৈশাখী পূর্ণিমায় মন্দিরে ঠাকুর প্রতিষ্ঠা হবে! পিসিমা যেমন স্নেহময়ী...তেমনি রাশভারি মানুষ! তাঁকে অবনী শুধু মানে বললে ঠিক হবে না...ভয়ও করে। একালের ছেলের পক্ষে বিসদৃশ হলেও কথাটা সত্য!

গঙ্গাপদ হলো অবনীর বাবার আমোলের সরকার বিষ্ণুপদবাবুর ছেলে। বিষ্ণুপদকে অবনীর বাবা-মা দেখতেন এই পরিবারের একান্ত আপনজনের মতো...পিসিমাও তেমনি স্নেহ করতেন। বিষ্ণুপদ এই বাড়ীতেই থাকতেন...তাঁর আলাদা মহাল আছে। বিষ্ণুপদর ছেলে গঙ্গাপদ এবং অবনী...দুই ভাইয়ের মতো এ-বাড়ীতে মানুষ। গঙ্গাপদ ম্যাট্রিক পাশ করবার পর বিষ্ণুপদ মারা যান; তখন তাকেই পিসিমা তার পিতৃপদে অধিষ্ঠিত করেন। অবনীর চেয়ে গঙ্গাপদ বয়সে তিন বছরের বড়। গঙ্গাপদকে অবনী ডাকে গঙ্গাদা বলে। গঙ্গাপদর আজ দুবছর হলো বিবাহ হয়েছে—পিসিমাই উদ্যোগ করে বিবাহ দিয়েছেন। ভাইপো অবনীর বিবাহের জন্য পিসিমার চেষ্টার অন্ত নেই...কিন্তু অবনীর ধনুর্ভঙ্গ পণ...না, বিবাহ সে করবে না! সেজন্য পিসিমা দুঃখ করেছেন...শাসন করেছেন...অবনী তবু পিসিমার এ-সাধ পূর্ণ করচে না। এজন্য পিসিমার মনে ক্ষোভ এবং অভিমানের সীমা নেই। অভিমানভরে কতবার তিনি অবনীকে বলেছেন—বিয়ে যদি না করিস...যা খুশী করিস...যেমন খুশী থাকিস—ডাগর হয়েছিস তো...আমি আর এখানে থাকবো না। কাশী

গিয়ে থাকবো! একথা অনেকবার বলেছেন এবং প্রতিবারই হেসে অবনী জবাব দিয়েছে—পারো, তাই থাকো গিয়ে! সত্যি, আমি তোমার পায়ের শিকল হয়ে তোমাকে আর কতকাল আটকে রাখবো! তোমার তীর্থ ধর্ম্ম আছে, পরকাল আছে তো!

অবনীর এমন স্পষ্ট কথা শুনেও পিসিমা কিন্তু এ-বাড়ী ছেড়ে—অবনীকে ছেড়ে কাশী যাত্রা করতে পারেননি। তবে তীর্থে মাঝে মাঝে বেরোন; অবনীও ক'বার সঙ্গে গিয়েছিল। এবারে পিসিমার নবদ্বীপ-যাত্রা··· অবনী সঙ্গে যায়নি। পিসিমা কিন্তু বলে গিয়েছেন—ঠাকুর প্রতিষ্ঠার সময় নবদ্বীপে তোমার যাওয়া চাইই, বাপু···নাহলে সত্যি, আমি আর এখানে ফিরবো না—নবদ্বীপ থেকে সোজা কাশী চলে যাবো···কাশীতেই থাকবো!

কথাটা বলতে পিসিমার চোখে জল এসেছিল···কণ্ঠ ভারী হয়েছিল। অবনী জবাব দিয়েছে—যাবো পিসিমা···সত্যি যাবো নবদ্বীপে।

অবনী গেল স্নান করতে···স্নান করে এসে বসবার ঘরে বসতে গঙ্গাপদ বললে—কি হলো হিমাদ্রিবাবুর কেসটা?

গঙ্গাপদ এ-ব্যাপার জানে···অবনী তাকে বলেছে। সরকার হলে কি হয়, গঙ্গাপদকে অবনী দেখে বন্ধুর মতো—তার সঙ্গে মনের কথা হয় তার।

অবনী জবাব দিলে—খুব ভালো রেজাল্ট, গঙ্গাদা! বুড়ো শুধু এ-বিয়েতে মত দিয়েছে, তা নয়। বুঝলে, ঐ সব নভেল পড়ে পড়ে ক্ষেপে উঠেছে···এ-বয়সে বিবাহ করচে!

গঙ্গাপদ শুনে চমকে উঠলো···বললে—এ্যাঁ···সত্যি বুড়ো?

—হ্যাঁ। বাড়ীতে আছেন এক বিধবা···সম্পর্কে ওঁর কি রকম শালী হন···হিমাদ্রি তাঁকে মালতী-মাসি বলে ডাকে···সেই মালতী দেবীকে

বিবাহ করবেন...সিভিল ম্যারেজ। সব ঠিক। দিন পনেরো পরে বিবাহ।

অবনী বললে—আমি তামাসা করছি না গঙ্গাদা! বুড়ো আমাকে বললে, ঐ সব উপন্যাস পড়ে তার মনে হয়েছে, বড় একা! বললে, মালতী দেবীও একা—দুজনেই একবার করে বিয়ে করেছিল...অর্থাৎ কারো বিয়ে ধোপে টিকলো না, তাই!

গঙ্গাপদর দুচোখ এত-বড়...সে নির্ব্বাক।

অবনী বললে—তুমি এমন অবাক হচ্ছো গঙ্গাদা! কিন্তু এমন ঘটনা... এ তো নিত্যকার! পয়সা থাকলে মানুষের বিয়ের সাধ থাকে সেই খাটে চড়বার আগের মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত!...মাইকেল যে লিখে গেছেন, বুড়ো সালিকের ঘাড়ে রোঁ! বুড়ো সালিকের ঘাড়ে যদি রোঁ না গজাতো, তাহলে কি আর তিনি ও-নাটক লিখতেন?

গঙ্গাপদ বললে—হুঁ! কিন্তু মালতী দেবী...তাঁর বয়স হয়েছে কত?

—তা কে জানে! অবনী বললে—তবে দেখে মনে হয়, বয়স বেশী নয়।

এমনি কথা চলেছে...তার মধ্যে হিমাদ্রি এসে হাজির!

অবনী বলে উঠলো—হার্টি কনগ্রাচুলেশন্স্! কি খাওয়াবে বলো? তোমার কেসে ডিক্রী পেয়েছি...এখন শুধু সে-ডিক্রী জারি করার ওয়াস্তা!

—তার মানে?

—মানে! অবনী বললে—তোমার কাকাবাবু খুব রাজী...এ-বিয়ে করতে পারো। তবে ভাই, খারাপ খবরও আছে...এ্যাণ্ড ছাটস্ এ স্করপিয়ন্স টেইল!

হিমাদ্রি নিষ্পলকে চেয়ে রইলো অবনীর দিকে...ফ্যালফেলে দৃষ্টি।

অবনী বললে—তোমার কাকাবাবু বিবাহ করছেন। সব ঠিক। পনেরো দিন পরে বিবাহ এবং ওঁর পাত্রী হলেন—তোমার মালতী মাসি!

হিমাদ্রি একটা নিশ্বাস ফেললো·· নিশ্বাস ফেলে বললে—হ্যাঁ···আমি আভাসে বুঝেছি।

—কি রকম?

হিমাদ্রি বললে—মালতী মাসির জন্য দু-তিনদিন হলো, নানা প্যাকেজ আসছে বাড়ীতে। কিন্তু অবনী···

—কি? বলো···

হিমাদ্রি আবার নিশ্বাস ফেললো···নিশ্বাস ফেলে বললে—ঐ বনশ্রী! নো, নেভার! কি রকম মানুষ, জানো? তোমাকে বলা হয়নি! কেন··· তাও বলছি। ঐ বনশ্রী···তুমি জানো তো···ডিনারের নেমন্তন্ন করেছিলুম··· তাতে জবাব দিয়েছিল, ইয়েস! তারপর আমি যথাসময়ে ওর বাড়ী গিয়ে হাজির···বাড়ী মানে, চারতলা ফ্ল্যাটের তিনতলায় একখানা কামরা··· গিয়ে দেখি, ওর ঐ ফিল্মের ডাইরেক্টর···ক্যাড্ এক বেটা···কালো কিষ্টে··· ক্যাড্ চেহারা···তার সঙ্গে হাসিখুশী! আমায় দেখে বললে, আপনার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দি···এঁর সঙ্গে আমার বিয়ে হচ্ছে···মাই ফিয়াসে। শুনেই আমার আঁপাদমস্তক জ্বলে উঠলো। আমি বললুম—বটে! সো গ্ল্যাড! তা আমি বলতে এসেছিলুম, আজকের এনগেজমেণ্ট ক্যানসেল্ড। আমাকে আজ রাত্রে যেতে হচ্ছে দিল্লী!

অবনী বললে—ক্লীন কাট!

—শোনো। হিমাদ্রি বললে—তাতে বললে, হাউ শেমলেস· বললে, ও···নেমন্তন্ন ছিল···আমি ভুলে গিয়েছিলুম।

এই পর্য্যন্ত বলে একটা নিশ্বাস। নিশ্বাস ফেলে হিমাদ্রি আবার বললে— জানো, এখন আর গোপন করবো না। ঐ বনশ্রী···এ ভ্যাম্প···কদিন আগে আমি ওকে গাড়ী করে ষ্টুডিয়ো থেকে ওর বাড়ীতে পৌছে দিচ্ছিলুম··· পথে জাঁকজমকলালদের দোকানে শেল্ হচ্ছিল। নামতে চাইলো···নামলো···

আমাকে নিয়ে ঢুকলো দোকানে—ঢুকে পঁচাত্তর টাকার একখানা শাড়ী কিনলো···তার দাম আমি দিয়েছি। ওঃ—খুব বেঁচে গিয়েছি।

অবনী বললে—এখন তাহলে ?

হিমাদ্রি বললে—ওসব গ্ল্যামরস্ মেয়ের দিকেও না!

—এতদিন দেখা করে আমাকে বলোনি কেন? তোমার কাকাবাবুর সঙ্গে আমি আজ ফাইনাল কথা কয়ে এলুম!

হিমাদ্রি বললে—দেখা করিনি···তার কারণ, সময় পাইনি ভাই। মানে, মনটা খুব খারাপ। মাঠে বসেছিলুম—হঠাৎ দেখা সারদার সঙ্গে। মনে পড়ে, সেই সারদা হে···যাকে আমরা বলতুম ল্যাবেঞ্চুশ-মার্কা? সে ধরে তাব ওখানে নিয়ে গেল। বললে, নতুন বাড়ী কিনেছে···ভবানীপুরে—গেলুম। তার ছোট বোন···খাশা গান গায়—শোনালো।···বোনের নাম শেফালি···বিয়ে হয়নি···বয়স বাইশ বছর। গান যা গায়···আর দেখতেও···

বাধা দিয়ে অবনী বলে উঠলো—এ্যাণ্ড ইন লভ!

—তা ভাই···গোপন করবো না। রোজ সারদার ওখানে যাই অফিসের পর···গান শুনি শেফালির। মানে, ও আমাকে···

—বিহ্বল করেছে!···অবনী হাসলো···বললে—তোমার বিহ্বলতা রোগের চিকিৎসা প্রয়োজন! তা বিহ্বল হয়েছো···বেশ, প্রোপোজ করো···

—সেইটে পারছি না···সারদা কি ভাববে! যদি বলে, না?

অবনী বললে—সেখানেও কি আমাকে দূতীয়ালী করতে হবে?

—তা ঠিক নয়। তবে বলছিলুম, চলো না কাল সন্ধ্যা নাগাদ··· বলবো, সারদার কথা তোমাকে বলতে, তুমি দেখা করতে চাইলে। তারপর ···বুঝলে কিনা···

অবনী বললে—কিন্তু তুমি যে-রেটে প্রেমে পড়ছো···জানো তো, রোলিং ষ্টোন্স গ্যাদার নো মশ্! গড়াগড়ি খেলে চলবে না—একটিকে খুঁটির মতো অবলম্বন করে থাকো ভাই। নাহলে···

বাধা দিয়ে হিমাদ্রি বললে—কি বলো? কাল···

—বেশ···এসো। দেখা যাবে!

পাঁচ

পরের দিন···ভাগ্যচক্র ঘুরে গেল···

নবদ্বীপ থেকে পিসিমার চিঠি পেলে অবনী সকালে···সকলের কুশলাদি-প্রশ্নের পর অবনীকে বিশেষভাবে তাগিদ—

> এ চিঠি পাবামাত্র তুমি নবদ্বীপে আসবে। তার কোনো রকম অন্যথা না হয়। যদি না আসো, তাহলে বুঝবো, তুমি পুরোপুরি স্বাধীন হয়েছো···পিসিকে আর চাওনা! ইতি—

অবনী ডাকলো গঙ্গাপদকে। গঙ্গাপদ এলে তাকে চিঠি দেখালো, বললে—পড়ো গঙ্গাদা।

গঙ্গাপদ চিঠি পড়লো, পড়ে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালো অবনীর দিকে, বললে—কি করবে?

মৃদু হেসে অবনী বললে—পিসিমা আলটিমেটাম্ দিয়েছে···যেতে হবে। যাই।

গঙ্গাপদ বললে—তোমার যাওয়া উচিত। সত্যি, তোমাকে নিয়েই ওঁর পৃথিবী! খুব বেশী আগ্রহ জানিয়ে তিনি এ-কথা লিখেছেন। তুমি না গেলে তাঁর মনে ভয়ানক আঘাত লাগবে।

—হ্যাঁ!···তাছাড়া যাওয়া দরকার···নিজের দেহ-মনের স্বাস্থ্যের জন্য। বুড়ো বিদ্যুৎবরণের সঙ্গে জাল-অর্থর সেজে অভিনয় করে আমার দেহ-মন

জর্জরিত, এবং এই দেহ মন নিয়ে এখানে থাকলে···কে জানে, ঐ হিমাদ্রি শেষে সারদার বোনের সঙ্গে আবার কি নতুন অভিনয়ের বায়না ধরবে! কাজেই যঃ পলায়তি, স জীবতি নীতি মানা উচিত!

হেসে গঙ্গাপদ বললে—যা বলেছো!—হিমাদ্রিবাবু তো বলে গেছেন··· তোমাকে নিয়ে ওঁর সারদাবাবুর বাড়ী যাবেন। তা নবদ্বীপে যাও যদি, তো কবে?

—আজই। শুভস্য শীঘ্রং···আই এ্যাম ইন ডায়ার নীড্ অফ এ চেঞ্জ! পাঁচ-সাত দিন ঘুরে আসি। গেলে পিসিমা খুব খুশী হবে।

সেইদিনই খাওয়া-দাওয়া সেরে অবনী একটা স্যুটকেশ আর বিছানার হোল্ড-অল নিয়ে কাটোয়ার ট্রেনে চড়ে বসলো এবং নবদ্বীপে পৌঁছুলো সন্ধ্যা ছটায়।

নবদ্বীপ-ধাম ষ্টেশন।··ষ্টেশনে পালকি আছে, গরুর গাড়ী আছে। পিসিমার গুরু জয়চন্দ্র বিদ্যাভূষণের আস্তানা সকলে জানে। একখানা গরুর গাড়ী ভাড়া করে তাতে মালপত্র তুলে অবনীর যাত্রা।

মেটে পথ···পথের ধারে ধারে কোথাও আম-কাঠালের বাগান···কোথাও রাজ্যের ভাঙ্গা মন্দির···শুকনো ডোবা···পুকুর···ঘর-বাড়ী···দোকান··· কোথাও বা বনতুলসীর ঝোপ—মানুষ-জনের কলরব···শহরের দৃশ্য দেখে দুচোখ ক্লান্ত···ভারী বিচিত্র সুন্দর লাগলো অবনীর।

সন্ধ্যার পর জয়চন্দ্র বিদ্যাভূষণের বাড়ীর দোরে গাড়ী থামলো। একতলা বাড়ী···পুরানো সেকেলে ছাঁদের···তবু বেশ পরিচ্ছন্ন। বাড়ীর সামনে ফলফুলের বাগান।

গাড়ী থেকে নামতেই বিদ্যাভূষণের সঙ্গে দেখা—তিনি সহাস্য সম্বর্দ্ধনা জানালেন। অবনী ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করতে বিদ্যাভূষণ তাকে বুকে

জড়িয়ে ধরে মাথায় হাত রেখে আশীর্ব্বাদ করলেন। নিজের ছেলেকে ডাকলেন—কুলদীপ...

ছেলে কুলদীপ এলো। জয়চন্দ্র বললেন—অবনীকে নিয়ে যাও... সেবাদির ব্যবস্থা করো। আমি বেরুচ্ছি শ্যামরায়ের আরতি করতে। অবনীকে বললেন—ফিরে এসে কথা হবে, বাবা।

ছেলের হাতে অবনীকে সমর্পণ করে জয়চন্দ্র চলে গেলেন।

অবনীকে নিয়ে কুলদীপ এলো অন্দরে এবং বিশিষ্ট অতিথির যথারীতি সম্বর্দ্ধনা...

পিসিমা খুব খুশী...বললেন—চিঠি পেয়েই এসেছিস...আমার ভাগ্যি!

হেসে অবনী বললে—যে কথা লিখেছো...উকিলের চিঠি পেলেও এত ভয় পেতুম না, পিসিমা।

—ভালো! পিসিমা একটা নিশ্বাস ফেললেন...বললেন—তোকে সেখানে একা রেখে এসে ঠাকুর-দেবতাতে কি মন দিতে পারি! অষ্টপ্রহর তোর চিন্তা! ভালো বন্ধনে পড়েছি বটে!

কথা শেষ করে পিসিমা আর একটা নিশ্বাস ফেললেন।

তারপর এখানকার কথা...মন্দির তৈরী প্রায় শেষ। মন্দির যা হয়েছে... অবনীকে পিসিমা বললেন—কাল সকালে গিয়ে দেখি গঙ্গার ধারে... ছোট হলেও চমৎকার রে...বৃন্দাবনের মন্দিরের ছাঁদে তৈরী করাচ্ছেন গুরুদেব। সেখানে গিয়ে বসলে মন ভরে ওঠে।

রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর শয়ন। পিসিমা ধনী শিষ্যা...তাঁর জন্য বাড়ীর সব চেয়ে ভালো ঘরখানি ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। ঘরে দুখানি ছোটখাট... কোন্ যজমানের দেওয়া। তার একটায় পিসিমার শয্যা...অপরটায় অবনীর।

অবনী শুয়েছে···পিসিমা তাঁর খাওয়া-দাওয়া সেরে ঘরে এলেন··· বললেন—ঘুমোলি···ও অবু?

—না পিসিমা।

—তাহলে শোন্···কেন তোকে চিঠি লিখে ডেকে আনলুম।

—বলো।

পিসিমা যা বললেন, তার মর্ম্ম: ওপাড়ায় থাকে তারকদাস চক্রবর্ত্তী। তারকদাসের বয়স বেশী নয়···চল্লিশ বছর হবে—জগতে একটি বোন ছাড়া তার আর কেউ নেই! বড় গরীব···বোনটির নাম আনন্দময়ী··· আনু বলে সকলে ডাকে। ভাই গরীব·· বোনের বয়স হয়েছে, তা উনিশ-কুড়ি বছর—বিয়ে হয় নি! কি করে বিয়ে হবে? বিয়ে দিতে গেলে এতগুলি টাকা চাই তো! বড় কষ্টে সংসার চলে। ভাইয়ের চাকরি নেই। হাতে যে কাজ পায়, করে। বোনটি ভারী ভালো—পাঁচজনে ভালোবাসে। মেয়েটি লেখাপড়া জানে। সেলাইয়ের কাজ যা করে, অপূর্ব্ব। গুরুদেবের ছেলে কুলদীপকে পশমের কি চমৎকার গলাবন্ধ বুনে দিয়েছে। তাছাড়া এর বাড়ীতে ছেলেমেয়েব জন্য কাঁথা সেলাই করে দিয়ে আসে···তার বাড়ীর মশারি তৈরী···বালিশের ওয়াড়···তাতে আবার ঝালর দেওয়া। খাশা মেয়ে!

পিসিমা বললেন—আমাকে কি যত্ন করে! সকালে এ-বাড়ীতে এসে আমার মুখ-হাত ধোবার জল দেবে···গঙ্গায় যাবো স্নান করতে, ও যাবে সঙ্গে আমার কাপড়-গামছা নিয়ে। আমাকে কাপড় কাচতে দেয় না···নিজে জোর করে নিয়ে কাচে। দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর একটু গড়াই তো··· আমার অভ্যাস। আনু পা টিপে দেবে···মাথায় হাত বুলোবে··রাত্রেও এমনি সেবা···আমাকে শুতে পাঠিয়ে তবে বাড়ী যায়!···আমিই ব্যবস্থা করেছি···দু'বেলা এবাড়ীতে মেয়েটা খায়। যতখানি সুসার হয়···বড়

দুঃখের সংসার রে। তা শোনো বাপু, ঐ আমুর সঙ্গে তোমার বিয়ে দেবো। এতে 'না' বলো যদি···আমি আর বাড়ী ফিরবো না—আত্মঘাতী হবো। হ্যাঁ!

অবনী বুঝলো, এইজন্যই এখানে তাকে আসবার জন্য অমন জোর তাগিদ! পিসিমার কথা শুনে সে শিউরে উঠলো···বললে—কিন্তু পিসিমা, আমি···

তার কথা শেষ হলো না, পিসিমা ফোঁশ করে উঠলেন—এর আবার কিন্তু কি! ঘেটের কোলে বলতে নেই—বয়স হলো প্রায় ত্রিশ···এর পরে চুল পাকলে বিয়ে করবি না কি? তাছাড়া আমি এখনো রয়েছি মাথার উপর···দেখে-শুনে ভালো ঘরের ভালো মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে যাই—নাহলে আমি মরে গেলে কোথা থেকে একটা খিষ্টান্নী, না ধাঙড়ানীকে বিয়ে করে বসবি···সে খুব ভালো হবে—না?

অবনী বললে—আহাহা, তা নয়। মানে, বিয়ে আমি করবো কি না, এখনো ভেবে ঠিক করতে পারিনি।

—এর আবার ঠিক করা করি কি···শুনি? পিসিমা বললেন—চিরদিন সকলে বিয়ে করছে। বিয়ে করার আবার ঠিক করা কি?···না, আমি কোনো কথা শুনবো না। আমার বাপের বংশ নিশ্চিহ্ন করবি তুই···বিয়ে না করে! তা আমি সহ্য করতে পারবো না। বিয়ের বয়স অনেকদিন পার হয়ে গেছে—এর পর ষাট বছর বয়সে বিয়ে করবি না কি?

—বিয়ে আমি করবো না পিসিমা। অবনী বললে—খাশা আছি। বিয়ে করে একটা বন্ধন···

—থাম্! বিয়ে বন্ধন···বটে! পিসিমা বললেন—ও-কথা চলবে না ·· ঢের শুনেছি, আর নয়। লক্ষ্মীছাড়া বাউণ্ডুলে হয়ে আছিস। এই বিষয়-সম্পত্তি···মনে হয় না, বৌ হবে···ছেলেমেয়ে হবে···জলজ্যান্ট

সংসার? কথা শোন অবু, এই মেয়েটির সঙ্গে তোমার বিয়ে আমি দেবোই। মেয়েটিকে কাল চোখে ছাখো—দেখলে বুঝবে, পিসিমা যা-তা একটা পেত্নী ধরে দিচ্ছে না! কি মুখ…কি গড়ন! আহা, শুধু দারিদ্র্যের জন্য মেয়েটা ভেসে বেড়াচ্ছে। ও-মেয়ে যে-ঘরে যাবে…সে-ঘর উথলে উঠবে!

অবনী বহুবার প্রতিবাদ তুলতে গেল…কিন্তু পিসিমার কথার উপর তার প্রতিবাদ মাথা তুলতে পারলো না! হতাশ হয়ে অবনী শেষে বললে—আচ্ছা, আচ্ছা…তোমার লক্ষ্মীঠাককণকে কাল চোখে দেখি। ছেলেবেলায় ধরে বিয়ে দিতে যদি, তো যাকে দিতে তাকেই বিয়ে করতুম, কিন্তু এখন আমার বয়স হয়েছে…অনেক কিছু দেখেছি, জেনেছি, বুঝেছি—এখন না-দেখে বিয়ে করা…

পিসিমা এ-কথায় তখনকার মতো নিরস্ত হলেন। তিনি বললেন—বেশ। সকাল হলেই আনু আসবে তো। তাকে ছাখ্…বোঝ ভালো করে! তোদের একালে যেমন হয়েছে…মেলামেশা কর না হয়। তাতে তার দাদার আপত্তি হবে না—আমারো না। দাদা আমার পায়ে গড়িয়ে পড়েছে। বলে, আপনি এ-দায়ে উদ্ধার করুন, মা।

পরের দিন সকাল বেলা…মুখ-হাত ধুয়ে অবনী বললে—একটু বেড়িয়ে আসি, পিসিমা। তোমাদের মন্দির দেখতে যাবো।

পিসিমা বললেন—চা খেয়ে যা…

চা! অবনীর চমক লাগলো! এ-বাড়ীতে চা! সে বললে—চা খাবো!

—খাবি বৈ কি! আনু তৈরী করছে। মা ঠাকরুণ ব্যবস্থা করেছেন রে। এঁরা চা খান না বলে তুই ভাবিস, এ-গ্রামে চা মেলে না!

মাঠাকরুণ মানে, গুরুদেবের স্ত্রী—কুলদীপের মা!

তিনি এসে সামনে দাঁড়ালেন, বললেন—তুমি এসেছো বাবা, আমাদের কত সৌভাগ্য! এখানে কি-বা তোমাকে খেতে দেবো, বলো। তবু…

অবনী বললে—কেন, রাত্রে যা খেয়েছি, আপনার বুঝি মনোমত হয়নি?

কুলদীপের মা বললেন—মাছ-মাংস খাও বাবা…আমরা তো তা খাইনা। শুধু লুচি, ভাজা, আলুর দম…

হেসে অবনী বললে—আর বাড়ীর তৈরী সন্দেশ রাবড়ি!

কুলদীপের মা বললেন—আজ মাছ খাবে, বাবা। উনি মাছের কথা বলে দিয়েছেন ও-পাড়ার জন্নু জেলেকে।

—কেন, মাছ কেন? অবনী বললে—নিরামিষ আমি ভালোবাসি। কেন ঝামেলা করা!

—তা কখনো হয় বাবা! কুলদীপের মা বললেন—আলাদা উনুন আছে…কোনো ঝামেলা হবে না!

পিসিমা বললেন—আন্নু রেঁধে দেবে…নিজে থেকে সে বলেছে। এই যে মা-আন্নু!

পিসিমার কথায় অবনী চেয়ে দেখে, রঙীন শাড়ী-পরা এক কিশোরী আসছে…তার হাতে চায়ের পেয়ালা।

কুলদীপের মা আসন পেতে দিলেন…বললেন—বসো বাবা। হালুয়া তৈরী করেছি…ফল আছে…গাছের পেঁপে পেয়ারা। কমলালেবু আছে—খাও!

আসনে বসতে হলো। সামনে কিশোরী রাখলো চায়ের পেয়ালা।

কুলদীপের মা বললেন—এবারে ফলের রেকাবি আর হালুয়া আন্ মা-আন্নু।

কিশোরী যে আন্নু···অবনীর বুঝতে দেরী হয়নি! সে মনে মনে হাসলো ···মেয়েটি যতখানি পারে, নিজেকে সুছাঁদে সাজিয়ে সামনে হাজির হয়েছে! সে চায়ের পেয়ালায় মুখ দিলে—তারপর ফল এলো, হালুয়া এলো —অবনীকে খেতে হলো।

পিসিমা বললেন—একলা কোথায় যাবি! আন্নুর দাদাকে ডেকে পাঠিয়েছি···সে আসছে। সে তোকে সব ঘুরিয়ে সব দেখিয়ে নিয়ে আসবে। পোড়া-মহেশ্বরতলা···এখানকার কতকালের টোল···গঙ্গার ধার ···মন্দির—সব দেখে আয় তার সঙ্গে বেরিয়ে।

খাওয়া শেষ হবার আগেই বাহিরে ডাক শোনা গেল—কোথায় গো পিসিমা?

—এসো বাবা···এসো।

সঙ্গে সঙ্গে যে-মূর্ত্তির আবির্ভাব হলো···তাকে দেখে অবনীর দেহ-মন রী-রী করে উঠলো! সিড়িঙ্গে মূর্ত্তি! মাথার চুল ছোট-বড় ছাঁটা··· বাটারফ্লাই গোঁফ···গায়ে আধময়লা পাঞ্জাবি।

পিসিমা পরিচয় করিয়ে দিলেন—এই আমার ভাইপো···আর এ হলো তারক···আন্নুর দাদা।

তারপর পিসিমা বললেন তারককে—যাও তো বাবা, ওকে সব দেখিয়ে নিয়ে এসো।

—নিশ্চয়···নিশ্চয়।

তারকের সঙ্গে বেরুতে হলো। এপাড়া-ওপাড়া ঘুরে গঙ্গার ধার··· যেখানে মন্দির তৈরী হচ্ছে, সেখানে এলো তারক···সঙ্গে অবনী।

তারক বললে—এই মন্দির। পিসিমা কম টাকা খরচ করছেন! যত মিস্ত্রী-মজুর···ওঁর দয়ার দানে বর্ত্তে গেছে। তারা খেতে পায় না। কে আর এখানে বাড়ী-ঘর তৈরী করছে, বলুন?

মন্দির দেখতে দেখতে পাঁচটা কথা···

অবনী বললে—আপনি কি করেন ?

—কি করি ? হেসে তারক বললে—কি না করি···বরং জিজ্ঞাসা করুন —জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ। যে কাজ যখন পাই।

—তার মানে ?

তারক বললে—মুরুব্বি নেই···লেখাপড়াও তেমন শিখিনি তো। তাছাড়া ঐ বোনটা এত বড় হয়ে গলায় বেধে আছে কাঁটার মতো। ওকে ফেলে কোথাও যেতে পারি না তো! এখানে কি কাজ বা মিলবে ? দিনকতক ঐ বাঁশবেড়ের কাছে আছে ডানলপের কারখানা· সেখানে তিন মাস কাজ করেছিলুম—পোষালো না। বামুনের ছেলে মশাই, মিস্ত্রীর কাজ পারবো কেন ? অসুখ হলো···চাকরি গেল। তারপর ওপারে কালনায় এক দোকানে পেয়েছিলুম চাকরি—খাতা লেখা—পনোরোটি টাকা মাহিনা আর একবেলা খেতে দিত। বাড়ী থেকে বেরুতুম ভোরে ··ফিরতুম রাত আটটা-নটায়—তাও সহ্য হলো না। পোট্‌কে বিছানা নিতে হলো! বোনটার বিয়ে দিতে পারতুম···তাহলে ঝাড়া হাত পা নিয়ে বেরিয়ে যেতুম। তা তাও হবার জো নেই! টাকা কোথায় যে বোনের বিয়ে দেবো! ব্যাণ্ডেলে একটা কাজের সন্ধান পেয়েছি···পঁচিশ টাকা করে দেবে বলছে— এক আড়তদারের কাছে···তার মাল-চালানো কাজ। বলছে, সেখানে থাকতে হবে···শনিবার বেলা ছুটোয় ছুটি মিলবে রবিবারে বন্ধ। ভাবছি, সেই চাকরি নেবো। বোনটা একলা থাকবে···আমি শনিবার-শনিবার বাড়ী আসবো—রবিবারটা এখানে থেকে আবার সোমবার ভোরে চলে যাবো।

তারপর প্রশ্ন করবার ফাঁক পায় না অবনী···তারক নিজে থেকে বলে যেতে লাগলো—কাজকে সে ভয় পায় না···মোটর হাঁকাতে জানে— ডানলপের কারখানায় কাজ করবার সময়ে শিখেছিল···শুধু লাইসেন্স নিতে যা

বাকি ! লাইসেন্সটা হলে···শুধু ঐ বোন—নাহলে চলে যেতো কলকাতায়··· মোটর চালাবার কাজ যেমন করে হোক ! শুধু ঐ বোন—তাকে ঘাড়ে নিয়ে কোথাও যেতে পারে না তো !

ছয়

অবনী যা ভেবেছিল, পাঁচ-সাতদিন এখানে থেকে কলকাতায় ফিরবে··· তা ঘটে উঠলো না।

গুরুদেব বললেন—না বাবা, তোমার পরামর্শ চাই। মন্দিরের কাজ শেষ হয়ে এলো। তাছাড়া দোল-পূর্ণিমার দেরী নেই···চৈত্র মাসের গোড়ায় দোল···দোল পর্য্যন্ত থাকো, বাবা—বড় আনন্দ পাবো আমরা।

এঁদের স্নেহ-মমতা···অবনী এ-কথায় না বলতে পারলো না। তাছাড়া মন্দ লাগছে না। কলকাতায় কাজ-কর্ম্ম নেই। কবে কি করবে, বুঝতে পারে না—গড্ডালিকা-প্রবাহে জীবন ভেসে চলেছে ! এবং পল্লীগ্রামে এমন শান্তি···কত রকমের মানুষ-জন। বৈচিত্র্য আছে। কাঁটার মতো যাতনা মাঝে মাঝে পায়···সে ঐ আনন্দময়ীর গায়ে-পড়া ভাবে !

মন্দিরের কাজ দেখছে, আনন্দময়ী এসে হাজির—শুধু-হাতে নয়, চায়ের পেয়ালা হাতে। চায়ের উপর অবনীর আশ্চর্য্য ঝোঁক আছে···পেয়ালা পেলে ছাড়তে পারে না কলকাতায় চা খেতো · কনডেন্সড্ মিল্কে মেশানো চা; এখানকার চা তৈরী হয় গরুর খাঁটি দুধে এবং এ-কথা স্বীকার করতে হবে··· আন্নু চা বানায় ভালো !

আন্নুর দাদা তারকও অবনীকে যেরকম খাতির করে···অবনী বোঝে, পিসিমার কথায় তারকের মনে আশা হয়েছে, বুঝি তার বোনকে অবনীর হাতে গছাতে পারবে। মুখে সে-কথা স্পষ্ট এখনো না বললেও প্রত্যহ হাবে-ভাবে ইঙ্গিতে ভগ্নীদায়ের কথা তুলে তা থেকে উদ্ধার পাবার জন্য যে

দুশ্চিন্তা প্রকাশ করে, তা আর বলবার নয়! একদিন অবনী বলে বসলো—পাত্র দেখুন না! যদি পছন্দ হয়, পিপিমাকে ধরলে এ-দায়ে উদ্ধার পাওয়া হয়তো শক্ত হবে না।

নিশ্বাস ফেলে তারক বলে—কোথায় পাবো মনের মতন পাত্র! আনু লেখাপড়া জানে, শিল্প-কাজ জানে। মানে, বাবার সাধ ছিল মেয়েকে শিখিয়ে পড়িয়ে বেশ ভালো ঘরেই দেবেন। আমাদের বংশ খাটো নয়···তবে বড্ড গরীব। থাকতুম ফরিদপুরে—পাকিস্তান হতে সব ফেলে পালিয়ে নবদ্বীপে আসা। বাবার যা-কিছু ছিল···তাই দিয়ে ঐ ভাঙ্গা বাড়ীটুকু কিনে বাস করছি। এখানে এসে বাবা দুমাসও বাঁচলেন না। মা মারা গেছেন পাঁচ বছর আগে। আমারো কিছু হলো না···এই পাকিস্তানী ভাগ-বাটোয়ারার জন্য। নাহলে ভাবনা থাকতো না অবনীবাবু!

পিসিমার সেবায় আনু নিজেকে একেবারে সঁপে দিয়েছে···অবনী দেখে। পিসিমাও তাই আনু বলতে অজ্ঞান! বুড়া বয়সে মানুষ সেবা পেলে কৃতার্থ হয়। আনুর উপর পিসিমার অনুরাগ খুব স্বাভাবিক এবং সঙ্গত।

পিসিমা অবনীকে খোঁচা দেন···বলেন—মেয়েটিকে দেখছিস তো···পছন্দ হয় না?

অবনী বললে—সুন্দরী নয়···তা কিন্তু বলবো পিসিমা।

পিসিমা বলেন—পটের বিবি কটা মেলে, বাবা? মানুষের মতো চেহারা হবে···নাক মুখ চোখ গড়ন ভালো। রঙটা খুব ফর্শা না হলেও ময়লা নয় আনুর। সে-সবের চেয়ে ঢের বেশী দরকার···বৌয়ের মানুষের মতো মানুষ হওয়া। কাজ-কর্ম্ম···মানুষকে সেবা-যত্ন···মায়া-মমতা—আমি কোথাকার কে···এখানে আমার আসা-ইস্তক বলা নেই, কওয়া নেই, আমার যে কর্ণা করছে! সত্যি অবু, ওকে আমি ভালোবাসি—খুব ভালোবাসি। তোর পরেই আনু···তাই ওকে আপন করে নেবার জন্য আমার এত সাধ!

কথা দে বাবা, 'নো' বলিস নে। সামনের বোশেখ মাসে ঠাকুর প্রতিষ্ঠার পরেই এইখানেই বিয়ে হয়ে যাক। ধুমধড়াক্কার কি দরকার! কি বলিস?

অবনী বললে—রোসো···ভালো করে দেখতে দাও, বুঝতে দাও। এতকাল বিয়ে করিনি···আর এখন হঠাৎ তুমি বলবামাত্র দুম করে অমনি··· এ তো আর তোমার কথায় একবাটি পায়স-পরমান্ন ঢক্ করে খেয়ে ফেলা নয়!

পিসিমার দুচোখের দৃষ্টি হলো কঠিন! পিসিমা বললেন—তা নয় তো কি··· শুনি? ঢেঁকিতে চাল কোটাও নয়। বিয়ে চিরকাল সকলে করে আসছে···তার জন্য এত চিন্তা কিসের? চিন্তা করে তারা—যাদের পয়সাকড়ি নেই—তার কারণ বৌ এনে তাকে খেতে পরতে দেওয়া···তারপর ছেলেমেয়ে হবে···তাদের মানুষ করা। তোর তো সে চিন্তার কারণ নেই। ভগবানের কৃপায় তোমার যা আছে ··তাছাড়া আমার হাতে যা আছে জানো তো, সে সব তোমারি হবে।

অবনী বললে—টাকার কথা নয় পিসিমা, এ হলো মনের কথা। এতকাল বিয়ে না করে যেভাবে থাকা অভ্যাস হয়েছে···বিয়ে করে সে অভ্যাস···

বাধা দিয়ে পিসিমা তুললেন ঝঙ্কার—কিসের অভ্যাস শুনি? এতকাল ভাত-ডাল খাচ্ছো···বিয়ে হলে কি লোহার কুড়ি চিবুতে হবে! এতকাল পায়ে হাঁটছো···বিয়ে হলে হাতে হাঁটতে হবে না তো! অভ্যাসের মানে? মায়ের পেট থেকে পড়েই কেউ বিয়ে করে না···বিয়ে করে বয়স হলে— অনেক কিছু বয়সে অভ্যাস হয়ে যায়···বিয়ের পর সে-অভ্যাস'কে কবে ছেঁটে ফেলেছে···শুনি?

অবনী হাসলো···বললে—কি যে তুমি বলো পিসিমা। তা নয়, তা নয়···

—তবে? পিসিমা আবার তুললেন ঝঙ্কার···বললেন—আচ্ছা, বল্··· বল্ আমার দিকে চেয়ে···আমু এই যে এত কর্ণা করে···মেয়েটা ভালো নয়? বল্? খারাপ মেয়ে ও?

—তা নয়। মেয়েটির এ-পর্য্যন্ত চালচলন ভালোই।

পিসিমা বললেন—গেঁয়ো বলবি! তা নয়! বলবি, বাঙাল দেশের। ওর কথায় বা আচারে ব্যবহারে তা বোঝবার উপায় আছে? শুনেছি, ওর মামা কলকাতায় চাকরি করতো···তার কাছে থেকে ও লেখাপড়া করতো। কথায় এতটুকুন টান নেই!

অবনী আবার হাসলো···বললে—আহাহা, কথায় টান বা দোষ থাকলেই কি মেয়ে গ্রহণযোগ্য নয়? তা নয়। তবে···উঁহু, বিবাহ অমনি করলেই হলো! এতকাল করিনি···সে কি পাত্রীর অভাবে?

তবু পিসিমাকে ঘাঁটাতে চা'য় না। বুড়ো মানুষ···মনে ব্যথা পাবেন··· বলচেন—বোশেখ মাসে···তার এখনো বহু বিলম্ব। কথায় বলে, দেয়ার্স মেনি এ শ্লিপ বিটুইন দি কাপ এ্যাণ্ড দি লিপ! যথাসময়ে একটা কোনো ছল···তার উপর এখানে থেকে বিবাহ হবে না—পিসিমা তো মন্দির প্রতিষ্ঠার পর কলকাতায় ফিরবে!

সেদিন অবনীর কি খেয়াল হলো···কুলদীপকে বললে—নৌকো করে বেড়ানো যায় না?

কুলদীপ বললে—কেন যাবে না? নবদ্বীপ থেকে বরং ঘুরে আসুন শান্তিপুর···গঙ্গা পার হয়ে ওপারে পাবেন চূর্ণী নদী···সেই নদীর উপর শান্তিপুর···সকালে খেয়ে-দেয়ে বেরুবেন—দেখে-শুনে ফিরতে পারবেন রাত আটটার মধ্যে।

অবনী উৎসাহিত হলো···বললে—কালই তাহলে যাওয়া যাক। আপনি পারবেন যেতে?

কুলদীপ বললে—না। আমার নানা কাজ…পূজাটুজা আছে। তারককে বলবো?

—না। একাই যাবো। অবনী বললে।

রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার সময় কথাটা অবনী বললো পিসিমাকে। পিসিমা খুশী-মনেই বললেন—তা যা…ঘুরে আয়। তোর মতো মানুষ…এক জায়গায় বসে আছিস…আমি আশ্চর্য্য হচ্ছি! তবে খাবার-দাবার তৈরী করে দেবো। বিকেলে জলখাবার খাবি তো?

অবনী বললে—না, না, শান্তিপুরে খাবারের দোকান পাবো না?

কুলদীপের মা বললেন—না বাবা, সে সব নোংরা। তোমার ভালো লাগবে না। তাছাড়া দোকানের খাবার খেয়ে যদি অসুখ করে! বাড়ীতে খাবার তৈরী করে দেবো…লুচি, ভাজা, আলুর দম, কিছু মিষ্টি…

পিসিমা বললেন—খাবার জল এখান থেকে নিয়ে যাবি। যেখান-সেখানকার জল খাওয়া হবে না।

পরের দিন…ভালো একখানি নৌকো ভাড়া করা হয়েছে…নটার সময় খাওয়া সেরে অবনী গিয়ে নৌকোয় উঠবে—দেখে, এত বড় খাবারের চাংড়া হাতে নিয়ে আমু ঘাটে উপস্থিত…বাড়ীর চাকর কুঁজোয় করে জল এনেছে।

অবনী বললে—এত বড় চাংড়া! সেখানে আমি দ্বাদশটি ব্রাহ্মণ ভোজন করাতে যাচ্ছি না কি? এঁরা এ করেছেন কি?

মৃদু হেসে আনন্দ বললে—পিসিমা আমাকে বলেছেন, সঙ্গে যেতে। দুজনের খাবার।

—তুমি যাবে! অবনী যেন আঁৎকে উঠলো! ভাবলো, পিসিমা রীতিমত নাটক রচনা করতে চান্ যে! ভেবেছেন, এমনি করে…

মনে মনে হাসলো। আনন্দ বললে—আমি দাদার সঙ্গে দু'তিনবার শান্তিপুরে গিয়েছি। ওখানকার পথ-ঘাট জানি।

—বটে! গাইড হয়ে চলেছো! কিন্তু সেখানে দেখবার মতো কি আছে?

—তা অনেক কিছু। বিশেষ…তাঁতিপাড়ায় দেখবেন কত কাপড় তৈরী হচ্ছে।

—ও…শান্তিপুরী ধুতি-শাড়ী! ঠিক…ঠিক! আমার খেয়াল ছিল না। আনন্দকে তাড়াতে পারে না…কি বলে তাড়াবে? ভাবলো, সে হিমাদ্রি নয় যে, অবিবাহিতা কিশোরী দেখলেই প্রেমে জর্জ্জরিত হবে। অবনী নৌকোয় উঠে বসলো…আনন্দও বসলো। নৌকো চললো। গঙ্গা পার হয়ে চূর্ণীতে ঢুকলো নৌকো। অবনী বললে—তোমার দাদা এলেন না কেন?

আনন্দ বললে—দাদা কোথায় গিয়েছে কাল বিকেলে চাকরির চেষ্টায়।

অবনী বললে—বটে!…আচ্ছা, আমু…কলকাতায় তুমি ছিলে তো?

—হ্যাঁ…দশ বছর বয়স থেকে পনেরো বছর বয়স পর্য্যন্ত।

—তারপর দেশে গিয়েছিলে?

—হ্যাঁ।

—এখানে তোমার ভালো লাগে? না, কলকাতায় ভালো লাগতো?

আনন্দ বললে—আমরা গরীব মানুষ…আমাদের আবার ভালো লাগা, না-লাগা কি! যখন যেমন অবস্থা…

অবনীর মনের তারে ঘা লাগলো—আহা, বেচারী! বুঝলো, মেয়েটির মনে ভবিষ্যৎ নেই বললেই হয়! কি ও ভাবে, কে জানে!

তারপর একথা-ওকথা…আনন্দ বললে—দোলের সময় পর্য্যন্ত আপনি এখানে থাকবেন? পিসিমা বলছিলেন!

—হ্যাঁ। দোলে খুব ঘটা হয়?

—হয়। আনন্দ বললে—দোলের সময় ঠাকুরকে কত গহনা পরিয়ে সাজানো হয়…তার উপর ফুলের মালা…আবীব কুঙ্কুম। খুব ঘটা হয়। আশ-পাশের গ্রাম থেকে অনেক লোক দেখতে আসে। তাছাড়া নবদ্বীপে দোলের সময় বড় মেলা বসে…কত দোকানী-পশারী আসে…বজরায় করে ষ্টিমারে করে কলকাতা থেকেও অনেক লোক দেখতে আসে!

—হুঁ…খুব ভালো কথা।

আনন্দব সেবা-যত্ন…সে যেন মাহিনা-কবা দাসী…দাসীর চেয়েও বেশী! মাহিনা-করা দাসীও এমন নিষ্ঠাভবে কাজ করে না…আনন্দ যেমন করে! অবনী অবাক হয়ে থাকে। পিসিমা তাকে বাব-বার উৎসাহিত করেন—মেয়েটিকে দেখছিস তো…আমার এত বয়স হলো…কত-রকমের কত মেয়েই দেখেছি…কিন্তু আনুব মতো? এ-বাড়ীতে দোলেব সময় সাজানো-গুছোনোর কাজ আনু বলে, ও করবে! তা পাববে। যেমন বুদ্ধিমতী, তেমনি দরদ আর নিষ্ঠা ওর!

দোল এলো…দোলের বিরাট আয়োজন…বিশেষ করে এবাবে পিসিমা দুহাতে আনুকূল্য যা বর্ষণ করছেন…

দোলেব দিন সকালে রাধাশ্যামের বিগ্রহ সাজানো…বড় বড় ফুলের মালা আনু নিজেব হাতে যত্নে গেঁথেছে…ফুল-পাতা দিয়ে অঙ্গন সাজানো—একা মানুষ যেন দশভূজা হয়ে কাজ করছে!

ঠাকুবেব গহনাপত্র আছে—নানা যজমানের দেওয়া, পিসিমাও দিয়েছেন এবারে এসে নতুন গহনা গড়িয়ে। দোলের দিন বিগ্রহকে চিরদিন গহনা দিয়ে সাজানো হয়…রীতি। বৈশাখী পূর্ণিমা, ঝুলন পূর্ণিমা, রাস পূর্ণিমা আর দোল পূর্ণিমা—এ কদিন সমারোহের সীমা থাকে না। ঠাকুরের গহনার ছোট সিন্দুকের চাবি কুলদীপের মা দিয়েছেন

আন্নুকে···বলেছেন—এদিককার সাজানো চুকলে, তুমি মা, গহনা বার করে ঠাকুরদের সাজিয়ে দিয়ো···রাত্রে মহাসমারোহে পূজা হবে—কত লোক আসবে, দেখবে।

তাঁর এ-আদেশ আন্নু অক্ষরে অক্ষরে পালন করলো। রাত্রে একশো আট প্রদীপ জ্বললো। অবনীও মহা উৎসাহে গঙ্গাপদকে চিঠি লিখে তাকে দিয়ে আনালো বেশ নক্সাদার একরাশ রঙীন চীনা-লণ্ঠন।

এবং সজ্জায় বাহার যা খুললো, এ-অঞ্চলে এমন কেউ দেখেনি।

রাত্রে পূজার পর প্রসাদ···বহু লোক এখানে বসে খাওয়া-দাওয়া করলো এবং তারপর আরো দুদিন পূজার আর খাওয়া-দাওয়ার সমারোহ চললো। চতুর্থ দিনে ঠাকুরের গহনাপত্র আবার উঠলো সিন্দুকে এবং সমারোহ-পর্ব্ব সমাপ্ত। বাড়ী যেমন···আবার তেমনি।

আরো দুদিন পরের ঘটনা···

বিকেলের দিকে তারক এসে হাজির। অবনী বেরুবার উদ্যোগ করছে··· তারক এসে বললে—আপনার কাছে আসছি···ভয়ানক দরকার।

—কি···বলুন তো?

তারক বললে—আপনি বেরুচ্ছেন···তা, চলুন, যেতে যেতে বলবো।

যেতে যেতে তারক যা বললে···তার মর্ম্ম: সে বেশ ভালো চাকরির জোগাড় করেছে···অর্থাৎ ঐ বাঁশবেড়েতেই···জটাধারী কোম্পানি মস্ত ইটখোলা করেছে···সেই ইটখোলার ম্যানেজারী। সেইখানে ঘর-বাড়ী পাবে থাকবার জন্য, একটা চাকর পাবে···মাহিনা মাসে পঞ্চাশ টাকা এবং মালপত্র যা বিক্রী হবে, তার উপর পাঁচ পার্সেণ্ট কমিশন। ঘোরাঘুরি করতে হবে খুব, তার খরচ আলাদা পাবে। কিন্তু পাঁচশো টাকা জামানত রাখতে হবে নগদ। সেভিংস ব্যাঙ্ক থেকে কুড়িয়ে-বাড়িয়ে দুশো হবে···

কিন্তু তিনশো টাকার অভাব—তা অবনীবাবু যদি দয়া করে এ-টাকাটা ধার দেন···শুধু-হাতে নয়···তারকের যে বাড়া-ঘর আছে, সেই বাড়ী-ঘর বন্ধক রেখে···কিম্বা অবনীবাবু যদি বলেন, বোন আন্নুর দু-একখানা সোনার গহনা বন্ধক রেখে—এ-টাকা সে ছমাসে শোধ করে দেবে। অবনীবাবু এ-দয়াটুকু না করলে তার পক্ষে বাচা দার হবে। নিজের জন্য হলে ভাবনা ছিল না···কিন্তু ঐ বোনটা···

কথা সে শেষ করলো দুচোখ রীতিমত অশ্রুসিক্ত করে। অবনী হতভম্ব! মনে হলো, বোনকে লাগিয়ে সেবায়-যত্নে মন ভিজুনোর এই উদ্দেশ্য? টাকা আদায়! সঙ্গে সঙ্গে মনে হলো, না ··বেচারী···বেকার··· টাকা রোজগারের চেষ্টা করছে। তাছাড়া ধাব চাইছে, তাও শুধু-হাতে নয়···বাড়ী বন্ধক রাখবে, না হয় গহনা! ভাবলো, মানুষকে সন্দেহ করা শুধু অন্যায় নয়···পাপ!

তবু সে বললে—কিন্তু এত টাকা···এখানে রয়েছি আমি···

তারক কেঁদে ফেললো···প্রায় পায়ে পড়ে বললে—আপনি দয়া করুন। দয়া···দয়া···নাহলে দুজনে মরে যাবো!

নিরুপায়! অবনী বললে—আচ্ছা, ভেবে দেখি। ফশ করেই···মানে, কাল আপনাকে বলবো।

—না, বলা নয়···আপনাকে এ-দয়া করতেই হবে।

প্রায় ঘণ্টাখানেক এমনি কাকুতি-মিনতি এবং চোখের জল···অবনী বললে—দেবো। কিন্তু বাড়ী-টাড়ী বন্ধক দিতে হবে না। আপনার যদি উপকার হয় ··

তার কথা শেষ হলো না···অবনীর দুহাত চেপে ধরে তারক বললে— আমাদের প্রাণ দান করলেন। ভগবান আছেন মাথার উপর—তিনি··· তিনি···তিনি···

অশ্রুর বাষ্পে তারকের কথা শেষ হলো না।

তার পর অবনীকে বলতে হলো—বেশ, কাল সকালে দেবো টাকা।

—আমি আসবো ?

—না, আপনি আসবেন না। আমি আপনার বাড়ীতে এসে দিয়ে যাবো। পাঁচজনে না-ই বা জানলো!

গদগদ বচনে তারক বললে—আপনি মহৎ, জানি···কিন্তু এত মহৎ !

পরের দিন সকালে অবনী এসে দিলে তারকের হাতে তিনশো টাকা—দোলের সময়ে গঙ্গাপদকে দিয়ে সে-টাকা আনিয়েছিল। তারক মহাখাতির করে চা খাওয়ালো, আনুর হাতের তৈরী মালপোয়া খাওয়ালো···তারপর সোনার একছড়া হার নিয়ে মিনতি—এটা রাখুন কাছে···না, না, আমি কোনো কথা শুনবো না। দয়া···দয়া, তাছাড়া এটা আপনার কাছে থাকলে আমারো চাড় হবে দেনা শোধ করবার—আপনি 'না' বলবেন না। দয়া···দয়া···

দয়ার মাত্রা বাড়াতে হলো এবং অবনীকে সে হার নিতে হলো। তারক বললে—গিনি সোনা, ওজনে আট ভরি আছে।

অত হিসাব নেবার প্রয়োজন নেই অবনীর···সে বললে—না দিলে পারতেন···আমি বলিনি, চাইনি। বিশ্বাসের কাজ।

—না, না, না, আপনি যত বিশ্বাসই করুন, আমার মন···আনুও বলেছে, শুধু-হাতে নিয়ো না···কিছুতে না···তাতে যদি উনি টাকা না দেন, সে-ও স্বীকার ?

কাজ চুকলো···অবনী ফিরে এলো। হারছড়া পিসিমার কাছে রাখবে···কিন্তু পিসিমার দেখা পেলে না। পিসিমা গিয়েছেন কুলদীপের ছোট ভাইয়ের সঙ্গে বাঁশবেড়ের হংসেশ্বরীর মন্দির দেখতে—ফিরবেন রাত্রে।

পরের দিন সকালে কিন্তু কুরুক্ষেত্র ব্যাপার।

সকালে পিসিমার হাতে হারছড়া দিয়ে অবনী তাঁকে জানালো তারকের ব্যাপার।

হারছড়া হাতে নিয়ে পিসিমা যেন চমকে উঠলেন! তিনি বললেন—এ হার…এ হারছড়া যে আমার রে! আমি রাধাঠাকরুণ বিগ্রহকে দিয়েছিলুম।

অবনী চমকে উঠলো—এঁ্যা!

কুলদীপের মাকে পিসিমা দেখালেন হার, তাঁকে বললেন সব কথা। কুলদীপের মার মনে হঠাৎ যেন বিদ্যুতের চমক! তিনি বললেন—তাহলে?

এটুকু বলেই তিনি খুললেন ঠাকুরের গহনার সিন্দুক…দেখেন, হার নেই…তাছাড়া কুচোকাচা আরো কখানা গহনা নেই। তাহলে…

বুঝতে দেরী হলো না। তিনি বললেন—আন্নুকে চাবি দিয়েছিলুম… সে গহনা বার করেছিল, তারপর গহনা তুলেও রেখেছিল। সেই সময়ে…

কুলদীপকে পাঠালেন তারকের বাড়ী। বাড়ী খালি…না আছে তারক, না আন্নু।

কুলদীপ বললে—পুলিশে খবর দিই? চুরি।

পিসিমা বললেন—থাক ভাই, মিথ্যে হৈ-হৈ করে কি লাভ। ঠাকুর খুব রক্ষা করেছেন! ঐ চোরের সঙ্গে অবুর বিয়ে দেবো ঠিক করেছিলুম!

হেসে অবনী বললে—বুঝলে তো পিসিমা, অজানা মেয়েকে বিয়ে করতে কেন আমার গা ছমছম করে।

পরে আরো খবর মিললো—বাড়ীখানি তারক দিন পনেরো আগে এক বেহারীকে নগদ দেড় হাজার টাকায় বেচে দিয়েছে। বেহারী-লোকটা ওখানে কি নাকি কারবার খুলবে; এবং তারক তার বোনকে নিয়ে ফেরার।

গুরুদেব বললেন—দুঃখ হয়, মা! আমাদের এত আদর, এত ভালোবাসা —আর ভিতরে-ভিতরে এমন বদমায়েশি! অল্পের উপর দিয়ে রক্ষা পেয়েছো মা। অবনীবাবুর সঙ্গে বিয়ে হতো যদি···

অবনী বললে—পিসিমাকে মানা করে দিন, আর যেন এমন মেয়ে দেখলেই······

দ্বিতীয় পর্ব্ব

এক

বৈশাখী পূর্ণিমায় গুরুদেবের মন্দির প্রতিষ্ঠার পর ছমাস কেটে গিয়েছে।

ওখান থেকে কলকাতায় ফিরে ধমক-চমক এবং চোখে বহু জল বর্ষণ করে পিসিমা বেরিয়েছেন অবনীকে নিয়ে ভারতের তীর্থ-পরিক্রমায়। পিসিমা মোক্ষম অস্ত্র ত্যাগ করেছিলেন···বলেছিলেন—সারাজন্মটা তোদের সেবা করে কাটালুম রে, পরকালের পুঁজির কিছু জোগাড় হলো না। এখন মানুষ হয়ে উঠেছিস···আমার ঋণটা অন্ততঃ শোধ কর্। আমি তীর্থে বেরুবো··· তুই সঙ্গে না থাকলে শেষে বেঘোরে অপমৃত্যু ঘটবে? বল্! তাছাড়া কোনো কাজকর্ম্ম করতিস, তাহলেও কথা ছিল! কাজ নেই, কর্ম্ম নেই, বিয়ে-থাও করলি না···যে হ্যাঁ, বৌকে কে দেখবে! চ—না যাস···আমি একাই যাবো গঙ্গাপদকে নিয়ে।

কথাটা শেষ করে পিসিমা মস্ত নিশ্বাস ফেলেছিলেন। অবনীর কি মনে হলো···সে বললে—বেশ, চলো পিসিমা।

এবং অবনীর মত হতে আর বিলম্ব করা নয়—জ্যৈষ্ঠ মাসের গোড়াতেই পিসিমা বেরিয়ে পড়লেন। কলকাতার বাড়ীতে রইলো গঙ্গাপদ সপরিবারে

এবং অন্য লোকজন। পিসিমা আর অবনীর সঙ্গে চললো দরোয়ান মহাবীরপ্রসাদ—ব্রাহ্মণ মানুষ···তদ্বির-তদারকের উপর রান্নাবান্নাও করতে পারবে, অবনীকে রেঁধে খাওয়াবে।

এদিককার তুটো খবর আমাদের এখন জানা দরকার—স্যর বিদ্যুৎবরণ এবং হিমাদ্রির খবর।

স্যর বিদ্যুৎবরণ কথার মানুষ···জীবনে কখনো তিনি কথার খেলাপ করেন নি। বলেছিলেন, মালতী দেবীর পাণিগ্রহণ···সে-কাজ তিনি সম্পন্ন করেছেন নির্দ্দিষ্ট সময়ে; এবং এ-বিবাহের মাসখানেক পরে হিমাদ্রির হঠাৎ কি হলো, ছ মাসের ছুটি এবং কাকাব অনুমতি নিয়ে সে বেরিয়ে পড়েছে। বলে গিয়েছে, সরকারী এই সব নির্ম্মাণ-পরিকল্পনার কাজ দেখে বেশ খানিকটা শিক্ষালাভ করবে।

কাজে তার এমন অনুরাগ দেখে স্যর বিদ্যুৎবরণ খুশী মনে অনুমতি দিয়েছেন এবং বৈশাখ মাস থেকে সে কলকাতা-ছাড়া। কোথায় আছে, অবনী জানে না। জানবার প্রয়োজনও তার হয়নি।

পিসিমাকে নিয়ে প্রথমে সে চললো হবিদ্বার—তার পর সেখান থেকে লছমনঝোলা, কেদারবদরী ঘুরে বৃন্দাবন, মথুরা হয়ে আশ্বিন মাসে এসেছে কাশীতে।

কাশীর অসিঘাটেব কাছে বেশ ফাঁকা ফর্দ্দা জায়গা দেখে কম্পাউণ্ড-ওয়ালা একতলা একখানি বাড়ী ভাড়া করে সেখানে পিসিমার সঙ্গে বাস করছে অবনী।

সংসার এখানে কায়েমিগোছ দাঁড়াচ্ছে। তার কারণ, পিসিমার ভারী ভালো লেগেছে। একখানা টঙ্গা ভাড়া করা হয়েছে—বাড়ীর লাগাও আস্তাবলে টঙ্গা থাকে এবং পিসিমা সকাল থেকে যে চক্কর সুরু করেন···

অর্থাৎ সকালে উঠে অসির ঘাটে স্নান করে ওদিকে দুর্গাবাড়ীতে পূজা—তারপর টঙ্গায় চড়ে দশাশ্বমেধে এসে বিশ্বনাথ অন্নপূর্ণা দর্শন···বাড়ী ফেরেন বেলা প্রায় একটা-দুটোয়···এসে নিজের রান্নাবান্না, খাওয়া ; তারপর সন্ধ্যার আগে টঙ্গায় করে বেরিয়ে মন্দির···

অবনী এখানে এসে পাড়ায় বন্ধু পেয়েছে। কোথাকার কুমার সাহেব—তাঁর গান-বাজনার সখ। গান-বাজনায় অবনীর ঝোঁক···কাজেই সে আরামে আছে।

বিজয়া দশমীর দুদিন পরে রাত্রে আরতি দেখে বাড়ী ফিরে পিসিমা বললেন—এখানে জানিস, আমার পিসশাশুড়ীর ছেলে·· আমার দ্যাওর হয়—সদাশিব হালদার—মস্ত ডাক্তার···লক্ষ্ণৌয়ে থাকতো···সরকারী কাজ করতো···পেন্সন হয়েছে। তাই এসে সিক্রায় বাড়ী কিনে বাস করছে। তার সঙ্গে হঠাৎ আজ দেখা হলো।

অবনী বললে—চিনলে কি করে ?

পিসিমা বললেন—ওমা, সে ভারী আশ্চয্যি কাণ্ড রে! সিক্রার ওদিকে ঐ সেবাসঙ্ঘ আছে না, তা রোজ মায়ের মন্দিরে দেখা হয়···আমাদের কলকাতার কাছে আছে নিমতে—নিমতের বাঁড়ুয্যে-গিন্নী কাশীবাস করছেন। তাঁর সঙ্গে খুব ভাব হয়েছে। ভারী চমৎকার মানুষ! তিনি বললেন, সেবা-সঙ্ঘ দেখতে যাবে, দিদি ? বললুম, যাবো। সঙ্ঘ থেকে বেরুচ্ছি—দেখি, সঙ্ঘর খুব কাছে গলির মুখে মস্ত বাড়ী-বাগান···ফটকওয়ালা বাড়ী। দেখে চিনতে পারলুম, আমার পিসশ্বশুরের বাড়ী। তাঁর নাম ছিল ভোলানাথ হালদার। দেখি, বাড়ীতে লোকজন···মোটরগাড়ী দাঁড়িয়ে। বাঁড়ুয্যে-গিন্নীকে বললুম, আমার পিসশ্বশুরের বাড়ী। ভাড়া দিয়েছে বুঝি পিসতুতো দ্যাওর। তাতে তিনি বললেন, না, না···ডাক্তারবাবু থাকেন ও-বাড়ীতে ···তাঁর নাম সদাশিব হালদার। বাঁড়ুয্যে-গিন্নী বললেন, ডাক্তারবাবুর বৌকে

তিনি জানেন···তাঁদের গাঁয়ের মেয়ে···আসেন-যান—এখন নাকি বাতে পঙ্গু। শুনে আমি দেখতে গেলুম বাঁড়ুয্যে-গিন্নীর সঙ্গে। গিয়ে চেনা-জানা। ছাওর সদাশিব মস্ত ডাক্তার···বরাবর লক্ষ্ণৌয়ে ছিল···ওখানকার হাসপাতালে—পেন্সন হয়েছে···তাই লক্ষ্ণৌ ছেড়ে কাশীতে নিজের বাড়ীতে এসে বাস করছে। অনেক টাকা···এখানে একটা ডাক্তারখানা করেছে। মাথা খারাপ, পাগল···তাদের চিকিৎসা করে—সে-সব রোগীর জন্য ডাক্তারখানা করেছে।

পিসিমা বললেন—দেখা হলো সদাশিবের সঙ্গে···অনেক করে বললে, এখানে এসে থাকো বৌদি। কোথায় অসিতে বাড়ী ভাড়া করে পড়ে আছো! আমার বাড়ীতে এত জায়গা থাকতে কেন তা থাকবে? তোমার কথা বললুম। শুনে দাদার নাম করে বললে, তার ছেলে···বটে! দাদার সঙ্গে সদাশিবের ভাব ছিল তো।

অবনী বললে—সেখানে আস্তানা তুলে নিয়ে যাবে না কি?

পিসিমা বললেন—অত করে বলছে···আপন-জন···কত বছর পরে দেখা। তোমার পিসেমশায় মারা যাবার পর থেকে শ্বশুর-বাড়ীর কাকটাকেও দেখিনি তো!

অবনী বললে—না পিসিমা···জানো তো, আমাদের দেশে কথা আছে···পর-ঘরী হওয়া ঠিক নয়। সেখানে আড়ষ্ট হয়ে থাকা···না বাবা, আমি পারবো না! আমাকে তাহলে ছুটি দাও···আমি সোজা কলকাতায় চলে যাই। তুমি একা সেখানে গিয়ে থাকো—আমিও নিশ্চিন্ত থাকবো···তোমাকে দেখবার লোক আছে তোমার এ বয়সে—মরে ঘরে পচবে না।

হেসে পিসিমা বললেন—তোর যদি অসুবিধা হয়, থাকবো না। তবে কাল তোকে নিয়ে ও বাড়ীতে যেতে বলেছে। তাতে তোর আপত্তি আছে?

মুখখানা কাঁচুমাচু করে অবনী বললে—এই তো খাশা আছি! তুমি আবার আত্মীয়-কুটুম বার করলে···কুটুম্বিতা রক্ষা করতে জান যাবে এবার, দেখছি।

হেসে পিসিমা বললেন—কেন, তোর কি কষ্টটা হবে, শুনি? তারা তোকে বাঁকে করে জল তুলে দিতে বলবে না···বা, তাদের হেফাজতী করতেও বলবে না! মানুষের সঙ্গে মানুষ আলাপ-পরিচয় করবে, তাতে তোর বাধবে কোন্‌খানে ··শুনি? সব তাতে তোর নাক বাঁকানো!

অবনী বললে—বেশ, বেশ, যাবো···কিন্তু বাড়ীতে খাওয়া-দাওয়া সেরে।

—তাই হবে গো, সেখানে তোমাকে পাত পেড়ে খেতে বসতে হবে না।

পরের দিন খাওয়া-দাওয়া সেরে বেলা তিনটে নাগাদ সিক্রা যাত্রা!

গলির মুখে মস্ত কম্পাউণ্ডওয়ালা বাড়ী···সামনে বড় ফটক···ফটক দিয়ে ঢুকে কাঁকর-ফেলা পথে অনেকখানি গিয়ে দোতলা বাড়ী। সামনে টানা রোয়াক···রোয়াকের কোলে সার-সার ঘর—কম্পাউণ্ডে ফল-ফুলের গাছ। একপাশে মস্ত গেরাজ···গেরাজের সামনে বড় একখানা বুইক গাড়ী··· গেরাজের মধ্যেও একখানা বড় মোটর দেখা যাচ্ছে। রীতিমত বড়মানুষী ব্যাপার!

ট্যাক্সি করে আসা···ট্যাক্সি থামতে ডাগর বয়সের একটি মেয়ে এলো বেরিয়ে···মেয়েটির হালফ্যাশনের বেশভূষা···পায়ে চটি।

পিসিমার কাছে এসে মেয়েটি বললে—আসুন, জ্যাঠাইমা।

অবনীকে দেখিয়ে পিসিমা বললেন—এ হলো অবনী···আমার ভাইপো।

—আসুন।

পিসিমা বললেন—তোমার বাবা বাড়ী আছেন ?

—আছেন। বাবা এখন ঘুমোচ্ছে। দুটো থেকে চারটে পর্য্যন্ত বাবা একটু ঘুমোয়···তারপর উঠে চা-টা খেয়ে ডাক্তারখানায় যায় পাঁচটায়।

—মা ?

মেয়েটি বললে—মা আজ ভালো আছে। বাতের ব্যথা কম—দোতলার ঘরে শুয়ে মা বই পড়ছে।

পিসিমা বললেন অবনীকে দেখিয়ে—একে বসবার ঘরে···

বাধা দিয়ে মেয়েটি বললে—কেন, উনিও আসুন। মা দেখবে না ওঁকে ? বা বে !

—আয়, অবু।

পিসিমা আর অবনীকে নিয়ে মেয়েটি এলো দোতলায় মায়ের ঘরে। মা উঠলেন···পিসিমাকে প্রণাম করলেন। পিসিমা তাঁর হাত ধরে বললেন—না বৌ, প্রণাম করতে হবে না হেঁট হয়ে।

অবনীর পরিচয় করিয়ে দিলেন। অবনী প্রণাম করলো। মা বললেন—বসো বাবা। দেখাশুনা নেই···কিন্তু তোমাদের কথা জানি তো। বসো। এ-কথা বলে তিনি চাইলেন মেয়ের দিকে···বললেন—উনি ঘুমোচ্ছেন, না পুনু ?

মেয়েব নাম পূর্ণিমা·· মায়ের প্রশ্নে পূর্ণিমা বললে—হ্যাঁ, মা।

—কটা বাজলো ?

পূর্ণিমা বললে—চারটে বাজতে মিনিট দশ-পনেরো বাকি।

—ও! মা বিন্দুবাসিনী বললেন—তাহলে এখনি উঠবেন৷ ঘড়িতে ওঁর এ্যালার্ম দেওয়া থাকে—ঠিক চারটেয়। এ্যালার্ম বাজার সঙ্গে সঙ্গে উঠবেন। চিরকাল তাই—তারপর একমিনিট আর বিছানায় নয় !

সামনে কৌচ···বিন্দুবাসিনী বললেন অবনীকে কৌচে বসতে। অবনী বসলো।

তারপর নানা কথা···কথায় কথায় বিন্দুবাসিনী বললেন—ভাইপো লেখাপড়া করছে?

—না। বি-এ পাশ করেছে। কাজকর্ম্ম বলতে বাড়ী-টাড়ী, বিষয়-সম্পত্তি দেখা। দু-তিনরকম কারবার করবে বলেছিল···আমিই দিইনি করতে—বলি, জানিস না শুনিস না···কি কারবার করবি? লোকসান দিবি শেষে। গান-বাজনার সখ···তাই করে!

এ-কথায় পূর্ণিমার দুচোখ হলো বড়···সে বললে—কি বাজান আপনি?

অবনী মুখ তুলে চাইলো পূর্ণিমার দিকে···বললে—অর্গান, বাঁশী আর বেহালা।

পূর্ণিমা বললে—ও···আমার বেহালা ভালো লাগে সবচেয়ে।

বিন্দুবাসিনী হাসলেন, বললেন—ভালো হলো···একজন সঙ্গী পেলি তোর বেহালার।

পূর্ণিমা কোনো কথা বললে না। বিন্দুবাসিনী প্রশ্ন করলেন—বিয়ে দিয়েছো দিদি ভাইপোর?

—না ভাই, এত চেষ্টা করছি···মনের মতো মেয়ে পাই না। ও-ও বিয়ে করতে চায় না! বলে, না-জানা কাকে ঘরে আনবে, শেষে সব ছারখার করে দেবে দাপটে! শোনো কথা! যেন বৌয়েরা সব দাপট করে বেড়ায়! তা নয়···মানে, যেমন মেয়ে চাই···দেখতে ভালো হবে—তা বলে ডানাকাটা পরী চাইছি না ভাই—তবে নাক-মুখ-চোখ থাকবে, গড়ন থাকবে, লেখাপড়া জানবে—একালে যেমন হয়েছে···সেই সঙ্গে ঘর-গেরস্থালীতে মন। তা পাই কৈ?

কথা শেষ করে পিসিমা একটা নিশ্বাস ফেললেন।

বিন্দুবাসিনী একাগ্র দৃষ্টিতে চেয়েছিলেন অবনীর দিকে···তিনিও পিসিমার নিশ্বাসে নিজের নিশ্বাস মিলিয়ে বললেন—আমারো সেই দশা,

জানো, দিদি। মেয়েটা শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে একুশ বছরে পড়লো। বিয়ে দেবো···তা মনের মতো পাত্র পাই না। তবে পশ্চিমে ক'ঘর বাঙালী পাবো, বলো? ওঁকে বলি, একবার কলকাতায় পাঠাও আমাকে—মেয়েকে নিয়ে দু-একমাস সেখানে থাকি···সেখানে না হলে পাত্র মিলবে না। তা ওঁর মত হয় না। উনি বলেন, কেন ভাবছো? জন্মেছে যখন, বিয়ে তখন হবেই! পাত্র খুঁজতে হবে না···নিজে থেকে পাত্র এসে হাজির হবে, দেখো! রাগ ধরে কথা শুনে—তা কখনো হয়!

পাশের ঘরে ঘড়িতে এ্যালার্ম বাজলো। পূর্ণিমা বলে উঠলো—ঐ···বাবা এখনি উঠবে। আমি যাই, গিয়ে বলি, জ্যাঠাইমাবা এসেছেন।

এ-কথা বলে পূর্ণিমা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

অবনী আড়ষ্ট কাঠ হয়ে বসে আছে মেয়েদের মাঝখানে। মেয়েদের এসব অত্যন্ত মেয়েলি কথা···কতক্ষণ শুনতে হবে, ভেবে সে আতঙ্কে কাঁটা!

হঠাৎ সে ডাকলো—পিসিমা···

—কেন?

অবনী বললে—আমি বরং নীচে যাই···একটু ঘুরে সব দেখি।

নীচে মস্ত বাগান···ফুলের আর ফলের বাগান···আম, পেয়ারা, কলা—কোন্ ফলের না গাছ আছে! অবনী নিজের মনে ঘুরে ঘুরে দেখছে। বাগানের শেষ প্রান্তে টানা পাঁচিল···পাঁচিলের ওদিকে গলি-পথ···সে পথের দিকে চেয়ে আছে! কটা মন্দিরের চূড়া দেখা যাচ্ছে···মোড়ে একটা কুয়া···শান্‌বাঁধা—এদেশী বহু মেয়েপুরুষ তামার আর লোহার ঘড়া-বালতি নিয়ে কুয়াতলায় জমায়েৎ। এক্কা চলেছে—ঘোড়ার গলায় বাজছে ঠুনঠুন শব্দে ঘণ্টি।

অবনীর ভালো লাগছে…এসবে শহরের উগ্রতা নেই…কেমন একটু সহজ সারল্য যেন! শহুরে মানুষজন ধীরপায়ে হাঁটে না…সকলে ছুটে চলে…হেঁটে, ট্রামে-বাসে, সাইকেলে, মোটরে…কাজের মত্ততায় মানুষ সেখানে নিজের চেতনা হারিয়ে ছুটছে আর ছুটছে—কোনো দিকে এক সেকণ্ড তাকাবে…স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে…তার অবসর নেই। দাঁড়িয়ে তাকাতে সেখানকার মানুষ ভুলে গেছে! আর এখানে? অবনীর মনে হলো, এরা বাঁচতে জানে এবং যতটুকুর নাগাল পা', ভালো করে তা জেনে বুঝে এরা বাঁচতে চায়। দাঁড়িয়ে চারিদিকে তাকিয়ে এই যে এরা চলেছে জীবনের পথে, কৈ, সেজন্য কারো মনে অসন্তোষ বা অতৃপ্তি নেই তো! সকলে বেশ হাসছে—কথা কইছে—দেখে-শুনে মনে হয়…সুখেই আছে। আর কলকাতার শহরে? অত ছুটোছুটি, হুটোপাটি, তবু কজনের মুখে সেখানে হাসির রেখা? একশো-জনের মধ্যে পঁচানব্বই জন ম'নুষ কপাল কুঁচকে আছে…নিশ্বাস ফেলছে…যেন বড় শ্রান্ত…যেন আর তারা পারে না জীবনের বোঝা বয়ে পথে চলতে।

এমনি চিন্তার মধ্যে একটি কণ্ঠ…

শুনে অবনী চমকে উঠলো। কণ্ঠ অনুসরণ করে চেয়ে দেখে, বাহিরে গলি-পথে…স্বপ্ন? না, মায়া? না, মতিভ্রম? হিমাদ্রি! হিমাদ্রির সঙ্গে বারো-তেরো বছর বয়সের ভোঁদা নাদুশ নুদুশ এক ছেলে—ছেলের পরণে শর্ট, গায়ে হাফসার্ট…পায়ে জুতা মোজা।

অবনীর বিস্ময়ের চমক নিমেষে ভাঙ্গলো…না…স্বপ্ন নয়, ছায়া নয়—কায়া-দেহে হিমাদ্রিই! অবনী ডাকলো—হিমাদ্রি…

সে ডাক শুনে হিমাদ্রি তাকালো। সে যেন ভূত দেখেছে…তার এমন ভাব!

অবনী বললে—তুমি এখানে!

—হ্যাঁ, আসছি···সব বলবো। কিন্তু তুমি হঠাৎ?

অবনী বললে—হঠাৎ নয়···সুস্থ মনে বিচার-বিবেচনা করেই এসেছি।

হিমাদ্রির সঙ্গী ছেলেটি প্রশ্ন করলে হিমাদ্রিকে—কে···মাষ্টার মশাই?

ছেলের নাদুশ-নুদুশ চেহারা, হাবভাব আহ্লাদেপানা···কণ্ঠও তেমনি। মাষ্টার মশাই! অবনী বুঝলো, ভিতরে রহস্য আছে! এবং···

দুই

সে-রহস্য প্রকাশিত হলো অচিরে।

হিমাদ্রি এলো এই বাগানেই···ভোঁদা ছেলেটা সঙ্গে নেই···সে এলো একা এবং নিজের সম্বন্ধে যে কথা বললো···তাতে বেশ রোমান্স! অর্থাৎ···

মালতী-মাসিকে বিবাহ করেছেন কাকা স্যর বিদ্যুৎবরণ। বিবাহের পরে কাকাবাবুর মনের যে পরিবর্ত্তন হয়েছে, হিমাদ্রি বললে—সিনেমার গল্পে বাধাবন্ধ-হারা, সঙ্গতিবিহীন ঘটনার যে ধারা বয়, এ-ঘটনা তার চেয়েও···মানে, আজগুবি—কোনো লজিক পাবে না! বিবাহের পর কাকাবাবু এ-বয়সে যেন নবযৌবন পেয়ে মত্ত হয়ে উঠেছেন। কাজকর্ম্ম···একজন পাকা অফিসারের হাতে দিয়ে তিনি 'হনিমুনিং' করে···বিগত জীবনের কর্ম্মতপশ্চরণের জন্য যে সুখ হারিয়েছেন···সে-সুখ পুনরুদ্ধার করতে চান! স্পষ্ট ভাষায় তিনি হিমাদ্রিকে বুঝিয়ে দিলেন···এ-অফিসার তাঁর নিজের দায়িত্বে ফার্ম চালাবেন···নিজের বাছাই-করা লোকজন দিয়ে চালাবেন। কাকাবাবুর আমলের বহু কুপোষ্য যে-টাকাটা নিয়ে অপব্যয় করছে, তা আর চলবে না! হিমাদ্রিকে তিনি অত টাকা দিয়ে ম্যানেজমেণ্টে রাখতে পারবেন না—তবে স্যর বিদ্যুৎবরণের ভাইপো এবং সে-হিসাবে অবশ্যপাল্য-বিবেচনায় তিনি দেবেন হিমাদ্রিকে মাসে একশো টাকা করে এ্যালাউয়্যান্স এবং তার ডিউটি

হবে, প্রাত্যহিক ডে-বুক লেখা এবং কাজের হিসাব চেক্ করে তা খাতায় টোকা! অপমানে এ-প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে হিমাদ্রি চলে এসেছে। মান রাখতে বাহিরে সে প্রচার করেছে—ছুটি নিয়ে কিছুকাল ঘুরে বেড়াবে!

হিমাদ্রি বললে—ঘোরা মানে চাকরির চেষ্টা। সে-চেষ্টা কতখানি সাংঘাতিক হতে পারে, সুখ-শয্যাসীন থাকার দরুণ হিমাদ্রির কোনো আইডিয়া ছিল না সে-সম্বন্ধে; এবং এই অসাধ্য-সাধন-ব্রতে তার ব্যাঙ্কে মজুত টাকার অঙ্ক যখন প্রায় মিনিমামে এসে পৌচেছিল, তখন খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে, কাশীর সিক্রায় ডাক্তার সদাশিব চান তাঁর ছেলের জন্য একজন গৃহশিক্ষক। শিক্ষক এ-গৃহে প্রতিপালিত হবেন, সর্ব্বক্ষণ ছেলের সঙ্গী-সহচরের মত হয়ে থাকবেন···থাকার জন্য প্রাসাদপুরীতে ঘর পাবেন, সুখাদ্য সুপেয় প্রভৃতি মিলবে এবং মাহিনা পাবেন মাসে আড়াইশো টাকা! অর্থাৎ এ-বাড়ীর স্বজনবৎ এ-শিক্ষককে সকলেই মানবে! সেই বিজ্ঞাপন দেখে হিমাদ্রি বরাত ঠুকে দরখাস্ত দিয়েছিল। লগ্ন ভালো ছিল···দরখাস্তের জবাবে এ-চাকরি মিলে গেল। এখানে সে আছে আজ তিনমাস···এ-গৃহের আপন-জনের মতো আদরে-মর্য্যাদায়! কিন্তু···

অবনী বললে—কিন্তু···মানে?

হিমাদ্রির বুকখানা ছাঁৎ করে উঠলো···মাথার মধ্যে রক্ত উঠলো ছলাৎ করে।

কম্পিত মৃদু কণ্ঠে হিমাদ্রি বললে—সদাশিব বাবুর মেয়েকে দেখেছো··· পূর্ণিমা দেবী?

অবনী বুঝলো। বুঝে হেসে অবনী বললে—প্রেম?

নিশ্বাস ফেলে হিমাদ্রি বললে—নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করছি·· ক্ষত-বিক্ষত হচ্ছি! তবু···

অবনী বললে—পূর্ণিমা দেবী জানে?

—না। আমার সঙ্গে দেখা হয়···ভাইয়ের লেখাপড়ার সম্বন্ধে মাঝে মাঝে দু-চার কথা বলেন—তার বেশী কোনো কথা নয়! তাছাড়া আমি এখন সে হিমাদ্রি নই···ছন্নছাড়া···বেকার···ওঁর ভাইয়ের গার্জেন-টিউটর —আড়াইশো-টাকা মাহিনা পাই, সেই সঙ্গে এখানে আশ্রয়···

একাগ্র-মনে অবনী শুনলো এ-কথা—তার পর নিশ্বাস ফেলে সে শুধু বললে—হুঁ···

এই 'হুঁ'র পর পাঁচ মিনিট দুজনে চুপচাপ·· কূয়া থেকে চাকরে জল তুলছে—লাট্টাব শব্দ শোনা যাচ্ছে···বাহিরে গলি-পথে কে একজন সিনেমার গান গাইতে গাইতে চলেছে। হিন্দী গান···লারে লাপ্পা···লারে লাপ্পা— অবনী ভাবছে, তাইতো···হিমাদ্রির এ-ব্যাধি কোনো কালে সারবে না!

হঠাৎ হিমাদ্রি করলে প্রশ্ন--কিন্তু তুমি এখানে?

অবনী বললে—পিসিমাকে নিয়ে তীর্থে-তীর্থে ঘুরছিলুম···কাশীতে এসে অসিতে বাড়ী নিয়ে বাস। কাশীতে পিসিমার মন বসেছে। তারপর হঠাৎ একদিন এখানকার পরিচয়···মানে, সদাশিববাবু হলেন সম্পর্কে পিসিমার কি রকম দ্যাওর···সেই সূত্রে নিমন্ত্রণ।

হিমাদ্রি শুনলো···শুনে বড় একটা নিশ্বাস ফেললো। নিশ্বাস ফেলে হিমাদ্রি বললে—তাহলে তুমি একবাব ··

বাধা দিয়ে অবনী বললে—রোসো···বড়লোকেব মেয়ে···ডাগর মেয়ে··· লেখাপড়া জানে···গান-বাজনা জানে···বাপ-মা যার হাতে ধরে দেবে, তার হাতে নিজেকে সঁপে দেবে, এমন কখনো হতে পারে না! মানে, প্রেমে যদি পূর্ণিমা দেবীর হৃদয় জয় করতে পারো, তবেই···

হিমাদ্রি বললে—কিন্তু কি করে তা হবে! আমি এ-বাড়ীর টিউটর!

অবনী হাসলো···হেসে বললে—সেইজন্যই তোমার চান্স আছে হে!

গল্প-উপন্যাস পড়ো তো···সে-সবে টিউটরকেই লেখকরা নায়িকাদের প্রেমের পাত্র করে আসচেন···আগাগোড়া!

হিমাদ্রি বললে—সে-কথা ভেবেছি। কিন্তু গল্প-উপন্যাসে টিউটরদেব সঙ্গে প্রেমের ব্যাপারে নায়িকা নিজে ছাত্রী···এক্ষেত্রে তো তা নয়—এখানে নায়িকার ভাই ছাত্র···নায়িকা দূরের মানুষ—টিচারের নাগালের বাহিরে!

অবনী বললে—নাগাল যাতে মেলে, সেজন্য সাধনা চাই।

—কি করে তা হবে?

অবনী কি ভাবলো···ভেবে সে বললে—তুমি তাস খেলতে জানো?

—তা জানি। তুমি বলচো, তোমরা দুজনে বসবে তাস খেলতে আমাকে নিয়ে···কিন্তু তিনজনে তো গ্রাবু, ব্রিজ খেলা চলে না!

—তা বটে! অবনী আবার হলো চিন্তামগ্ন।

হিমাদ্রিও তদ্বৎ। অবনী বললে—ব্রে খেলা জানো?

হিমাদ্রি বললে—সেই ইস্কাবনের বিবি তো? জানি।

—ঠিক হয়েছে। দেখি, ঐ দিক দিয়ে যদি তোমাদের পাশাপাশি বসাতে পারি! তার পর অবশ্য···

হিমাদ্রি বললে—বুঝছি···কিন্তু জানো তো, আমি কি রকম shy—মেয়েদের সামনে এমন লজ্জা করে···মুখে কথা ফোটে না! শুধু লজ্জা নয় ভাই···ভয় করে—মুখের উপর যদি sternly বলে বসেন, চোপ্!

অবনী বললে—ঐতেই তোমাকে মেরেছে! নাহলে আমার জ্ঞানতঃ কতবারই তো প্রেমে মশগুল হয়েছো···স্রেফ ভয়ে আর লজ্জায় প্রেমের কথা মুখে ফোটাতে পারোনি বলে চিরদিন ডিসাপয়েন্টেড হয়ে রইলে! তবে ভেবে ছাখো, এক্ষেত্রেও···

প্রবলভাবে মাথা নেড়ে হিমাদ্রি বললে—উহুঁ···এবারে···যাকে

বলে...কি বল্‌বো, জানি না...তবে উনি দেবী...আমার সব কামনা, সব প্রার্থনার ধন! যে-মাটিতে পা দিয়ে উনি চলে যান, আমার মনে হয়... সেখানে-সেখানে ওঁর পায়ে-পায়ে ফুটে ওঠে মন্দার, পদ্ম, পারিজাত... সে-মাটিতে লুটিয়ে পড়ে থাকতে চাই আমি।

অবনীর কৌতুক বোধ হলো। অবনী বললে—যাঁহা যাঁহা অরুণ চরণ ফেলি যাতা—তাঁহা তাঁহা...এ্যাঁ, তাই দেখছি! তা পড়েছো কখনো সে মাটিতে লুটিয়ে?

করুণ কণ্ঠে হিমাদ্রি বললে—তামাসা করো না, অবু। তুমি যদি ভালোবাসতে কোনো মেয়েকে কখনো...বুঝতে, আমার এ-কথার অর্থ! প্রত্যক্ষ দেহে লুটিয়ে না পড়লেও মনে মনে আমার দেহ...

হেসে অবনী বললে—তাহলে মনে মনে তাঁর মেলানি পেয়েও তো চরিতার্থ হতে পারো!

আকুল আগ্রহে অবনীর দুখানা হাত চেপে ধরে হিমাদ্রি বললে—আমার মনে হচ্ছে, ভগবানের ইঙ্গিত! আমাব মনের অবস্থা যখন এমন...তুমি ঠিক সেই সময়ে সম্পূর্ণ অপ্রতাশিতভাবে এখানে এসে উপস্থিত! হয়তো এবারে তুমি যদি একটু...মানে, তোমার সঙ্গে সম্পর্ক আছে...এখানে তুমি থাকচো যখন...যদি ভাই...

অবনী বললে—রোসো...এই তো সবে এসেছি! সবে দেখাশুনা... কোনো মানুষটির পরিচয় পাইনি এখনো। আগে পরিচয় পেতে দাও! তার পর...

হিমাদ্রি বললে—বসি এসো ঐ পাথরের বেঞ্চে...বসে একটা কিছু ভেবে...

অবনীর হাত ধরে হিমাদ্রি তাকে বসালো হাসনুহানার ঝাড়ের পিছনে পাথরের বেঞ্চে; বসিয়ে হিমাদ্রির প্রশ্ন—কিভাবে প্রোসিড করবে...বলো

তো ? তোমার উপর আমার খুব বিশ্বাস আছে···তুমি যদি সিন্সিয়ারলি চেষ্টা করো···

মুখখানা গম্ভীর করে অবনী বললে—কিন্তু একটা কথা ভাবচো না হিমাদ্রি !

—কি কথা ?

—ডাগর মেয়ে···বাপের পয়সা আছে···মেয়ে লেখাপড়া জানে··· বুদ্ধিমতী—এ-বয়সে যদি ওঁর প্রেম হয়ে থাকে কোনো তরুণের সঙ্গে ? বিচিত্র নয় ! একালে···মানে, যুগধর্ম্ম তো !

হিমাদ্রি বললে—কৈ, তেমন কোনো তরুণকে···আমি যতকাল এখানে আছি, না, তেমন কোনো তরুণকে দেখিনি ! কিন্তু···

অবনী বললে—তেমন তরুণ···মানে ?

হিমাদ্রি বললে—মানে, নভেলে-নাটকে যেমন দেখি, মোটরে করে এ-বাড়ীতে ঠিক সময়ে নিত্য আসা···চায়ের টেবিলে বসা···কিম্বা টেনিস, কি ব্যাডমিণ্টন খেলা···কিম্বা হৈ হৈ রবে পিকনিকে বেরুনো—মোটে না। আমি সেদিকে চোখ রাখি তো !

অবনী বললে—তোমার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ···মানে···

অবনীর কথা শেষ হবার আগেই হিমাদ্রি বললে—দেখা-সাক্ষাৎ হয় বৈ কি···হামেশা দেখা হয় ! এই বাগানে সকালে বেড়ানো···আমার এই ছাত্র···এর নাম হলো অয়স্কান্ত···ডাক-নাম বোকা···তা নামটা ঠিক··· বোকার ধাড়ি—ওকে নিয়ে রোজ সকালে এই বাগানে আমাকে বেড়াতে হয়···তখন পূর্ণিমা দেবীও থাকেন সঙ্গে···ফুলের গাছ, ফলের গাছ সম্বন্ধে কথা হয়···আরো নানা কথা হয়—বোকাকে উনি অনেক কথা জিজ্ঞাসা করেন··· আমাকে জিজ্ঞাসা করেন। এমনি কথাবার্ত্তা হয়···বেশ সহজভাবেই কথা হয়। তবে···

—বুঝেছি। অবনী বললে—তার মধ্যে তুমি আভাসে-ইঙ্গিতে তোমার মনের অনুরাগ···

—বাপরে···ভয় করে! কে জানে, তার ফলে যদি এখান থেকে চাকরিচ্যুত হয়ে বিদায় নিতে হয়! মানে, আমার এমন হয়েছে···বিশ্বাস করো ভাই ··এঁরা যদি মাহিনা না দেন, শুধু এ-বাড়ীতে থাকতে দেন আর দুবেলা দুটি খেতে দেন···আমি এ-বাড়ী ছেড়ে যেতে পারবো না। ওঁকে দেখতে পাবো না—এ-কথা মনে হলে আমার পৃথিবী অন্ধকার হয়ে আসে!

অবনী বললে—তুমি বিপদে ফেললে, হিমাদ্রি! এমন তোমার মন··· তরুণী দেখলেই···

বাধা দিয়ে হিমাদ্রি বলে উঠলো—না, না···তরুণী তো পথে-ঘাটে এমন হাজার হাজার দেখা যায়···তা বলে তাদের প্রত্যেকের জন্য···না, না···এ তোমার ভুল।

অবনী বললে—বেশ···তাহলে দেখি সব ভেবে। এ-বাড়ীতে যখন থাকতেই হবে···পিসিমাকে এঁরা ধরেছেন···পিসিমারও ইচ্ছা—আমার ইচ্ছা না থাকলেও টু প্লীজ দী ওল্ড লেডি···থাকবো এখানে! তারপর তোমার যে-অবস্থার কথা শুনলুম···থাকতেই হবে এবং থাকতে থাকতে তোমার দেবীর মন বুঝে···তবে নো হেষ্ট···ধৈর্য্য ধরো। কিন্তু ভয়ও করে···

—কিসের ভয়?

অবনী বললে—ধরো, আমি ঠিকঠাক করলুম হয়তো···যেমন ঠিকঠাক করা···তুমি তখন বলবে—না, না, পূর্ণিমা দেবী নয়···সে-ফ্যাশিনেশন ফেড্ অফ্ হয়ে গেছে—তুমি তখন আর এক কিশোরীর জন্য হয়তো হা-হুতাশ করবে!

বেশ সুদৃঢ় কণ্ঠে হিমাদ্রি বললে—না, না, না···দিস টাইম, মাই লাষ্ট! এক্ষেত্রে নিরাশ হলে···

কথাটা শেষ হলো না···হিমাদ্রি বড় একটা নিশ্বাস ফেললো।

হেসে অবনী বললে—নিরাশ হলে চূড়া-বাঁশী ফেলে যমুনার জলে দেহ বিসর্জ্জন! এঁ্যা! তুমি মোদ্দা···কি বলবো! বরাবর এই সব ভালোবাসার নভেলগুলোকে আমি কৃপার চক্ষে দেখতুম···ভাবতুম, খেয়ালী লেখকদের খেলা···এখন দেখছি, খেলা নয়···তাঁরা নভেলে যা লেখেন, সত্যকার পৃথিবীতে তা সত্য সত্য ঘটে!

হিমাদ্রি বললে—তুমি জানো না, এই বোকা ভাইটাকে নিয়ে দিন কাটানো···ওঃ—এর চেয়ে···এ টেরিব্‌ল্ হুইশান্স···বয়স তেরো বছর···কিন্তু আদরে আদরে যাকে বলে, নম্বর ওয়ান পেহ্লাদ···রামখোকা! নিরেট ইডিয়ট। কখন কি খেয়াল হবে···জানো, সেদিন বলে বসলো, গাছে উঠুন স্যর···দেখি, আপনি গাছে উঠতে পারেন কি না! কোনোদিন যদি বলে, ল্যাজ এঁটে বাঁদর সেজে লাফান স্যর—তাহলে আহ্লাদে রামখোকাকে তোয়াজ করতে তাও করতে হবে! না যদি করি—ঐ বুড়ো ছেলে··· ভ্যা-ভ্যা কান্না—আর বাপের কাছে গিয়ে লাগাবে!

হেসে অবনী বললে—আছো ভালো।

হিমাদ্রি বললে—কুমারসম্ভব কাব্যে পার্ব্বতীর কৃচ্ছ্র সাধনের কথা লিখে গেছেন কবি কালিদাস···কিন্তু আমার দেবীর জন্য আমার এ-কৃচ্ছ্র সাধনা···

অবনী বললে—লিখো তুমি তা নিয়ে কাব্য! কিন্তু বাজে কথা থাক··· তাহলে শোনো, যা বলি···

—বলো···

অবনী বললে—আমার সঙ্গে বেশী মেলামেশা করো না···তোমার সঙ্গে যেন হঠাৎ এখানে আমার আলাপ—তুমি ছেলের টিউটর···এক-বয়সী, তাই আলাপ! তারপর আমি ওয়ার্ক করবো···বুঝলে?

—বুঝেছি।

—পিসিমা তোমার নাম জানে···তোমাকে চেনে না—তাঁর নজর এড়িয়ে থেকো। কে জানে, মেয়েদের ইনকুইজিটিভনেশ···যদি ওঁদের জিজ্ঞাসা করেন, এ ছেলেটি কে ? কি নাম ? বুঝলে ?

—বুঝেছি। আমি খুব সাবধানে থাকবো। কিন্তু মনে রেখো, তোমার হাতে আমার জীবন !

তিন

সিক্রোতেই অবস্থান···ডাক্তার সদাশিবের গৃহে।

সদাশিব-ডাক্তারের অসীম খ্যাতি···মাথার রোগের চিকিৎসা করতে এমন মানুষ এ-অঞ্চলে আর নেই ! সরকারী চাকরিতে পেন্সন হয়ে এখানে কাশীতে তিনি খুলেছেন হাসপাতাল। হাসপাতালের নাম নিরাময়। দুজন ছোকরা-ডাক্তার আছেন তাঁর এ্যাসিষ্টাণ্ট এবং হাসপাতালে কটা কামরা আছে···সে-সব কামরায় পয়সা দিয়ে মাথা-খারাপ রোগীর থাকবার ব্যবস্থা। রোগীদের খেলার জন্য আছে লন, বেড়াবার জন্য বাগান···এবং আনুসঙ্গিক আর-আর ব্যবস্থা—তাছাড়া দুঃস্থ রোগীদেরও আস্তানার ব্যবস্থা আছে। হাসপাতালটি হলো সদাশিব-ডাক্তারের সর্ব্বস্ব !

অবনীকে মিশতে হলো পূর্ণিমা দেবীর সঙ্গে। বিন্দুবাসিনী এবং সদাশিবকে সে মেনে চলে। তাঁদের সঙ্গে বসে কথা কওয়া···সদাশিবের সঙ্গে নানা কেস্ সম্বন্ধে আলোচনা···তাঁর হাসপাতাল দেখতে গিয়ে সে-সম্বন্ধে বেশ আগ্রহ এবং দরদ দেখানো—এগুলো চালাতে লাগলো অন্তরঙ্গতা করতে··· যদি এ-অন্তরঙ্গতার ফলে একদিন হিমাদ্রির সম্বন্ধে···

হিমাদ্রির সঙ্গেও মেলামেশা করে···পুরোনো বন্ধু হিসাবে নয়···এ-বাড়ীর

পোষ্য প্রতিপালিত টিউটর হিসাবে। খোকাকে হিমাদ্রি পড়ায়···অবনী গিয়ে সে-ঘরে বসে ; খোকাকে নিয়ে বেড়াতে বেরোয় হিমাদ্রি···সকলকে দেখিয়ে অবনী মাঝে মাঝে বেরোয় তাদের সঙ্গে।

সদাশিব দেখেন, বলেন—মাষ্টারটিকে কেমন দেখছো···বলো তো ?

—ভালো। অবনী উৎসাহভরে জবাব দেয়—বেশ আপনজনের মতো যত্ন নেন ভদ্রলোক।

সদাশিবের মুখ হয় আনন্দে প্রদীপ্ত। তিনি বলেন—ভালো ! এমনি ভদ্রলোকই আমি খুঁজছিলুম। ছেলেটাকে মানুষ করতে হবে···আমার সময় নেই যে দেখবো। স্কুলে ভর্ত্তি করে দিয়ে কর্ত্তব্য চুকোনো···আর যে-বাপ তা করতে পারেন, আমি পারি না। তাছাড়া ছেলেটা ভারী একরোখা···বায়না আর আবদারের অন্ত নেই। আমি সহ্য করতে পারতুম না···ঠ্যাঙানি দিতুম···কিন্তু ঠ্যাঙানিটা খাবাপ···তাতে ছেলের সর্বনাশ ঘটে। অথচ···

এই পর্য্যন্ত বলে সদাশিব চুপ করলেন···তিনি যেন বেশ ভাবিত।

অবনী বললে—আমি দেখেছি···ভদ্রলোকের পড়াবার কায়দা ভালো। খোকা পড়বে না···গোঁ ধরেছে, বলে, বাগানে গিয়ে গাছে চড়বে ! ভদ্রলোক বেশ ঠাণ্ডাভাবে গল্প করে কবে পড়া করিয়ে দিলেন ! গাছে চড়বে··· ভদ্রলোক নিজেও ওর সঙ্গে গাছে উঠলেন। অর্থাৎ সব দিকেই দেখি, বন্ধুর মতো···সমবয়সী সাথীর মতো।

শুনতে শুনতে সদাশিবের মুখ-চোখ আবার হলো প্রদীপ্ত। তিনি বললেন—এইটেই আমি চাই। আমার মেয়ে পূর্ণিমা···বেশ ইনটেলিজেণ্ট ···বাড়ীতে আই-এ পড়ে এগজামিন দিয়ে পাশ করলো। বি-এ পড়ছে··· কলেজে নয়···বাড়ীতে বি-এ'র কোর্শ···তার উপর গান-বাজনা, লোক-লৌকিকতা···সব বিষয়ে স্মার্ট। আবার পূজার কাজ দাও···থাশা নৈবেদ্য

সাজাবে, পুষ্পপাত্র সাজাবে! ভাবি, পূর্ণিমা যদি ছেলে হতো আর ছেলেটা যদি হতো মেয়ে…

কথা শেষ করে তিনি নিশ্বাস ফেললেন।

অবনী বললে—মাষ্টার-ভদ্রলোকটিকে কোথায় পেলেন?

—বিজ্ঞাপন দিয়েছিলুম…কলকাতার কখানা কাগজে। এদিককার কাগজে বিজ্ঞাপন দিলে পশ্চিমী টিউটর মিলতো…তাদের দ্বারা…রামচন্দ্র… ছাগল দিয়ে যব মাড়ানো হয় না! বিজ্ঞাপন দেখে প্রায় দুশো এ্যাপ্লিকেশন আসে…পাঁচজনকে ইণ্টারভিউ দিই…তাতেই এঁকে পছন্দ হয়।

অবনী বললে—ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ করলুম! বেশ বড় ঘরের ছেলে…ওঁর কাকা হলেন মস্ত এঞ্জিনীয়ার…স্যর বিদ্যুৎবরণ…তা কাকা হঠাৎ বুড়ো বয়সে বিবাহ করেছেন…কাকার ফার্ম্মে ভদ্রলোক ছিলেন সর্ব্বস্ব …বিয়ের পর কাকা ফার্ম্মের ব্যবস্থা উল্টে দিলেন—উনি হলেন সামান্য সাবর্ডিনেট কর্ম্মচারী…ইজ্জতে বাধলো—তাই উনি স্বাধীনভাবে জীবিকা-উপার্জ্জন…

—বটে! এত কথা আমি জানি না…জিজ্ঞাসা করিনি! তবে কথাবার্ত্তা আর চালচলন দেখে বুঝলুম, ভালো ঘরের ছেলে…ভ্যাগাবণ্ড টাইপ নয়! পূর্ণিমা বলে, আচার-ব্যবহার খুব ভদ্র!

পূর্ণিমা এমন কথা বলেছে! তাহলে…

পূর্ণিমার সঙ্গেও কথা হয় হিমাদ্রির সম্বন্ধে…

অবনী বলে—মাষ্টারটি পেয়েছেন ভালো।

পূর্ণিমা বলে—হ্যাঁ। বোকা ভারী আনমাইণ্ডফুল। শুধু তাই নয় …ওর মাথা তেমন সাফ নয়…মানে, যাই হোক, ওঁর হাতে পড়ে প্রোগ্রেস করছে।

অবনী বললে—আপনি পরীক্ষা নেন ?

—নিতে হয়! হেসে পূর্ণিমা বললে—আমার উপর বাবা ভার দিয়েছেন। তা না দিলেও, ভাইকে তো জানি···একেবারে গোবরগণেশ না হয়···নিজেদের ইজ্জতের জন্যও ওকে দেখা চাই! স্কুলে দিতে আমার মত নেই···তাতে ও-ছেলের কিস্যু হবে না।

এমনি কথা চলে। সন্ধ্যার সময় কোনো কোনোদিন গানের আসর বসে···পূর্ণিমা গান গায়···অর্গান বাজায়···অবনী বাজায় তার বেহালা। বেহালায় অবনীর বেশ হাত। শুনে পূর্ণিমা বলে—চমৎকার বাজনা··· আমাকে শেখাবেন ?

—কেন শেখাবো না ?

এবং বেহালা শেখানোও চলে এক-একদিন।

এ-অন্তরঙ্গতায় পূর্ণিমাকে 'আপনি' বলা বন্ধ অবনীর···পূর্ণিমা এখন 'তুমি'। বিন্দুবাসিনী আর পিসিমা···তুজনেই হেসে অবনীকে বলেছেন—ছোট বোন···ওকে আপনি-মশাই বলা কি···ছি !

সেদিন···

সিক্রা থেকে দশ-বারো মাইল দূরে অযোধ্যা যাবার পথে বাবতপুর··· সেখানে আছে সদাশিবের প্রকাণ্ড আমবাগান ··বাগানে বড় পুকুর···একতলা বাড়ী। বিন্দুবাসিনী বললেন পিসিমাকে—চলো দিদি, সেই বাগানে চড়িভাতি হবে। অবনীর ভালো লাগবে···ছেলেমেয়েদের নিয়ে চলো। তোমারো ভালো লাগবে।

পিসিমা বললেন—সেখানে আমার রান্নার হাঙ্গামা করতে হবে তো! তা নয়···আমি বলি, একাদশীর দিন চলো···আমার খাবার ল্যাঠা থাকবে না।

বিন্দুবাসিনী বললেন—তোমার কষ্ট হবে। গরম পড়েছে তো।

পিসিমা বললেন—আমার তত নিষ্ঠা নেই। আমার গুরুদেব বলেন, নির্জলা একাদশী অনুচিত···পাপ। তাঁর কথায় সন্ধ্যার সময় আমি খাই সরবৎ, দুধ আর একটা মিষ্টি। পাঁচ বছর আগে খুব অসুখ হয়েছিল··· গুরুদেব তখন আমার ওখানে···তিনিই তখন বিধান দিয়েছিলেন··· বলেছিলেন, আমার আদেশ, মা···কোনো পাপ হবে না। শরীরকে অহেতুক কষ্ট দেওয়া মহাপাপ! তাছাড়া একাদশী করা···বাঙলা দেশে দেশাচার মাত্র···শাস্ত্রবিহিত নয়! সেই থেকে আমি গুরুদেবের কথা মেনে চলছি ভাই, ববাবর। নির্জলা একাদশী করি না।

বিন্দুবাসিনী বললেন—তাহলে বেশ, এই সামনের একাদশীতে ব্যবস্থা করি···কি বলো?

এবং অবনীকে পূর্ণিমাকে বলে বাবতপুরের বাগানে হলো পিকনিকের ব্যবস্থা। বামুন-চাকররা আগের রাত্রে জিনিষপত্র নিয়ে ভোরের ট্রেণে বেরিয়ে গেল; এঁরা যাবেন মোটরে···সকালে চা জলখাবার খেয়ে। সদাশিব যাবেন না···তাঁর হাসপাতাল আছে।

হিমাদ্রিও যাবে···তার ছাত্র বোকার চার্জ হিমাদ্রির হাতে।

পিকনিকের আগের দিন রাত্রের কথা···

অবনী খাওয়াদাওয়া সেরে, ড্রয়িংরুমের মজলিশ সেরে নিজের ঘরে এসেছে···শোবে···কাল সকাল-সকাল উঠতে হবে···উঠে মুখ-হাত ধুয়ে চা, জলখাবার খেয়ে বাবতপুর-যাত্রা।

ঘরের ঘড়িতে রাত বারোটা বেজে সাঁইত্রিশ মিনিট···পিসিমা এলেন ···বললেন—শুতে যাচ্ছিস?

—হ্যাঁ। এত রাত্রে কি করবো আবার!

—না, তা শো…তবে শোবার আগে একটা কথা বলতে চাই।

—বলো…

পিসিমা বসলেন গম্ভীর হয়ে দেওয়ালের গায়ে লাগানো একখানা চেয়ারে। অবনী বুঝলো, পিসিমার বিশদ কিছু বক্তব্য আছে! দিনের বেলায় দেখা তেমন হয় না…তাই এখন বলতে চান! অবনী বসলো আর একটা চেয়ারে…বসে পিসিমার দিকে চেয়ে বললে—বলো পিসিমা…

পিসিমা বেশ বড় একটা নিশ্বাস ফেললেন…নিশ্বাস ফেলে বললেন—তোমার কথা ভেবে ভেবে আমি কিছুতে সুস্থির হতে পারছি না…মানে, তোমাকে বিয়ে করতে হবে বাপু! আমি কোনো ওজর শুনবো না…বিয়ে তোমাকে করতেই হবে…আর এই শ্রাবণ মাসেই।

অবনী বললে—আবার কাকে দেখে ভুলে গেলে, পিসিমা? সেই নবদ্বীপের পাত্রী নয় তো?

—না…না! তাচ্ছল্যভরে পিসিমা করলেন মন্তব্য; তারপর তিনি বললেন—গড় করি ঠাকুরদের…কি ভুল না করছিলুম! মাথার উপর যিনি আছেন…খুব গুরুবল—তাই রক্ষা পেয়েছি! না…না, ওসব না-জানা যার-তার ঘরের মেয়ে…কখনো আর বলবো না, রে। এবারে খুব জানা-ঘরের মেয়ে…চমৎকার মেয়ে…যেমন রূপ, তেমনি গুণ…টাকা-পয়সা আছে বাপের …বাপের নাম করলে দশজনে চিনবে! মেয়েটি…বললুম তো, রূপে-গুণে লক্ষ্মী! একালের ধরণধারণ যেমন জানে, মেনে চলে…তেমনি আমাদের হিঁদুর ঘরের আচার-বিচারও মানে। আমি খুব ভালো করে জেনে বুঝে তবে এ-কথা বলছি।

অবনীর বুকখানা দুলে উঠলো! মনে প্রচুর কৌতূহল…অবনী বললে—কার মেয়ে, পিসিমা?

পিসিমা বললেন—আমার এই পিসতুতো দ্যাওর সদাশিবের মেয়ে পূর্ণিমা।

সর্বনাশ! অবনী চমকে উঠলো! সে বললে—না, না···তুমি ক্ষেপেছো, পিসিমা!

—ক্ষেপিনি! পিসিমা বললেন—বাঁদরামি করিস নে। এ-মেয়েকে বিয়ে করতে পেলে বর্ত্তে যাবি!

—বর্ত্তে যাবো! তার মানে?

—তার মানে! পিসিমা বললেন—মানুষ হবি···এমন ছন্নছাড়া বাউণ্ডুলে হয়ে থাকবি নে। তোকে সে পিটিয়ে মানুষ করবে! খুব বুদ্ধিমতী মেয়ে··· তার উপর দু-দুটো পাশ করে তিনটে পাশের পড়া পড়ছে!

অবনী বললে—কিন্তু কারো পিটুনি খেয়ে আমি মানুষ হতে চাই না, পিসিমা। আমি যা, এমনি থাকতে চাই আমি।

পিসিমা রাগ করলেন···বললেন—তুমি চাইলেও আমি তো তা চাইবো না! শোনো···বৌ আমাকে কদিন এই কথা বারবার বলছে! আমি গোড়ায় তত কান দিইনি···জানি তো তোমার মেজাজ। কাল আমার ছাওরও তাই বলছিল। বলছিল, ছেলেটির বিদ্যাবুদ্ধি আছে···চেহারা ভালো···টাকাকড়ি আছে···জানা ঘর—পূর্ণিমাকে ওর হাতে দিলে নিশ্চিন্ত হবো আমরা। মেয়েরও মত আছে।

—পূর্ণিমার মত আছে! অবনী বললে—সে তোমাকে বলেছে?

—সে তা বলবে কেন? পিসিমা বললেন—বেহায়া নয় তো। একালের মেয়ে হলেও তার লজ্জাসরম আছে, মান-ইজ্জৎ আছে···দাম আছে—সে কখনো হ্যাংলার মতো এমন কথা বলতে পারে!

অবনী বললে—তাহলে কি করে তুমি বুঝলে, তার মত আছে?

পিসিমা জবাব দিলেন—আমাদের এ-কথা হয় মাঝে-মাঝে···পূর্ণিমা সেখানে থাকলে শোনে···উঠে যায় না···মুখে বলেনি কখনো, না! এর

চেয়ে স্পষ্ট কি করে আর জানাবে ? বলবে কি, ওগো হ্যাঁ, ওঁর সঙ্গে আমার বিয়ে দাও !

অবনী হাসলো···বললে—কিন্তু বিয়ে আমি করবো না, পিসিমা। বিয়ের নামে আমার কেমন ভয় করে !

—অনাসৃষ্টি কথা ! ভয় করে ! বৌ কি বাঘ, না, ভাল্লুক ! আমি কোনো কথা শুনবো না, বলছি। আমার এ-কথা না শোনো···আমার সঙ্গে এই পর্য্যন্ত···আমাকে পিসি বলে ডাকবিনে···আমার কাছে আসবিনে কখনো আর ! কাল ঐ জন্যই আরো বৌ বাবতপুরের বাগানে চড়ি-ভাতির আয়োজন করেছে যে···দুজনে দুজনকে ভালো করে আরো জানবে, বুঝবে।

এই পর্য্যন্ত বলে পিসিমা উঠলেন···উঠে একটা নিশ্বাস ফেলে নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

পিসিমা চলে যাবার পর অবনী খানিকক্ষণ কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো··· তারপর উঠে খোলা খড়খড়ির সামনে এলো।

বাহিরে আকাশে এক-রাশ নক্ষত্র···ঝিরঝির করে বাতাস বইছে···দূর থেকে ভেসে আসছে মিশ্র কলগুঞ্জন।

অবনী ভাবলো, পূর্ণিমার জন্য হিমাদ্রি আকুল···সে কোথায় পূর্ণিমার সঙ্গে হিমাদ্রির মিলন ঘটাবার কল্পনা করছে···আর মাঝখান থেকে এঁরা এদিকে···হুঁঃ ! হিমাদ্রির সঙ্গে শেষে অবনীর সম্পর্ক—পূর্ণিমা যেন আয়েষা আর তারা ? জগৎসিংহ আর ওসমান ! কিন্তু জগৎসিংহটা কে ? সে ? না, হিমাদ্রি ?

এ-কথা মনে হতে অবনী চমকে উঠলো···সর্বনাশ, এমনি চক্রে পড়ে বেচারী আয়েষা আংটির বিষ খেয়ে আত্মঘাতিনী হয়েছিল !

মাথায় নানা চিন্তা···যেন একরাশ সরীসৃপ কিলবিল করছে ! পূর্ণিমা,

পূর্ণিমার বাবা, মা যদি অবনীকে কেন্দ্র করে পূর্ণিমার ভবিষ্যৎ রচনা করেন ···তাহলে সে-ফাঁকে হিমাদ্রিকে অবনী কি করে চালান করবে? তবে পূর্ণিমা! মুখে পূর্ণিমা স্পষ্ট ভাষায় এ-কথায় সায় দেয়নি···পিসিমা বললেন, হাবে ভাবে সায়! অবনী ভাবলো, ডাগর মেয়ে···বাঙালীর ঘরের মেয়ে··· কোন্ কালে তার বিয়ে হয়ে যাবার কথা···হয়নি শুধু তেমন পাত্র কাশীতে বসে এঁরা পায়নি, তাই···পূর্ণিমার মনের ভাব এখন···এনি পোর্ট? কিন্তু না, সে যা ঠিক করেছে···কাল ঐ চড়িভাতির বাগানে পূর্ণিমার হৃদয়কে অবনী করবে হিমাদ্রির দিকে উন্মুখ···তার জন্য নিজেকে যদি ঝুলকালি মাখিয়ে কালো করতে হয়, কুছ পরোয়া নেহি!

চার

বাবতপুরের বাগান। প্রকাণ্ড বাগান···সিক্রার বাড়ীর লাগাও-বাগানের চেয়ে চার-পাঁচগুণ বড়···ল্যাংড়া আমের অসংখ্য গাছ···গাছে এখনো অজস্র আম। আমগাছগুলো জমা দেওয়া···তা থেকে আমের সময় বেশ মোটা টাকা রোজগার হয়। মস্ত ঝিল···তবে অযত্নে-অনাদরে ঝোপঝাড় আর আগাছার জঙ্গলে ভরে আছে। দুটো মালী আছে···এদেশী মালী···তারা মাহিনা খায় ···বাগান দেখতে বয়ে গিয়েছে—ফলফুলুরি যা পারে বিক্রী করে সেদিক দিয়েও বেশ তাদের রোজগার। মালীরা সপরিবারে বাগানে বাস করে। সদাশিবের লোকজন এসে সকালে তাদের গোষ্ঠীবর্গকে ধরে ঘরদোরগুলো সাফ করিয়েছে···বলেছে—আসছেন মা-জী···সেই সঙ্গে দিদিমণিরা। কোনো কাজ করো না···বাগানের হাল দেখে সকলকে দূর করে খেদিয়ে দেবেন'খন!

এঁরা প্রকাণ্ড মোটরে চড়ে বাগানে পৌঁছুলেন···বেলা তখন সাড়ে নটা। একতলা বাড়ীর হলঘরে বড় কার্পেট পাতা। এ-কার্পেট এখানে তোলা থাকে···লোকজন ঘর সাফ করিয়ে কার্পেট পেতেছে···গোটাকতক

তাকিয়া বার করে ওয়াড় পরিয়ে কার্পেটের উপর সাজিয়ে রেখেছে। বাথরুমে চৌবাচ্ছা…কুয়া থেকে জল তুলিয়ে চৌবাচ্ছা ভরে বালতিগুলো ভরে রাখা হয়েছে। এসেই মনিবদের না কষ্ট হয়…সেদিকে লোকজন ব্যবস্থা যা করে রেখেছে…তা ভালোই।

মোটর থেকে নেমে বিন্দুবাসিনী বললেন পিসিমাকে—বারান্দায় একটা সতরঞ্চ পেতে দিক…তুমি বসো দিদি। আমি দেখি গে…ঠাকুর কি করলো এতক্ষণে!

খোকা গাড়ী থেকে নেমেই ছুটলো বাগানে…কাজেই হিমাদ্রিকে ছুটতে হলো তার পিছনে চৌকিদারি করতে।

পূর্ণিমা চাইলো অবনীর দিকে…অবনী মুগ্ধ নয়নে আমগাছগুলোর দিকে চেয়ে আছে…পূর্ণিমা বললে—আপনি বসবেন? না, বাগান দেখতে যাবেন? মানে, ঘুরতে?

অবনীর মনে পড়লো কাল রাত্রে পিসিমা যে-কথা বলেছিলেন…সেই কথা! পূর্ণিমার প্রশ্নে সে তাকালো পূর্ণিমার দিকে…দেখতে চায়…এ আহ্বানের অন্তরালে নভেলী-পূর্বরাগের কোনো আভাস আছে কি না!

কিন্তু না, পূর্ণিমার দৃষ্টি সহজ, সরল…কণ্ঠও তদ্বৎ।

অবনী বললে—দেখবো নিশ্চয়…তবে ল্যাংড়া আমের বন দেখে আমি দিশাহারা! এই ল্যাংড়া আমরা কলকাতায় বসে খাই…কি দাম না দিই ল্যাংড়ার জন্য! আর এখানে…

হেসে পূর্ণিমা বললে—খেতে ইচ্ছা হচ্ছে না কি?

—হচ্ছে নিশ্চয়। কিন্তু কটাই বা খাবো! দ্বিজু রায়ের সেই গানটা মনে পড়ছে…ল্যাংড়া আমের গান নয় অবশ্য…সন্দেশের গান।

—কি গান…বলুন তো? আমার মনে পড়ছে না।

সুর করে অবনী বললে—না খেতেই যায় ভরিয়ে উদর, সন্দেশ থাকে

পড়িয়া! গাছে আম দেখেই উদর ভরে গেছে মনে হচ্ছে··তা খাবো কি!

—না, না, চলুন··ঘুরে দেখবেন! কতদিন পরে এখানে এলুম··· ঠিক নেই। সেই শীতকালে একবার এসেছিলুম—তারপর এই আজ!

—কেন আসোনি এতদিন?

—একলা-একলা ভালো লাগে না! বেশ দল বেঁধে নাহলে···

বাধা দিয়ে অবনী বললে—আজ···দল বলতে আমি, পিসিমা আর খোকার মাষ্টার মশাই···এতেই কি দল হয়, পূর্ণিমা?

—হয়েছে। আপনি একাই দল তৈরী করেছেন।

—হুঁ···আমি এমন শক্তিমান···একাই একশো! বটে!

—চলুন···ওদিকে যাই।

অবনীকে নিয়ে পূর্ণিমা চললো বাগানে ঘুরতে। পিসিমা দেখলেন··· বিন্দুবাসিনী দেখলেন।

বিন্দুবাসিনী বললেন পিসিমাকে উদ্দেশ করে—দুজনে ভাব দেখছি··· দুজনকে দুজনের তাহলে মনে ধরেছে!

পিসিমা নিশ্বাস ফেলে বললেন—দ্যাখো···এখন প্রজাপতির নির্বন্ধ!

বিন্দুবাসিনী বললেন—তুমি বসো দিদি···আমি দোয়ারকাকে বলি, সতরঞ্চ পেতে দিক। আমি একবার যাই রান্নাঘরের দিকে···ঠাকুর হালুয়া-টালুয়া কিছু তৈরী করলো কি না, দেখি।

পিসিমা বললেন—চলো, আমিও যাই।

দুজনে চললেন রান্নাঘরে···ঠাকুরকে বিন্দুবাসিনী করলেন প্রশ্ন—কিছু তৈরী করেছো?

—হ্যাঁ, মা। ঠাকুর বললে—কখানা আলুর চপ আর হালুয়া।

বিন্দুবাসিনী বললেন—চা তৈরী করো··আর ক্ষীরের বরফি এনেছি···

চ্যাংড়ায় আছে···চা তৈরী হলে দাও দিকিনি ওদের···কটা প্লেটে করে!

ঠাকুর বললে—দিচ্ছি মা।

ঠাকুরটি বাঙালী···বহুদিনের লোক···রান্নাবান্না করে ভালো···যত্ন করে খাওয়ায়।

বিন্দুবাসিনী প্রশ্ন করলেন—দুপুরে কি খেতে দিচ্ছ আমাদের?

ঠাকুর বললে—ঘী-ভাত, মাছের ফ্রাই, মাংস, চাটনি, দই আর মিষ্টি···আপনি যেমন বলে দিয়েছেন!

—হ্যাঁ। বাহুল্য কিছু করো না। এত পথ আসা···এখানে কোন্ না ওরা ঝাঁপাঝাঁপি করবে···তার পর এতখানি পথ ফেরা। বিকেলের টিফিনে ক'রকম স্যাণ্ডুইচ করো···ঝুরিভাজা আছে, ডালমুট আছে···ক-রকম মিষ্টি আছে···আর চা। রাত্রে বাড়ীতে বলাই-ঠাকুর লুচি ভেজে দেবে···সেই সঙ্গে তরকারী-টরকারী—আমি সব ঠিক করে দিয়ে এসেছি!

পিসিমাকে নিয়ে বিন্দুবাসিনী ফিরলেন বারান্দায়···দুজনে বসে নানা কথা।

বোকা ঘুরছে···ঘুরছে···সঙ্গে হিমাদ্রি···দুষ্ট গরুর সঙ্গে রাখাল যেন! ঝিলের ধারে বোকা হঠাৎ দাঁড়ালো···ডাকলো—মাষ্টার মশাই···

—বলো। হিমাদ্রি দিলে জবাব।

বোকা বললে—আমাকে ছিপ তৈরী করে দিন···আমি মাছ ধরবো।

হিমাদ্রির মাথায় যেন বাজ পড়লো! সে বললে—এখানে কোথায় পাবো কঞ্চি···কোথায় বা সুতো···কোথায় বা বঁড়শী!

বোকা বললে—তা আমি জানি না। ছিপ আমার চাইই···নাহলে আমি এখানে শুয়ে পড়ে চ্যাঁচাবো।

হিমাদ্রির ভয় হলো। যে ছেলে, ওর অসাধ্য কাজ নেই!

হিমাদ্রি বললে—তাহলে একটু সবুর করো…এখানকার মালীদের দিয়ে আমি সুতো আনাই, বঁড়শী আনাই।

খোকা বললে—আর সেই সঙ্গে টোপ…মাছ ধরবার টোপ।

—হ্যাঁ। তুমি একটু সবুর করো…কেমন?

—করবো…কিন্তু তাবলে আপনি অনেক দেরী করবেন না…হ্যাঁ!

—না, না…আমি এখনি সব জোগাড় করে আনছি।

এ-কথা বলে হিমাদ্রি চললো এখানকার মালীর সন্ধানে। যেতে যেতে পথে পেলো কুড়িয়ে সরু একটা কঞ্চি…সেটা নিলে কুড়িয়ে। এখন মালী… মালীকে পাওয়া গেল ফটকের কাছে…তাকে কটা পয়সা দিয়ে হিমাদ্রি বললে—গুলিসুতো চাই এক বাণ্ডিল…কিনে আনো।

পয়সা নিয়ে মালী তাকালো আশ্চর্য্য ভঙ্গীতে হিমাদ্রির পানে।

হিমাদ্রি বুঝিয়ে দিলে—গুলিসুতোব বাণ্ডিল…গুলিসুতো। দোকান নেই?

মালী বুঝলো…বললে—আছে!

—কিনে আনো। খুব দরকার। দাদাবাবুব চাই এখনি।

মালী চলে গেল পয়সা নিয়ে গুলিসুতো কিনতে। হিমাদ্রির হাতে কঞ্চি …সে-ও বেরুলো বাগান থেকে—বঁড়শী চাই। কিন্তু তা তো আর এখানে মিলবে না…নিরামিষখোর পশ্চিমীদের মুল্লুকে! অতএব…

বিধাতা সদয় ছিলেন! দু-পা ঘুরতে পথে পাওয়া গেল…কোন্ এক্কার চাকা থেকে ছিটকে-পড়া লোহার পাতলা একটু চাকতি—পুরু নয়…পাতলা। সেটা পাথর ঠুকে পিটে দুমড়ে মুখ বাঁকিয়ে বঁড়শীর ছাঁদে গড়া হলো। ঘাম দিয়ে যেন তার জ্বর ছাড়লো! এখন সুতো…তারপর টোপ! রুটির টুকরোয় মাখন মাখিয়ে টোপ হবে।

মালী ফিরলো গুলিসুতোর বাণ্ডিল নিয়ে। কঞ্চিতে সুতো বেঁধে সেই সুতোর প্রান্তে সেই বঁড়শী বাঁধলো হিমাদ্রি। ছিপ তো হলো···কিন্তু ফাৎনা চাই···ফাৎনা!

খুঁজতে খুঁজতে মিললো কোন্ বিরাটকায় চিলের খশা পালক। পালকের খানিকটা কেটে বাদ দিয়ে মোটা দিকটা বাঁধা হলো ছিপের সুতোয়। এখন কমপ্লীট!

ছিপ এনে হিমাদ্রি দিলে বোকার হাতে! বোকা মহা খুশী···সে বললে—টোপ···মাষ্টার মশায়?

—আনছি।

হিমাদ্রি এলো রাখাল খানশামার কাছে···তার কাছ থেকে মিললো এক স্লাইস্ রুটি···মাখন-মাখানো রুটি।

এ-রুটির খানিকটা ছিঁড়ে টোপ করে বঁড়শীতে গেঁথে দেওয়া হলো বোকার হাতে। ঝিলের ধারে একখানা বড় পাথরের উপর বসে বোকা ছিপ ফেললো জলে।

হিমাদ্রি ভাবলো, কি বরাত করেই এসেছি! ছেলে নয়···দৈত্য···নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরানো বলে যাকে!

হিমাদ্রি ঝিলের ধারে পায়চারি করে বেড়াচ্ছে।

ওদিকে পূর্ণিমা কাছাকাছি ঘুরছে অবনীকে নিয়ে···মা বিন্দুবাসিনী ডেকে বললেন—কিছু খেয়ে নাও তোমরা। রাখাল নিয়ে যাচ্ছে—চা, হালুয়া আর চপ। দুপুরে কখন খাওয়া হবে এর পরে!

অবনী বললে—এসেই খাওয়া, ছোট পিসিমা?

বিন্দুবাসিনীকে অবনী ডাকে ছোট পিসিমা বলে।

বিন্দুবাসিনী বললেন—হ্যাঁ, বাবা। ওদিকে কত দেরী হবে! চান করবে তো?

অবনী বললে—নিশ্চয়। এত বড় ঝিল···সাঁতার কাটবো মনের আনন্দে!

পূর্ণিমার দুচোখ হলো এত বড়। সে বললে—আপনি সাঁতার জানেন!

হেসে অবনী বললে—জানি, কি, জানি না···প্রমাণ পাবে চোখে দেখে। তুমি জানো সাঁতার?

—না!

—এঃ! শুধু লেখাপড়া আর গানবাজনা শিখছো···সাঁতার শেখোনি! সাঁতার শেখা সব-আগে দরকার। মাটী ছেড়ে জলে কখনো ঘুরবে না··· এমন তো কারো কোষ্ঠীতে লেখা নেই। জলে ঘুরতে হলে কখন সেই 'নৌকা ফীসন ডুবিছে ভীষণ'···সাঁতারটা শিখে রাখা উচিত···তাহলে জলে নির্ভয়ে বিচরণ করা চলে!

—কি করে শিখবো, বলুন? পূর্ণিমা বললে হতাশ কণ্ঠে···বললে— মেয়েমানুষ।

অবনী বললে—বাঃ···মন্দ কথা নয় তো! মেয়েমানুষ হয়ে এগজামিন পাশ করছো পুরুষমানুষের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে···গান গাইছো···বাজনা বাজাচ্ছো···ঘোমটা ফেলে দিয়ে পর্দ্দা ছিঁড়ে ফর্দ্দা পথে পুরুষের সঙ্গে সমানতালে পা ফেলে চলছো—আর সাঁতারের বেলায় অমনি মেয়েমানুষ সেজে জুজুবুড়ী! না, না, না···সাঁতারটা শিখে ফ্যালো, পূর্ণিমা।

—কে শেখাবে? কোথায় শিখবো? বাড়ীর বাগানে ঐ পুকুরে?

—হ্যাঁ···কেন হবে না! পুকুর তো···চৌবাচ্ছা নয়! আচ্ছা, আমি যদি বেশী দিন থাকি···আমি শেখাবো সাঁতার। শিখবে?

—ডুবে যাই যদি?

—ডুববে কেন! জানো, সাঁতার শেখবার চমৎকার মেথড আছে এখন। মোটরের একটা টিউব ফুলিয়ে…ব্যস, কারো সাহায্য দরকার হবে না। আমি দেবো শিখিয়ে। কালই যদি বলো…

আনন্দে বিগলিত হয়ে পূর্ণিমা মাথা নাড়লো…মাথা নেড়ে বললে—হ্যাঁ। সত্যি শিখবো।

বিন্দুবাসিনী তাড়া দিয়ে রাখালকে নিয়ে এলেন…তার হাতে ট্রেতে প্লেট, পেয়ালা।

বিন্দুবাসিনী বললেন—বোকা কোথায় গেল? বোকা? আর তার মাষ্টার মশায়?

চায়ের পেয়ালা হাতে নিয়ে অবনী বললে—চা খেতে খেতে আমি দেখছি, ছোট পিসিমা…তাকে ডেকে আনছি।

চায়ের পেয়ালা হাতে অবনী বেরুলো…বেরিয়ে ক'পা এগিয়ে যেতেই দেখে, ঝিলের ওপারে জলে ছিপ ফেলে একখানা পাথরে বোকা বসেছে মাছ ধরতে।

অবনী তাকে ডাকলো—মা ডাকছেন, বোকা…খাবে এসো।

বোকা তাকালো এদিকে…বললে—আমি যেতে পারবো না…মাছ ধরছি।

অবনী ফিরলো বিন্দুবাসিনীর কাছে…বললে—সে মাছ ধরছে…আসবে না।

বিন্দুবাসিনীর দুচোখ হলো বিস্ফারিত। তিনি বললেন—মাছ ধরছে! ছিপ পেলে কোথায়?

অবনী বললে—কি জানি! দেখলুম তো, জলে সুতো ফেলে একটা কঞ্চি হাতে বসে আছে।

—তার মাষ্টার-মশায়?

পূর্ণিমা দিলে জবাব। পূর্ণিমা বললে—ঐখানেই আছেন নিশ্চয়। তাঁর যা চাকরি…মাষ্টারী নয় তো…ঘোড়ার সহিসী করা!

বিন্দুবাসিনী তাকালেন রাখালের দিকে…বললেন—তুই যা রাখাল…ও যা ছেলে…আসবে না। তুই নিয়ে যা ওর আর মাষ্টার-মশায়ের জন্য দু-পেয়ালা চা আর দুখানা প্লেটে করে হালুয়া আর চপ।

রাখাল চললো প্লেট আর পেয়ালা নিয়ে। অবনী চায়ের পেয়ালা নিঃশেষ করে খাবারের প্লেট হাতে নিয়ে বললে—একবার দেখে আসি ছোট পিসিমা, বোকার মাছ ধরা!

পূর্ণিমা গেল না…ঢাকা-বারান্দায় চেয়ারে বসে সে খাওয়ায় মনোনিবেশ করলো।

ঝিলের ধারে হিমাদ্রির সঙ্গে অবনীর দেখা…

হেসে অবনী বললে—রাখালী করছো?

নিশ্বাস ফেলে হিমাদ্রি বললে—উপায় কি, বলো? হতভাগা ছেলে… এক-একবার কি মনে হয় জানো?

অবনী বললে—কি?

হিমাদ্রি বললে—ওর মাথাটা দি ভেঙ্গে…তার জন্য যদি ফাঁসি-কাঠে ঝুলতে হয়, সেও ভালো।

—যা বলেছো! হেসে অবনী করলো মন্তব্য।

রাখাল দিলে হিমাদ্রির হাতে তার প্লেট আর পেয়ালা। বোকা বললে—আমি এখন নিতে পারবো না। তুই দাঁড়া রাখাল…মাছ ধরে তার পর খাবো।

রাখাল দাঁড়িয়ে রইলো বোকার কাছে…তার হাতে ট্রে…একটু দূরে অবনী আর হিমাদ্রি।

খেতে খেতে হিমাদ্রি বললে—হাউ ট্রবল্‌সাম মাই লাইফ!

—তবু লেগে আছো···আশ্চর্য্য!

—সাধে লেগে আছি! নিশ্বাস ফেলে হিমাদ্রি বললে—ওনলি ফর মাই গডেস্‌! এখান থেকে চলে গেলে ওঁকে দেখতে পাবো না···আমার পৃথিবী অন্ধকার হয়ে যাবে! ওয়ার্ডসওয়ার্থের সেই কবিতা মনে আছে—She walks in beauty like the Night···

বাধা দিয়ে অবনী বললে—থামো, থামো···কবিতা আউড়ে কোনো প্রেমিক আজ পর্য্যন্ত নায়িকাকে লাভ করেনি! জানো, মেয়েরা চায় হীরোইক-নায়ক···ভ্যালর···ক্যরেজ! জানো তো সেই কথা—None but the brave ··

হিমাদ্রি বললে—কিন্তু ব্রেভারির কি-কাজটা করবো···বলতে পারো? এই যে রামবিচ্ছু ছেলেটার সঙ্গে লেগে আছি···এতে আমার ব্রেভারির কম্‌তি আছে? বলো?

—রোসো, রোসো! অবনী বললে—আমার মাথায় আইডিয়া আসছে। এই একটু আগে তোমার গডেসের সঙ্গে সাঁতারের কথা হচ্ছিল। উনি সাঁতার জানেন না···সাঁতার শিখতে চান···সাঁতারের উপর এ্যাডমিরেশন আছে—কথার ভাবে বুঝলুম। তা···তুমিও তো সাঁতার জানো?

—জানি। কিন্তু জানি বলে কি করতে হবে, শুনি! সাঁতার কেটে চার-পাঁচ বার ঐ ঝিলটা লম্বালম্বি ভাবে পার হতে হবে? বলো···তাতে যদি···

দু ঠোঁট চেপে মাথা নেড়ে অবনী বললে—উঁহু···তা নয়।

—তবে?

—আঃ···আমাকে ভাবতে দাও···ভাবতে দাও।

—শীগগির শীগগির ভাবো, ভাই। তুমি বুঝচো না···আমার বুকের মধ্যে কি হচ্ছে! এই রামবিচ্ছু ছেলেটাকে নিয়ে যে কৃচ্ছ্র সাধন আমার চলেছে···

—বুঝি···বুঝি, হিমাদ্রি। কিন্তু মনে রেখো, এতে ধৈর্য্য চাই···তড়িঘড়ি নয়। জানো তো, রমণীর মন···লক্ষ জনমের সখা, সাধনার ধন!

—আরে রাখো তোমার নাটকের বচন! আমার প্রাণটা···

বাধা দিয়ে অবনী বললে—হয়েছে···হয়েছে···দী আইডিয়া!

—কী··কী আইডিয়া?

অবনী বললে—ধরো, ছেলেটাকে আমি ঠেলে জলে ফেলে দিই যদি··· ঐ তো জাঁদামার্কা ছেলে···জলে চুবন খাবে···তুমি ধাঁ করে অমনি জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে ওকে টেনে ডাঙ্গায় তুলবে। দী ফ্যামিলি উড্ বী গ্রেটফুল··· আর সে-গ্রাটিচ্যুড্ দেখাবার জন্য তোমাকে তখন···

এ-কথা শুনে হিমাদ্রি একাগ্র দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো অবনীর দিকে··· নির্বাক!

অবনী বললে—দেখি ভেবে···আজই এখানে···কিন্তু তার আগে ভেবে আমার প্ল্যানটা আরো ম্যাচি য়ার করি—বুঝলে!

পাঁচ

আরো আধঘণ্টা পরে···

বোকার ছিপে মাছ ওঠে না···কতক্ষণ ধৈর্য্য থাকে! হ্যাঁচকা টানে ক'বার ছিপ তুলেছে···রাখাল পাশে দাঁড়িয়ে···তার হাতে খাবারের ট্রে··· রাখাল চায় মুক্তি···কিন্তু রাম-খোকা বোকা মনিবকে সে বেশ ভালো করেই জানে· বাহিরে যত খাতির করুক, নিজেদের মধ্যে তারা গুঞ্জন তোলে— ছেলে নয়—জ্যান্ত উল্লুক! কলকাতার চিড়িয়াখানায় কবে তাদের মধ্যে

কে উল্লুক দেখে এসেছিল···বোকা মনিবের জুলুম দেখে তার মনে পড়েছিল, চিড়িয়াখানায়-দেখা সেই উল্লুককে! মুক্তি পাবার আশায় বোকা মনিবের মন রাখতে বারবার বলেছে—ঐ···ঐ···এবারে টোপ গিলেছে··· মারুন দাদাবাবু, টান। এবং তার কথাতেই বোকা ক'বার হ্যাঁচকা টানে ছিপ তুলেছে।

সাতবারের বার ছিপ তুলে যখন বোকা দেখলো, ফক্কা···তখন রাগে সে জ্বলে উঠলো···ছিপটাকে বাগিয়ে ছিপটির মতো ধরে রাখালের পিঠে সপাসপ্······

ট্রে-হাতে রাখাল দু-চারবার লাফ দিয়ে কাৎরে উঠলো···তারপর বললে —আহাহা···ওতে কি করে মাছ পাবেন! টোপ গিলে খেয়ে পালিয়েছে মাছ। দিন···আমি ভালো করে টোপ গেঁথে দিই। আমার জানা আছে, দাদাবাবু···ছিপ ফেলে দেশের পুকুরে-নদীতে কত মাছ ধরেছি তো।

এ-কথায় রাখালের হাতে বোকা দিলে হাতের ছিপ···রাখাল ছিপ নিয়ে বোকার সামনে ট্রে রেখে বললে—আপনি খেয়ে নিন···আমি আপনার বঁড়শীতে টোপ গেঁথে দি আচ্ছা করে!

বেশ খানিকটা মাখন-মাখানো রুটির স্লাইস চেপে চেপে বঁড়শীতে গাঁথলো রাখাল ··রীতিমত টাইট করে···বোকা ততক্ষণে গপ্‌গপিয়ে তার খাওয়া শেষ করেছে। তা দেখে, নিশ্বাস ফেলে রাখাল যেন বাঁচলো! ছিপটা বোকার হাতে দিয়ে রাখাল বললে—এখানটায় আর নয় দাদাবাবু···এবারে ঐ ঝোপটার ধারে গিয়ে বসে ছিপ ফেলুন···এখানকার মাছগুলো চালাক হয়ে উঠেছে··· বুঝেছে, টোপ গেঁথে আপনি তাদের ধরতে চান।

কথাটা বোকার মনে লাগলো। বোকা সে-কথা শুনে ঝোপের ধারে গিয়ে বসলো···বসে জলে ছিপ ফেললো। রাখাল নিশ্বাস ফেলে ট্রে নিয়ে ফিরলো রান্নাঘরের দিকে।

হিমাদ্রি? হিমাদ্রি কাছাকাছি পায়চারি করছে। মনে তার শুধু এক চিন্তা—পূর্ণিমা দেবী! নজর এদিকে-ওদিকে! অবনী? অবনী কোথায়?

ঐ অবনী···বাগান চক্র দিচ্ছে···সঙ্গে পূর্ণিমা দেবী। পূর্ণিমা দেবীর কলহাসির ঝাপটা আসছে বাতাসে ভেসে···কথার দু-চারটে টুকরো সেই সঙ্গে—হিমাদ্রির বুক টন্‌টন্ করছে ব্যথার ভারে! হায়রে, সে যদি হিমাদ্রি না হয়ে অবনী হতো! বিধাতার উপর রাগ হলো! অবনী মোটে লোলুপ নয় পূর্ণিমার জন্য···অথচ পূর্ণিমা তাকে পেয়ে আহ্লাদে আটখানা···আর যে-হিমাদ্রি চায় পূর্ণিমাকে···দেবীর মতো শ্রদ্ধা করে, পূজা করে, ভালোবাসে··· সে-হিমাদ্রির দিকে পূর্ণিমা দেবী ফিরেও তাকায় না!

মনে হলো, কেন তাকাবে? পূর্ণিমা বড়লোকের মেয়ে···তার উপর রূপসী···বিদুষী! হিমাদ্রিকে জানে, তাদের গৃহপালিত মাষ্টার···হিমাদ্রিকে কি উনি মানুষ বলে মনে করেন যে হিমাদ্রির পানে ফিরে তাকাবেন! উনি জানেন না তো, নিতান্ত দায়ে পড়ে আজ মাষ্টারী করলেও হিমাদ্রি···

ঐ···ঐ···ওরা এইদিকে আসছে···কথা কইতে কইতে আসছে। কি কথা? হিমাদ্রি পায়চারি করতে লাগলো···অথচ দুচোখের দৃষ্টি অলক্ষ্যে ওদের দিকে। সে উৎকর্ণ হয়ে পায়চারি করছে—কি কথা হচ্ছে···যদি কাণে তার দু-চারটে ছিটকে এসে লাগে!

পেয়ারা গাছগুলোর পাশ দিয়ে বাঁক ঘুরে অবনী আর পূর্ণিমা আসছে··· অবনী দারুণ চিন্তাকুল···পূর্ণিমা বললে—আপনার কি হলো, বলুন তো? গম্ভীর! মুখে কথা নেই! ভালো লাগছে না এখানটা?

এ-কথায় অবনী নামলো তার কল্প-রথ থেকে পৃথিবীতে···পূর্ণিমার দিকে চেয়ে বললে—হ্যাঁ···কি বলছো?

পূর্ণিমা হাসলো···ভারী মিষ্ট-মধুর হাসি···পূর্ণিমা বললে—কি এত ভাবছেন, বলুন তো ?

পূর্ণিমার উপর দুচোখের পূর্ণ-দৃষ্টি নিবদ্ধ করে অবনী বললে—হ্যাঁ··· ভাবছিই পূর্ণিমা···খুব সিরিয়স কথা ভাবছি !

পূর্ণিমার মাথায় রক্ত উঠলো ছলাং করে ! অবনীর দিকে চেয়ে পূর্ণিমা বললে—আপনি তখন বললেন, আমার সঙ্গে খুব দরকারী কথা আছে···কি আমাকে আপনি বলতে চান !

—হ্যাঁ···বলতে চাই, পূর্ণিমা···জীবন মরণের কথা ।

এ-কথা শুনে পূর্ণিমা চমকে উঠলো ! তার মনে হলো, মা আর পিসিমা যে-কথা প্রায় বলেন···বুঝি !

পূর্ণিমার মুখ-চোখ হলো রাঙা···দুগালে রাঙা গোলাপের আভা···যাকে কবিরা বলেন, সরমের রক্তরাগ ! অবনীর দিকে চেয়ে তখনি সে চোখ নামালো ···চেয়ে থাকতে পারলো না ! তার বুকে কেমন কাঁপন ! বুঝি···বুঝি···

আঃ—তা যদি হয় ! কিন্তু বলছেন না কেন ? বলবেন বলে···এখনো বলছেন না ! ওঁরও লজ্জা হচ্ছে বুঝি !

পূর্ণিমার বুকের মধ্যে জোয়ারের ঢেউ ছুটেছে—ছলাৎ-ছলাৎ ! বুকের ভিতরটা যা করছে !

অবনী দাঁড়ালো···ডাকলো—পূর্ণিমা···

সলজ্জ দৃষ্টিতে পূর্ণিমা তাকালো অবনীর দিকে···এবারও চেয়ে থাকতে পারলো না···চেয়েই চোখ নামালো মাটীর দিকে ।

অবনী বললে—মানে, না···লজ্জা করবো না···বলতেই যখন হবে ! মানে, তুমি বড় হয়েছো···নাটক-নভেল পড়ো—মানুষের হৃদয় বলে যে-জিনিষটা আছে···সে-হৃদয়ের খবরও জানো···নিজের হৃদয়, অপরের হৃদয় ! কি বলো···হৃদয় কাকে বলে, বোঝো তো ?

লজ্জায় কাঁপছে পূর্ণিমা···চোখ তুলে চাইতে পারছে না···মুখে কথা ফুটবে—সে-আশা নেই! সে-সামর্থ্যও তার নেই···কণ্ঠনালীতে যেন রাজ্যের কত-কি জমে নালীটুকু চেপে ধরেছে!

অবনী বললে—আমার পানে চাও···চোখ তুলে!

চোখ তুলে চাইতে হলো···পূর্ণিমা চেয়ে দেখলো। চোখের পাতা অবনীর দৃষ্টির স্পর্শে সেই লজ্জাবতী লতার মতো বুজে আসে!

নিশ্বাস ফেলে অবনী বললে—লজ্জা করবো না···খুলেই বলি। মানে, নাম করবো না···তবে একজন মানুষ···সুশ্রী পুরুষ···তরুণ বয়স···তোমাকে অত্যন্ত ভালোবাসে···তোমাকে সে বলে, দেবী···বলে—যে-মাটীতে পা ফেলে তুমি চলো···সে-মাটীতে বুক দিয়ে শুয়ে থাকতে পারলে সে যেন স্বর্গ পায়!

পূর্ণিমা শুনছে···শুনছে কাঠ হয়ে ··শুনতে শুনতে তার সর্ব্বাঙ্গে কাঁপন··· কবিরা যাকে বলেন, পুলক-শিহরণ···পূর্ণিমার মনে হচ্ছে, এবার···এবার··· তার দেহ টলছে···চোখের সামনে থেকে পৃথিবী যেন উবে একটা রঙীন ফানুশের মতো শূন্যে ভেসে চলেছে···কাণে যেন কিছু আর শুনতে পাচ্ছে না! —দেহ টলে উঠলো···হয়তো পড়ে যেতো···গেল না···তার কারণ, অবনী ধরে ফেললো তার হাত।

অবনীর হাতের স্পর্শে চকিতে পূর্ণিমার সম্বিৎ ফিরলো···হাত ছাড়িয়ে নিয়ে সে একটু সরে দাঁড়ালো।

অবনী দেখলো। অবনী বললে—সে আমার বন্ধু···বহুদিনের বন্ধু··· লেখাপড়া জানে···বোনেদী ঘরের ছেলে।···শুনছো?

পূর্ণিমা শুনেছে···তার মনের মধ্যে যেন চকিতে ভূমিকম্প হয়ে গেল! কিন্তু লেখাপড়া শিখেছে, বুদ্ধিমতী মেয়ে···নিজের সম্ভ্রম-মর্য্যাদা·· চট্ করে নিজেকে সামলে নিলে পূর্ণিমা, নিয়ে পূর্ণিমা চাইলো অবনীর দিকে··· বললে—আপনার বন্ধু?

—হ্যাঁ।

—ও! পূর্ণিমা হাসলো…হেসে পূর্ণিমা বললে—কিন্তু আপনার বন্ধু… এখানে…আমাকে দেখলেন কি করে?

—দেখেছেন। দেখে ভালোবেসে একেবারে…কি বলবো…যাকে বলে, হেড এ্যাণ্ড হার্ট ইন লভ্!

পূর্ণিমা বললে—তাই যদি তো আমাকে সে-কথা তিনি নিজে কেন বলছেন না?

—বলছেন না! অবনী দিলে জবাব—তার কারণ, সে ভয়ানক ভদ্র… তার চেয়ে আরো-ভয়ানক-বেশী লাজুক। তার ভরসা হয় না…মানে, সাহস পায় না তোমাকে জানাবে তার হৃদয়ের আবেগ! তোমাকে সে দেখে…যেন কোন্ স্বর্গের দেবী…কত উর্দ্ধলোকে তুমি আছো…আর সে মাটীর পৃথিবীতে অতি তুচ্ছ মানুষ মাত্র! সে বলে, তুমি যেন আকাশের সূর্য্য…আর সে যেন দীঘির জলে একটা পদ্মফুল! তার নাগাল পাবার নও, তুমি!

হেসে পূর্ণিমা বললে—ভারী মজার গল্প তো!

পূর্ণিমার কণ্ঠে কৌতুকের লহর!

অবনী বললে—তা বলতে পারো। তবে মানুষটি খুব ভালো। নিতান্ত দায়ে পড়ে এখন সামান্য চাকরি করছে…কিন্তু আমি জানি, টাকার মানুষ…যদি তোমার সঙ্গে বিয়ে হয়, তোমাকে সব সুখে সুখী করবেই!

পূর্ণিমা বেশ কৌতুক-কণ্ঠে বললে—আপনিও বেশ মজার মানুষ…দিব্যি গল্প তৈরী করিতে পারেন!

এ-কথা বলে পূর্ণিমা একটু সরে গেল…গিয়েই বলে উঠলো—ও কি, বোকা ছিপ নিয়ে মাছ ধরতে বসেছে! কিন্তু যেখানে বসেছে…বোকা জানে না, পাড় ধ্বসে জলে পড়তে পারে। হুমড়ি খেয়ে বসেছে…দেখুন!

অবনী চেয়ে দেখলো···দেখে বললে—তাইতো···মাটী ওখানে তেমন··· তুমি যাও···আমি ওকে দেখছি···সাবধান করে দিচ্ছি !

পূর্ণিমা হঠাৎ বলে উঠলো—বাঃ···ওধারে কি রকম বড় বড় আতা ফলেছে গাছে···পাড়তে হবে !

পূর্ণিমা চললো অন্য দিকে···অবনী এগুলো বোকার দিকে···তার মাথায় সেই প্ল্যান !···কিন্তু হিমাদ্রি ? হিমাদ্রি কোথায় ?

চারিদিকে চেয়ে দেখতে হিমাদ্রির দেখা মিললো···কতকগুলো কলাগাছ ···সেই কলাগাছগুলোর আড়ালে হিমাদ্রি।

অবনী দু পা এগিয়ে থমকে দাঁড়ালো···বোকা এক-মনে মাছ ধরছে··· নজর জলে—ভাসা ফাৎনার দিকে।

অবনী এলো কাছে···এসে তার কাঁধে হাত রেখে বললে—মাছ ধরা হচ্ছে ? ফাৎনাটা ঐ ডুবছে, ভাসছে···এবারে···

বোকা ঝেঁজে উঠলো···বললে—আঃ ! বলেই ঝাঁকুনি। সঙ্গে সঙ্গে··· যাকে বলে, চক্ষে পলক পড়লো না···অবনী দিলে পিছন-দিক থেকে বোকাকে ধাক্কা···

সে-ধাক্কায় বোকা চীৎকার তুললো···সঙ্গে সঙ্গে জলে পড়লো—এবং শব্দ ঝপাং ঝপ্ আর বোকার আর্ত্তনাদ।

বোকা চুবন খাচ্ছে···যেন সিমেণ্ট-বোঝাই একটা পিপে জলে পড়েছে ! প্রাণপণে হাত ছুড়চে বোকা···সাঁতার জানে না···নাকে-মুখে জল খাচ্ছে··· আর চীৎকার।

হিমাদ্রি বুঝলো···গায়ের জামা খুলে মালকোঁচা বেঁধে ছুটে এসে সে ঝুপ করে লাফিয়ে জলে পড়লো এবং বোকাকে ধরে টেনে নিয়ে এসে ডাঙ্গায় তুললো। অবনীও জামা খুলে জলে নেমেছে···প্রায় কোমর-ভোর জলে···তার আগেই কিন্তু হিমাদ্রি উদ্ধার করেছে বোকাকে। বোকার ঘা

চেহারা···হাউ হাউ করে কান্না ! কাঁদতে কাঁদতে বোকা বললে—ঐ···ঐ··· অবনীদাদা আমাকে ঠেলে জলে ফেলে দিলে !

অবনী দিলে ধমক···বললে—চোপ ! আমি টেনে আনতে গেলুম···তুমি ঝটকা মেরে···আবার বলা হচ্ছে, অবনীদা ফেলে দিয়েছে !

হিমাদ্রি ভিজে ঢোল···বোকার হাত সে ধরে আছে। ঝটকা দিয়ে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বোকা এলো এগিয়ে অবনীর দিকে···মার-মূর্ত্তি ! তার দুচোখে যেন আগুন জলছে ! দেখে অবনী বললে—যাও···ভিজে কাপড় ছেড়ে ফ্যালো গিয়ে। আবার চোখ রাঙানো হচ্ছে···পাজী বদমাস ছেলে ! তোমার বাবাকে বলে দেবো···চলো তুমি বাড়ী ফিরে !

ভেংচে বোকা বললে—হেঁ-হেঁ-হেঁ···সবাই সব বলে দেয়···ঢের জানি আমি !

অবনীর খুব রাগ হয়েছে ! সে বললে—যাও বলছি, নাহলে কাণ ধরে টেনে নিয়ে যাবো ! আমাকে তোমার মাষ্টার-মশাই পাওনি।

বোকা আবার ভেংচে উঠলো, বললে—ধরো না দেখি কাণ···কত তোমার মুরোদ !

এ-কথার পর কি হতো···অবনী তার কাণ ধরতো, বা বোকা কি করতো তা দুর্জ্ঞেয় রয়ে গেল···কেন না, গোলমাল শুনে পূর্ণিমা এসে হাজির···এসে অবনীকে সরিয়ে বোকার সামনে দাঁড়ালো···বললে—ফের যদি বাঁদরামি করবি ···দেখবি মজা। যা···ভিজে জামা-কাপড় ছেড়ে ফ্যাল্ গিয়ে। নাহলে ··

—হুঁ···ফেলবে ! চোখ পাকিয়ে বোকা বললে—নাহলে কি···শুনি ?

হিমাদ্রি বেশ শান্ত ভাবে বোকাকে বললে—এসো বোকা···আমরা ভিজে জামা-কাপড় ছেড়ে ফেলবো···এসো।

পূর্ণিমা কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে···তারো দুচোখে আগুন···দেখে বোকা আর কোনো কথা বললে না···হিমাদ্রির সঙ্গে সেখান থেকে চলে গেল।

এখানে তখন পূর্ণিমা আর অবনী···পূর্ণিমা বললে অবনীকে—আপনি ভিজে কাপড় ছেড়ে ফেলবেন, চলুন।

কোঁচায় পাক দিয়ে জল নিংড়ুতে নিংড়ুতে অবনী বললে—হ্যাঁ···চলো। ভারী বদ ছেলে তো! চুপচাপ থাকে···আমি ভাবি, ভালো মানুষ।

—হুঁঃ···ভালো মানুষ! পূর্ণিমা বললে—যাকে বলে, বিচ্ছু! মা-ই আরো আদর দিয়ে দিয়ে ওর মাথা খাচ্ছে! লেখাপড়ায় গোবর-গণেশ ·· অথচ দেখুন না, যে-বায়না নেবে, মা অমনি···এতে ও মানুষ হতে পারে কখনো? তবু এ-মাষ্টার-মশায় এসে ওকে যাহোক খানিকটা বসিয়ে পড়াচ্ছেন! কিন্তু মাষ্টার-মশায়কে যা ও করে···আমার দুঃখ হয়···সত্যি, ভদ্রলোক নেহাৎ পেটের দায় বলে সহ্য করেন! আমি হলে···

দুজনে চললো বাড়ীর দিকে বোকার সম্বন্ধে নানা কথা কইতে কইতে···

হিমাদ্রির উপর পূর্ণিমার দরদ আছে···তাহলে! বলে, ভদ্রলোক নেহাৎ পেটের দায়ে! সে ভাবলো, এই দরদ···গল্পে উপন্যাসে পড়েছে··· এই দরদ থেকেই মেয়েদের মনে ভালোবাসা জন্মায়! অতএব···

কিন্তু না···সত্য যে-ভূমিকা ফেঁদেছে, তারপর এ-ঘটনার পর যদি দুম্ করে ভক্তর নাম হিমাদ্রি বলে প্রকাশ করে, পূর্ণিমা ভাবতে পারে—যোগ-সাজস! উঁহু—ধৈর্য্য চাই। সময়সাপেক্ষ ব্যাপার!

বাড়ী ফিরে বাথরুমে গিয়ে অবনী কাপড় বদলে বেরিয়ে এলো। পূর্ণিমা বারান্দায় বসে আছে···রান্নাঘরের দিকে বোকার চীৎকার চ্যাঁচামেচি···শোনা যাচ্ছে। মার কাছে কান্না···নালিশ···কত কি···

পূর্ণিমা বললে—আপনি ঠিক কাজ করেছিলেন··ওকে ধাক্কা দিয়ে জলে ফেলে···

অবনী চমকে উঠলো! সে বললে—আমি ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছি?

—ও তাই বলছে মাকে। আমিও দেখেছিলুম, আপনি ওকে···

সর্ব্বনাশ! পূর্ণিমা তাহলে···অবনী তবু দমলো না! সে বললে—না, না···তুমি ভুল দেখেছো! আমি ওকে বলছিলুম, ওখানে বসো না, সরে বসো—ও রাজী নয়। তখন আমি ওকে টেনে আনছিলুম···ও গা-ঝাড়া মারলো···অমনি সঙ্গে সঙ্গে···

হেসে পূর্ণিমা বললে—যদি ধাক্কাই দিয়ে থাকেন, তাতে কি! আপনি ঠিক করেছিলেন! আপনি জানেন না···সময়-সময় ও এমন করে যে রাগে আমার মনে হয়, দিই ওর একটা হাত কি পা ভেঙ্গে! জানেন না তো ওকে···

অবনী হাসলো···বললে—কদিনে জেনেছি বৈকি···খুব জেনেছি!

পূর্ণিমা বললে—সত্যি···আপনাকে যত দেখছি, আমার এত ভালো লাগছে! এমন ছেলেমান্ষী···খুনশুটি করা···

দুপুরে খাওয়া-দাওয়া হলো···অবনী, পূর্ণিমা, হিমাদ্রি আর বোকা···একসঙ্গে খেতে বসেছে। পিসিমা, বিন্দুবাসিনী দুজনে বসে যত্ন করে খাওয়ালেন।

খাওয়া-দাওয়ার পর অবনী বসলো বারান্দায় এসে—ঢাকা বারান্দা···বেশ বড়···মেঝেয় বড় সতরঞ্চ পেতে তার উপর চাদর বিছিয়ে দেওয়া হয়েছে···কটা তাকিয়া পড়েছে।

বারান্দার বিছানায় তাকিয়ায় ঠেশ দিয়ে অর্দ্ধশায়িত ভাবে পড়ে আছে অবনী···ভাবছে, হিমাদ্রির হৃদয়-রোগের চিকিৎসার কথা···ঔষধ সামনে—পূর্ণিমা! কিন্তু এ মিকশ্চার নয়, পিল নয় যে খাইয়ে দিলেই হলো! এ-ব্যাধি সারাতে হলে পূর্ণিমার হৃদয়ের সন্ধান নেওয়া চাই! পূর্ণিমার

কথায় আভাসে ইঙ্গিতে যেটুকু পরিচয় পেয়েছে হিমাদ্রির পক্ষে তা অনুকূল নয়! বরং···

কিন্তু তা হয় না! পিসিমারা যে-মতলব করছেন, অর্থাৎ তার সঙ্গে পূর্ণিমার বিবাহ···না, না···তা হতে পারে না! বিয়ে সে করবেই না! পরে মনের কি ভাব হয়, জানে না···তবে এখন মনের যে-ভাব—কদাপি নৈব নৈব চ!

কি করে পূর্ণিমার হৃদয়কে উর্ব্বর করে তুলে হিমাদ্রির উপর তার প্রেমানুরাগের বীজ···

এমনি চিন্তার মাঝখানে পূর্ণিমার উদয়—পূর্ণিমা এসে সতরঞ্চে বসলো··· একটু তফাতে।

পূর্ণিমা বললে—কি ভাবছেন?

অবনী বললে—ভাবছি···হুঁ···অনেক কথা ভাবছি। মানুষের ভবিষ্যৎ···

পূর্ণিমা হাসলো, বললে—মানুষের জন্য এত ভাবনা হবার কারণ? বোকাকে দেখে? ওবেলার কথা ভেবে?

অবনী তাকালো পূর্ণিমার দিকে···বললে—বলতে পারো। শুধু বোকার কথা ভাবছি না। তোমার কথা ভাবছি, আমার নিজের কথা ভাবছি, বোকার ঐ মাষ্টার-মশায়টির কথা ভাবছি!

পূর্ণিমার ভারী মজা লাগলো। তার মনে অসহ্য কৌতূহল···অবনীর দিকে হাতখানেক সরে এসে বললে—বলুন না···কি ভাবছেন? আচ্ছা, আমার কথাই বলুন···আমার সম্বন্ধে কি ভাবছেন?

—তোমার সম্বন্ধে! অবনী চুপ করে তাকিয়ে রইলো পূর্ণিমার দিকে চেয়ে···প্রায় দুমিনিট···তারপর বললে—তোমার সম্বন্ধে ভাবছি, এমন চমৎকার মেয়ে তুমি···যেমন রূপ, তেমনি বুদ্ধি···তোমার যোগ্য পাত্র······

পূর্ণিমার লজ্জা হলো। কুন্ঠিত হয়ে সে বললে—থাক···সে কথা নাই ভাবলেন! ছদিনের জন্য এখানে এসেছেন···ছদিন পরে চলে যাবেন··· আমার কথা তখন মনেও থাকবে না!

কথাটা শেষ করে পূর্ণিমা নিশ্বাস চাপতে পারলো না।

অবনী লক্ষ্য করলো পূর্ণিমার ভাব···অবনী বললে—কি···বলো? আমার যে-বন্ধুর কথা বলছিলুম···তোমার যোগ্য সে—তাতে আমার ভুল নেই। এমন ভালোবাসা, এমন শ্রদ্ধা···

পূর্ণিমা বিরক্ত হলো। কিন্তু বিরক্তির ভাব চেপে সে বললে—ও···সেই ওবেলার গল্পটা···সে-গল্প শেষ করুন···বুঝলেন, অমন আধখানা বলে রাখতে নেই···আধকপালে ধরবে! সত্যি···বলুন না, কে এ-মহাপুরুষ? ভাস্করানন্দ স্বামীর কোনো শিষ্য নয় তো?

অবনী বললে—শুনে লাভ?

—লাভ, কি, লোকসান···না-জেনে কি করে বলবো বলুন? কে··· আগে বলুন···তবে তো বলবো!

অবনী কোনো জবাব দিলে না···নিঃশব্দে তাকিয়ে রইলো পূর্ণিমার দিকে···প্রায় দু মিনিট। তারপর হেসে অবনী বললে—দেবো তার পরিচয়। তার আগে শুধু জানতে চাই···তোমার হৃদয়ের খবর। মানে, কাকেও ও-হৃদয় দান করোনি তো? একালে তোমাদের যে স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে, তাতে হৃদয়ের কারবারটা···রবীন্দ্রনাথের সেই গানটা জানো তো?

পূর্ণিমা বললে—কোন্ গান? তার কণ্ঠে আগ্রহের সুর!

অবনী বললে—সেই গানটা···

কি হলো রে আমার

বুঝিবা সজনি, হৃদয় আমার হারিয়েছি!

প্রভাত-কিরণে সকাল বেলাতে
মন লয়ে সখি, গেছিনু খেলাতে,
মন কুড়াইতে, মন ছড়াইতে
মনের মাঝারে খেলি বেড়াইতে···

আর বলা হলো না! দু'চোখে ভৎসনার ঝিলিক···পূর্ণিমা উঠে তখনি প্রায় ছুটে সেখান থেকে চলে গেল।

সন্ধ্যার আগে বাড়ী ফেরা। হিমাদ্রি আর বোকা···দুজনকে পাওয়া গেল না। রাখাল বললে বিন্দুবাসিনীকে—বিকেলে মাষ্টার-মশায়কে নিয়ে দাদাবাবু ষ্টেশনে গিয়েছিলেন···ট্রেন আসছিল···দাদাবাবু জেদ ধরলেন, ট্রেনে চড়ে বাড়ী যাবেন। কাজেই মাষ্টার-মশায় টিকিট কিনে তাঁকে নিয়ে ট্রেনে চড়ে চলে গেছেন।

কপালে হাত চাপড়ে বিন্দুবাসিনী বলে উঠলেন—কি লক্ষীছাড়া ছেলে গো! আমাকে পাগল না করে ও ছাড়বে না! ছাখো একবার কাণ্ড! আর মাষ্টার-মশায় বা কি রকম মানুষ! ছেলে জেদ ধরলো বলেই তিনি অমনি···

পূর্ণিমা বললে—তাঁর কি দোষ! ছেলেকে উনি শাসন করবেন, সে-অধিকার তোমরা ওঁকে দিয়েছো কি? সত্যি মা, তুমি শক্ত হও···তোমার জন্যই ও এমন···

বাধা দিয়ে বিন্দুবাসিনী বললেন—তুই থাম বাপু···কি শাসন করবো বল্ তো? ছেলে ডাগর হয়েছে···বাচ্ছা নয়! ওকে মারবো? না, কি করবো?

পূর্ণিমা বললে—শক্ত হওয়ার মানে, মারধোর করা নয়···ওর বায়না শুনো না। যা বলবে ও···তুমি তাই শুনবে···এমনটি করো না আর!

বিন্দুবাসিনী কোনো জবাব দিলেন না। লোকজন জিনিষপত্র তুলতে লাগলো মোটরে···যেগুলো মোটরে যাবে; বাকি সব নিয়ে তারা ফিরবে ট্রেনে।

ছয়

বাড়ীতে রাত্রে সেদিন অবনীর সঙ্গে পূর্ণিমার কথা···

খাওয়াদাওয়ার পর পূর্ণিমা ধরলো অবনীকে—যদি ক্লান্ত না হয়ে থাকেন, চলুন, ড্রয়িংরুমে বসে একটু গল্প করা যাক! কি বলেন? টায়ার্ড ফীল্ করছেন?

অবনী বললে—তুমি করছো?

—না।

—তাহলে আমাকে টায়ার্ড মনে করছো কেন? টায়ার্ড হবার মতো এমন কোনো কাজ করিনি সেখানে—মাটী কোপানো নয়···কূয়া থেকে জল তোলা নয়···ছুটোছুটিও নয়! টায়ার্ড ফীল্ করবো কেন?

মৃদু হেসে পূর্ণিমা বললে—তা নয়, তবে এতখানি পথ মোটরে যাওয়া-আসা···সেখানে ঘোরাঘুরি···খাওয়াদাওয়ার অনিয়ম···

হেসে অবনী দিলে জবাব—এতেই যদি এ-বয়সে টায়ার্ড ফীল্ করি··· তাহলে বুঝতে হবে, আমার পরমায়ুর সম্বন্ধে তোমার ধারণা···মোষ্ট হোপলেশ্!

—যান্! সব কথায় আপনার তামাসা!

—বেশ, তামাসা করবো না আর·· খুব গম্ভীর এবং চিন্তাশীল হবো এবার থেকে!

অভিমানে পূর্ণিমা চোখ ফিরিয়ে চলে গেল! অবনী ডাকলো—পূর্ণিমা···

পূর্ণিমা দাঁড়ালো···ফিরে তাকালো। অবনী বললে—চলো···কত গল্প করতে চাও···করবে চলো। সারা রাত যদি গল্প চাও, তাই হবে! দেখিয়ে দেবো, মোটরে এতখানি পথ যাওয়া আসা···সেখানে ঘোরাঘুরি··· অনিয়ম···তা সত্বেও আই এ্যাম গোয়িং কোয়ায়েট ষ্ট্রঙ্!

—বাবাঃ বাবাঃ ··আপনার সঙ্গে কথায় যে পারবে, সে এখনো জন্মায়নি! নমস্কার আপনাকে!

এ-কথা বলে দুহাত অঞ্জলিবদ্ধ করে পূর্ণিমা কপালে ঠেকালো।

হেসে অবনী বললে—ব্রাহ্মণ···আশীর্ব্বাদ করছি, তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হোক!

তারপর দুজনে এসে বসলো ড্রয়িংরুমে। মেঝেয় কার্পেট পাতা এবং সেই কার্পেটে উপুড় হয়ে লম্বালম্বি শুয়ে বোকা একখানা ছবির বড় ম্যাগাজিন মেলে নিবিষ্ট মনে ছবি দেখছে!

পূর্ণিমা বললে—এখনো শুতে যাসনি যে! যা, শুতে যা!

ঘাড় তুলে দুচোখে ডাগর দৃষ্টি ফুটিয়ে বোকা বললে—কেন? তোমার কথায় যেতে হবে?

—হঁ্যা, আমার কথায় যেতে হবে! যা, শুতে যা।

—যাবো না! এর সব ছবিগুলো দেখে তারপর যাবো।

—না। এখনি যেতে হবে। রাত এগারোটা বাজে···তোমার শুতে যাবার কথা দশটার মধ্যে।

—বারে···এই তো খেয়ে এলুম!

—তবু···যাবে। যাও···কথা শোনো।

এ-কথা বলে পূর্ণিমা তার কাগজখানা নিলে তুলে। বোকা তিড়বিড়িয়ে লাফিয়ে উঠলো···উঠেই ধেই-ধেই নাচতে নাচতে ডাকলো—মা, এই ছাখো 'সে···দিদি কি করছে আমাকে নিয়ে!

সে-ডাকে মায়ের সাড়া মিললো না···মা তখন একতলার ঘরে।

পূর্ণিমা ধরলো খোকার হাত···ধরে বললে—এখনি নিয়ে যাবো বাবার কাছে। জানো, বাবার হুকুম···

দু-চোখে আগুন জেলে খোকা তাকালো তার দিদির পানে—দিদি বললে—তোর চোখ-রাঙানিকে আমি গ্রাহ্য করি না! যা···যা বলছি।

বলে খোকাকে ধাক্কা। খোকা দুচোখে অগ্নিবর্ষণ করতে করতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল···যাবার সময় শাসিয়ে গেল—মার কাছে যাচ্ছি··গিয়ে মাকে বলছি! এখানে দুজনে বসে গল্প করবেন বলে আমাকে তাড়িয়ে দেওয়া আমি কিছু বুঝি না?

পূর্ণিমা সে-কথার জবাব দিলে না···অবনীর দিকে তাকিয়ে বললে—দেখলেন, কি রকম বদ হয়েছে!

অবনী বললে—ওর নার্ভের গোলমাল। তোমার বাবা এত বড় নার্ভ-স্পেশালিষ্ট···অথচ ছেলের সম্বন্ধে কোনো কিছু করেন না!

—হ্যাঁ। মা বলেন···আমি বলি—বাবা চুপ করে থাকেন শুধু।

অবনী বললে—চিকিৎসার দরকার। বংশে একটি ছেলে···বয়স হয়েছে···অবহেলা করা ঠিক নয়!

এ-কথার পর চুপচাপ···কারো মুখে কথা নেই···অনেকক্ষণ। পূর্ণিমা বসলো অবনীর সামনাসামনি একটা সোফায়···তারপর বললে—ছেড়ে দিন ওর কথা। এখন···

এইটুকু বলেই পূর্ণিমা থামলো···দু-চোখের সাগ্রহ দৃষ্টি অবনীর মুখে নিবদ্ধ।

অবনী তার দিকেই চেয়ে আছে। অবনী বললে—এখন···কি···বলো?

—আপনি তামাসা করবেন না?

—না। বলেছি তো, গম্ভীর হবো, চিন্তাশীল হবো।

—ঐ তো! পূর্ণিমা হাসলো···হেসে বললে—আবার তামাসা!

—বাঃ···একে তামাসা বলে! হেসেছি? না···

বাধা দিয়ে পূর্ণিমা বললে···আবদারের ভঙ্গীতে···পূর্ণিমা বললে—বেশ সহজভাবে কথা কইতে পারেন না? আমি যেমন সহজভাবে কথা কইছি, এমনি?

—চেষ্টা করবো। বলো, কি করতে হবে?

পূর্ণিমা এক-মিনিট চুপ করে কি ভাবলো···তারপর ফশ্ করে এক নিশ্বাসে বললে—বাগানে যে-কথা বলছিলেন···সেই ইনটারেষ্টিং চ্যাপটার··· আপনার কোন্ বন্ধুর সম্বন্ধে···

অবনী হাসলো···মৃদু হাসি। হেসে অবনী বললে—এ-কথার জবাব দিলেই তো তুমি বলবে, তামাসা করছি!

—তা কেন? তামাসা করলে তামাসা করছেন, বলবো। তামাসা যদি না করেন, তাহলে কেন তা বলবো? তা বুঝি কেউ বলে?

অবনী বললে—মুস্কিল হয়েছে কি, জানো? আমার সম্বন্ধে তোমার একটা বদ ধারণা হয়ে গেছে যে আমি যা বলি, সব তামাসা করে বলি। কাজেই···

—না, না·· বাজে কথা নয়। বলুন না, কে সে-বন্ধু? কোথায় তাঁকে পেলেন? আমাকেই বা সে-বন্ধু দেখলেন কোথায়?

অবনী বললে—তোমাকে তিনি এইখানেই দেখেছেন···ইন্ ইয়োর মেনি ফেজেস্ এবং দেখে-দেখে তোমাকে দেবী বলে তাঁর বিশ্বাস!

—কে? না, সত্যি, বলুন···বলতেই হবে।

—না···এখন বলবো না। বলবো, যদি তুমি আমাকে বিশ্বাস করে··· লজ্জা-সরম ত্যাগ করে বন্ধুভাবে গ্রহণ করে সে-কথাটি বলো!

—কি কথা? পূর্ণিমার কণ্ঠে এবং দৃষ্টিতে বিস্ময়!

অবনী বললে—বাগানে যে-কথা জিজ্ঞাসা করেছিলুম। তোমার হৃদয়ের কথা···মানে, হৃদয় নিজেরই আছে? না, ও-হৃদয় কোনো ভাগ্যবানকে দান করে বসে আছো?

এ-কথায় পূর্ণিমার দু-গালে আবার সেই রক্ত-গোলাপের আভা! পূর্ণিমা মুখ নামালো···মুখে কথা নেই।

অবনী তার পানে চেয়ে আছে···একাগ্র দৃষ্টিতে···অনেকক্ষণ। পূর্ণিমা মুখ তোলে না···কোনো জবাবও দেয় না!

অবনী বললে—বলো। চুপ করে রইলে যে!

পূর্ণিমা কোনো জবাব দিলে না···নিঃশব্দে উঠে দাঁড়ালো···তারপর কোনো মতে অবনীর দিকে চেয়ে পূর্ণিমা বললে—যান···শুতে যান। সত্যি, রাত হয়েছে। আমারো ঘুম পাচ্ছে···শুতে যাই।

এ-কথা বলে পূর্ণিমা এক সেকণ্ড দাঁড়ালো না···নিঃশব্দ পদসঞ্চারে তার প্রস্থান।

অবনী সবিস্ময়ে তার পানে চেয়ে রইলো···তার মাথার মধ্যে রক্তের তরঙ্গ!

অবনী তার ঘরে···শোয়নি···খোলা খড়খড়ির ধারে দাঁড়িয়ে কি ভাবছে।

পিসিমা এলেন···বললেন—এখনো শুতে যাসনি?

—না। এবার শোবো।

—দাঁড়িয়ে কি ভাবছিস?

অবনী বললে—ভাবছি, এখানে আর নয়, পিসিমা। জানো কথা আছে, পরভাতী ভালো—কিন্তু পরঘরী হয়ে বাস করা ঠিক নয়! চলো,

কালই আমাদের অসির বাড়ীতে চলে যাই...মানে, তুমি যদি আরো কিছুকাল কাশীতে থাকতে চাও। আর যদি বলো, না, কাশী ঢের হয়েছে ...আর কোনো তীর্থে...তাহলে তাই বরং...

পিসিমা বললেন—কেন? এখানে তোর অসুবিধা হচ্ছে না কি?

—তা হচ্ছে বৈ কি। জানো তো আমার স্বভাব...নিজের বাড়ীতেই থিতু হয়ে বেশীদিন থাকতে আমার হাঁফ ধরে...এ পরের বাড়ী। আমার আর ভালো লাগছে না পিসিমা...কেমন একঘেয়ে বোধ হচ্ছে। মনে হচ্ছে, যেন গারদে বন্দী হয়ে আছি! এঁদের নিয়ম মেনে, ব্যবস্থা মেনে...

বাধা দিয়ে পিসিমা বললেন—শোনো ছেলের কথা! চিরদিন হৈ-হৈ করে বেড়াবি! তা যাক, তা নয়...তবে, কি করে এসেছিস বাগানে? হ্যাঁরে, খোকাকে সত্যি ঠেলে জলে ফেলে দিয়েছিলি তুই?

যেন আকাশ থেকে পড়েছে, এমনি ভাবে অবনী বললে—তার মানে?

পিসিমা বললেন—ছেলেটা এসে ঠাকুরপোকে তাই বলেছে...পূর্ণিমাও হাসতে হাসতে তাই বললে। শুনে ঠাকুরপোর দুচোখ এত বড়-বড়—মহা দুশ্চিন্তা! আমাকে বললে, ছেলেটির মাথা তাহলে খারাপ তো... হুঁ! বলে, মাথা না সারলে কি করে ও-ছেলের সঙ্গে মেয়েটার বিয়ে দি!

অবনী হেসে উঠলো...বললে—তাই না কি? তাহলে খুব ভালো হয়েছে পিসিমা...মহাদায় থেকে আমি উদ্ধার পেয়ে গেছি!

এ-হাসি, এ-কথার অর্থ পিসিমা বুঝলেন না। তিনি বিরক্ত হলেন... তাঁর ভ্রূ হলো কুঞ্চিত। তিনি বললেন—কি রকম?

অবনী বললে—রকম আর কি! তুমি তো জানো, বিয়ের নামে আমার আতঙ্ক হয়...বিয়ে আমি করতে চাই না। তোমরা যে-চক্রান্ত করছিলে...

সত্যি পিসিমা, আমার ভয় হচ্ছিল···এখন তোমার স্থাওর মশায়ের কথা শুনে আমার ভয় গেল···আমি নিশ্চিন্ত হলুম।

পিসিমা বললেন—আজই বাগানে বসে বৌয়েতে-আমাতে কথা হচ্ছিল ···বৌ বলছিল, দুজনে যেমন ভাব···দুজনকে দুজনের মনে ধরেছে দিদি—এ বিয়ে দিতেই হবে। বৌ বলছিল, দু-তিন মাস আগে চমৎকার এক পাত্র পাওয়া গিয়েছিল···এখানকার কলেজে প্রোফেশর হয়ে এসেছে··· দিব্যি ছেলে—যেমন লেখাপড়ায়, তেমনি চেহারা আর তেমনি নানা গুণ! তা পাত্রটিকে ক'বার নেমন্তন্ন করে আনা হয়েছিল নাকি···পূর্ণিমার সঙ্গে ভাবসাবও বেশ···কিন্তু বিয়ের কথা শোনবামাত্র মেয়ে বেঁকে দাঁড়ালো··· বললে, না···ওর সঙ্গে বিয়ে দাও যদি তাহলে জন্মের মতো আমাকে হারাবে! এ-কথা শুনে মা-বাপের ভরসা হলো না।

—বটে! অবনী বললে—আমার সঙ্গে বিয়ের ঠিক করছো তোমরা·· পূর্ণিমা জানে?

—জানে না? খুব জানে। বসে বসে শোনে···আমরা তো লক্ষ্য করেছি। ও-কথা যখনি কয়েছি···দেখেছি, মেয়েরও তখন সেখানে কাজ পড়ে কত···নড়ে না···মুখেও কোনোদিন 'না' বলেনি—তাই আরো···

অবনী শুনলে···শুনে মনে হলো···

কিন্তু মনে যা হলো, জোর করে তা ঠেলে সরিয়ে সহজ কণ্ঠে অবনী বললে—ভালোই হয়েছে পিসিমা। মেয়ে তো আজ দেখেছে···তার ভাইকে আমি ঠেলে জলে ফেলে দিয়েছি—তাতে সেও বুঝেছে, আমার মাথায় ছিট আছে। এখন কিছুতে সে আর আমাকে বিয়ে করতে রাজী হবে না। অমন মেয়ে···বাপের টাকা-পয়সার জোর আছে···দায় নয় যে পাগল-ছাগলের ঘাড়ে তাকে চাপিয়ে দিতে হবে!

কথাটা বলে অবনী হো-হো করে হেসে উঠলো!

পিসিমা কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন—রাগে দুঃখে তাঁর মনের মধ্যে যা হচ্ছে, তা বলবার নয়।

দুজনেই চুপচাপ···হঠাৎ দরজার বাহিরে পর্দ্দাখানা দুলে উঠলো··সেই সঙ্গে যেন চুড়ির শব্দ—ঝিন্‌ঝিনিঝিন্!

—কে? বলে অবনী গেল দরজার কাছে এগিয়ে···পর্দ্দা সরালো···কেউ নেই! তবে স্পষ্ট মনে হলো, কে যেন ছিল···নিঃশব্দ পদসঞ্চারে সরে গিয়েছে।

ঘরে ফিরবে···পায়ে কি যেন ঠেকলো! নীচু হয়ে সেটা তুললো···দেখে, সোনার একটি সেকটী-পিন। চিনলো···এ-পিন পূর্ণিমার।

চকিত-চিন্তা···পিনটা হাতের মুঠিতে চেপে অবনী এলো পিসিমার কাছে···বললে—বড্ড ঘুম পেয়েছে পিসিমা···তুমিও শুতে যাও। আজ আবার তোমার একাদশী···ধকল বড় কম যায়নি তো।

—যাচ্ছি···তোমাকে আর মায়া দেখাতে হবে না। পিসিমার উপর কত মায়া, কত দরদ···তা আমার বেশ ভালোই জানা আছে। আমারো ছাই, মরণ হয় না! কি মার্কণ্ডব পের্মাই নিয়ে ভারতে এসেছি!

গজগজ করতে করতে পিসিমা বিদায় হলেন। দরজা বন্ধ করে অবনী এসে দাঁড়ালো ঘরের মাঝখানে···হাতের পিনটার পানে চেয়ে ভাবলো, যা মনে হচ্ছিল, তাই! পূর্ণিমার সব রহস্য এই পিনেই প্রকাশ পাচ্ছে! কিন্তু না···তা হয় না···হতে পারে না!

সাত

সে-রাত্রে অবনীর ভালো ঘুম হলো না! মনে চিন্তার তরঙ্গ···এখানে পূর্ণিমাকে কেন্দ্র করে এ কি গ্রন্থি-রচনা চলেছে! পূর্ণিমার কথা শুনে, তার হাবভাবভঙ্গী দেখে অবনীর ভয় হলো! বেচারী! মায়ের

আর তার পিসিমার কথা শুনে মনে মনে সে যদি এমন কল্পনা করে থাকে যে, অবনীর সঙ্গে···

ঠিক নয়! মেয়েদের মনের সঙ্গে তার কোনো পরিচয় নেই। বহু পরিবারের কিশোরী মেয়ের সঙ্গে যে তার মেলামেশা হয়নি, তা নয়···কিন্তু সে-সব মেলামেশায় সে শুধু হাসির তুফান তুলে চলাফেরা করেছে··· আজেবাজে নানা কথার উচ্ছ্বাস তুলে চলেছে···কোনো কিশোরীর হৃদয়-বৃত্তি নিয়ে চর্চ্চার যেমন অবসর ছিল না···তার প্রয়োজনও কখনো মনে জাগেনি! কিন্তু এখানে পূর্ণিমার সঙ্গে একান্ত আপনজন হয়ে···

উপায়? সদাশিবের মনে দ্বিধা জেগেছে, অবনীর মাথার ছিট আছে অর্থাৎ সুস্থ-মস্তিষ্কের মানুষ সে নয়···সেজন্য এ-বিবাহের প্রস্তাবে তাঁর আর তেমন···

এইটিকে ভিত্তি করেই যদি মুক্তি মেলে! সে ঠিক করলো, তাই হবে! তবু···এখানে আর থাকা নয়···কোনো রকমে এখান থেকে বিদায় নেওয়া! কিন্তু পিসিমা···

পিসিমার ধনুর্ভঙ্গ-পণ—পূর্ণিমার সঙ্গে তার বিবাহ না দিয়ে তিনি আর কোনো দিকে চাইবেন না! এখন···

এমনি নানা কথা ভাবতে ভাবতে কখন চিন্তাহারিণী নিদ্রা সদয় হয়ে তার চেতনাকে স্পর্শ দিয়ে অবলুপ্ত করে দিলে···

সকালে যখন ঘুম ভাঙলো, তখন বেলা হয়েছে···ঘরে রোদ এসে পড়েছে। অবনী উঠে পাশে বাথরুমে গেল এবং মুখহাত ধুয়ে ভব্য বেশে নীচে নামলো···এলো খাবার ঘরে। সেখানে টেবিল জুড়ে বসেছে পূর্ণিমা আর খোকা। পিসিমা এবং বিন্দুবাসিনীও সেখানে আছেন।

অবনীকে দেখে বিন্দুবাসিনী বললেন—এই যে বাবা, উঠেছো···চা-টা দিতে বলি ?

চা এলো, জলখাবার এলো···এবং খেতে খেতে নানা কথা···

বিন্দুবাসিনী বললেন—কোনো কষ্ট হয়নি তো···পথের ধকলে ?

—না, না। অবনী দিলে সংক্ষিপ্ত জবাব।

বিন্দুবাসিনী চাইলেন খোকার দিকে···তাকে উদ্দেশ করে বললেন—কি, খা···হাঁ করে অবনীদার দিকে চেয়ে আছিস যে।

মুখখানা বিকৃত করে খোকা বললে—আমাকে ঠেলে জলে ফেলে দেওয়া হয়েছিল···হুঁ···তার শোধ যদি আমি না নিই···

—চোপ্! বিন্দুবাসিনী দিলেন ধমক···বললেন—যদি ফেলে দিয়ে থাকে, বেশ করেছিল। যেমন পাজী বদ তুমি···

খোকা ড্যাবড্যাব করে তাকালো মায়ের দিকে···তারপর খাওয়ায় মনোনিবেশ।

খাওয়াদাওয়া চুকলে সকলে ঘর থেকে বেরুবে···বিন্দুবাসিনী বললেন খোকাকে—যাও···পড়বার ঘরে যাও···লেখাপড়া করা চাই।

খোকা বললে—মাষ্টার-মশায় কোথায় বেরিয়েছেন।

বিন্দুবাসিনী বললেন—না খেয়ে বেরিয়েছেন !

—হ্যাঁ। খোকা বললে—আমাকে বলে গেছেন, তাঁর কে আপনার লোক এসেছেন কাশীতে···তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে গেছেন। ফিরতে নটা বাজবে।

বিন্দুবাসিনী বললেন—তাহলেও তুমি গিয়ে পড়তে বসো। মাষ্টার-মশায় না এলে পড়বে না, তা চলবে না।

দু-চোখে আক্রোশভরা দৃষ্টি···খোকা নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল!

বিন্দুবাসিনী তখন পূর্ণিমাকে বললেন—তুই যা তো এখান থেকে··· অবনীর সঙ্গে আমাদের কথা আছে !

অবনীব বুকখানা ছাঁৎ করে উঠলো ! পূর্ণিমা বিনা-বাক্যে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

অবনী চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছিল···বিন্দুবাসিনী বললেন—বসো বাবা···তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।

অবনীকে বসতে হলো। বুঝলো, কি কথা।

বিন্দুবাসিনী বললেন—দিদির সঙ্গে আমার সেই কথাই হচ্ছে আজ কদিন···মানে, পূর্ণিমাকে তোমার কেমন লাগে ?

অবনী বিস্ময়ভরা দৃষ্টিতে তাকালো বিন্দুবাসিনীর দিকে···বললে—তার মানে ?

বিন্দুবাসিনী অপাঙ্গে পিসিমার দিকে একবার চাইলেন···পিসিমার সঙ্গে হলো তাঁর দৃষ্টি-বিনিময়।

পিসিমা বললেন—মানে, পূর্ণিমা দেখতে-শুনতে কেমন ?

—ভালো

—গুণ ?

অবনী বললে—ভালোই। দেখতে ভালো···ভালো লেখাপড়া জানে··· শান্ত নম্র বুদ্ধিমতী···সব দিকেই ভালো।

বিন্দুবাসিনী বললেন—ওকে তোমার পছন্দ হয় ?

—পছন্দ ! অবনী দিলে সংক্ষিপ্ত উত্তর···তার কণ্ঠে বিস্ময়।

বিন্দুবাসিনী বললেন—খুলেই তাহলে বলি, বাবা। মানে, মেয়ে ডাগর হয়েছে···বিয়ে দিতে হবে···মনের মতো পাত্র পাচ্ছি না। অনেক খুঁজেছি ···কোনো পাত্র মনে লাগেনি। তোমাকে বড্ড ভালো লেগেছে, বাবা··· জানা-শোনা···সুচেহারা সুস্বভাব···তাই তোমার হাতে ওকে দিতে চাই। আমাদের খুব ইচ্ছা, তোমার পিসিমারও ইচ্ছা।

একটা ঢোঁক গিলে অবনী বললে—কিন্তু জানেন তো, আমার মাথার ছিট আছে!

বিন্দুবাসিনী বললেন—যে এ-কথা বলে, তার মাথার ছিট আছে! ও-কথা নয়! তুমি বলো বাবা, মত করো···আমি মস্ত দায়ে উদ্ধার পাই তাহলে।

অবনী বললে—না ছোট পিসিমা···তা হয় না। আমি জানি, আমি মানুষ নই মোটে···ভয়ানক খেয়ালী আমার মন···কোনো-কিছুতে থিতু হতে পারি না! বিয়ে করতে ইচ্ছা নেই···তার কারণ, আমি জানি, আমি যাকে বিয়ে করবো, সে-মেয়ে যত ভালো হোক···তাকে সুখী করতে পারবো না। আমার হাতে তার দুর্গতি-দুঃখের অন্ত থাকবে না। পূর্ণিমা ভারী ভালো মেয়ে···তাকে আমি ভালোবাসি···বোনের মতো···নিজেকে জেনে শুনে পূর্ণিমার অনিষ্ট করবো, তা কিছুতে হতে পারে না!

পিসিমা ঝঙ্কার তুললেন—শোনো বাপু, আমার স্পষ্ট কথা। তুমি যদি এমন জেদ ধরে থাকো···আমাদের কথা না শোনো···সত্যি বলছি, তোমার কোনো কথায় আমি থাকবো না আর···আমার যেদিকে দুচোখ যায়, চলে যাবো! তুমি জানবে, তোমার পিসিমা নেই···মরে গেছে।

রাগে পিসিমার সর্বশরীর থরথর করে কাঁপছে···বিন্দুবাসিনীর দুচোখ এত বড়···অবনী বললে—আচ্ছা···শুনুন, আমি বিয়ের কথা কখনো ভেবে দেখিনি! হুট বলতেই অমনি···তাছাড়া আমার এখন মনের যে-অবস্থা··· আমার মনে হয়, আমার হাতে মেয়ে দেওয়া আর জলে মেয়ে ফেলে দেওয়া—সমান!

পিসিমা আবার তুললেন ঝঙ্কার—অবু···

তাঁর কথা শেষ হলো না···অবনী দু-হাত জোড় করে বললে—রাগ করবেন না আপনারা···আমাকে ভাবতে সময় দিন···এক মাস।

পিসিমা বললেন—এক মাস পরে যদি বলো, না…জেনো, আমি এই কাশীতেই গঙ্গার জলে ডুবে আত্মঘাতী হবো!

—আচ্ছা, আচ্ছা…তাই করো।

এ-কথা বলে অবনী এলো বেরিয়ে।

ঘর থেকে বেরিয়ে সে এলো পথে…আসতেই সামনে দেখে, একখানা খালি টঙ্গা চলেছে। টঙ্গাওয়ালাকে থামিয়ে টঙ্গায় বসে তাকে বললে অবনী—চলো।

—কোথায়?

অবনী বললে—চলো, অসি…দুর্গাবাড়ী।

টঙ্গা চললো। টঙ্গায় বসে অবনী…তার মাথায় যেন একরাশ মৌমাছি তুলেছে গুঞ্জন রব!

বেলা প্রায় এগারোটা পর্যন্ত উদ্দেশ্যহীন চক্র দিয়ে অবনী টঙ্গায় করে সিক্রার বাড়ীর ফটকে এসে নামলো। নেমে টঙ্গার ভাড়া চুকিয়ে বাড়ী ঢুকলো…ঢুকে সোজা দোতলায় নিজের ঘরে।

জামা খুলে চেয়ারে বসেছে…পূর্ণিমা এলো। পূর্ণিমা বললে—কোথায় যাওয়া হয়েছিল?

তার পানে চেয়ে দেখলো অবনী, পূর্ণিমার মুখে-চোখে কৌতুকের দীপ্তি …অবনী বললে—কাশী পারিক্রমা করে এলুম।

পূর্ণিমা বললে—হঠাৎ কাশীর উপর এত ভক্তি?

—ভক্তি নয়, পূর্ণিমা। অবনী দিলে জবাব।

—তবে?

অবনী বললে—মানে, তুমি জানো না…শোনোনি বোধ হয় যে, আমার মাথায় ছিট্ আছে…অর্থাৎ যাকে বলে, সুস্থ-মস্তিষ্কের মানুষ নই…কখন কি খেয়াল হবে, আগে থেকে জানা থাকে না! আছি, বেশ আছি…আবার

খেয়াল হলো যদি···বুঝেছো তো···নাহলে তোমার ভাইকে ঠেলে জলে ফেলে দেবো কেন ?

কথাটা বলে অবনী তাকালো পূর্ণিমার দিকে···পূর্ণিমার দৃষ্টিতে কি করুণা, না, কৌতুক, ভর্ৎসনা, না, নিরাশা···বোঝা গেল না ! তবে বুঝলো, সে দৃষ্টি সহজ সরল নয় ! যেন···মনে হলো, দুচোখ বাষ্পভারে আকুল !

পূর্ণিমা কোনো কথা বললে না···তেমনি তাকিয়ে রইলো অবনীর দিকে···নিঃশব্দে !

অবনী তার দিকেই চেয়ে আছে···যা ভেবেছে, তাই ! পূর্ণিমার চোখে বাষ্পোচ্ছ্বাসই !

অবনী নিজেকে সম্বরণ করতে পারলো না···বলে উঠলো—তু-তোমার চোখ ছলছলিয়ে এলো ! কেন, পূর্ণিমা ?

—বয়ে গেছে ! কেন···কেন চোখ ছলছল করবে ? বা রে ! বলতে বলতে কথাটা ভেঙ্গে পড়লো। মুখ ফিরিয়ে নিয়ে পূর্ণিমা সরে গেল···গেল একেবারে খড়খড়ির ধারে···এদিকে তাকালো না।

অবনী যেন কাঠ···দুমিনিটের জন্য···তারপর অবনী এলো পূর্ণিমার কাছে···ডাকলো—পূর্ণিমা···

পূর্ণিমা ফিরে তাকালো···তার দুচোখের পাতা জলে ভিজে উঠেছে ! অবনী ধরলো তার হাত···বললে—কাঁদছো !

ঝটকা দিয়ে নিজের হাত ছাড়িয়ে নিয়ে অন্য দিকে তাকিয়ে পূর্ণিমা বললে—হ্যাঁ···কাঁদছি ! আপনার গলা ধরে তাই আমি বলেছি কি না !

অবনী বুঝলো, ব্যাপার তুচ্ছ করার মতো নয় ! পূর্ণিমা কাঁদছে এবং কেন কাঁদছে···তা বুঝতেও বিলম্ব হলো না !

কিন্তু তা হবার নয় ! পূর্ণিমাকে স্পষ্ট বলে বোঝানো দরকার···অবনী বললে—শোনো···চেয়ে ছাখো আমার পানে।

পূর্ণিমা বললে—বলুন না, কি বলবেন। আমার কান দিয়ে কাঁদছি না তো!

অবনী বললে—শোনো…আমি বুঝেছি। কিন্তু তা হতে পারে না, পূর্ণিমা! মানে, আমার সেই বন্ধু…আমার চেয়ে সব দিক দিয়ে ভালো… তোমার যোগ্যও বটে। তোমাকে দেবী বলে জানে, ভালোবাসে, শ্রদ্ধা করে …তার সঙ্গে তোমার বিয়ে…

—যান…যা খুশী আপনি বলবেন…কেন…কেন…কেন বলুন তো?

বলতে বলতে পূর্ণিমা চকিত চরণ-ক্ষেপে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

অবনী হতভম্ব…প্রায় পাঁচ-সাত মিনিট! তারপর ধীর পায়ে সে নীচে নেমে গেল। নেমেই দেখে, কমপাউণ্ডের ওদিকে হিমাদ্রি…একা।

অবনী এলো হিমাদ্রির কাছে…ডাকলো—হিমাদ্রি…

—এই যে অবনী! অনেক কথা আছে।

—তার আগে শোনো…এ-বাড়ীতে পূর্ণিমার বিয়ের কথা হচ্ছে…আমি তোমার পরিচয় দিয়ে কথাটা তাহলে পাড়ি…কি বলো?

হিমাদ্রি এ-কথায় যে-চোখে তার পানে তাকালো…অবনীর তাক্ লাগলো!

হিমাদ্রি বললে—পূর্ণিমা দেবীর কথা বলছো!

—হ্যাঁ।

—না, না, না…ওঁকে আর আমি…মানে, কাল বাবতপুর থেকে ট্রেনে ফেরবার সময় ঘটনা যা ঘটেছে…অপূর্ব্ব…অলৌকিক…ছাট হ্যাজ চেঞ্জড্ এভরিথিং!

দুচোখে ভর্ৎসনার আগুন…অবনী বলে উঠলো—স্কাউণ্ড্রেল!

হিমাদ্রি বললে—শোনো সব কথা ভাই…জানো তো আমার মনের দুর্বলতা…

অবনী তুললো গর্জ্জন—আবার কাকে দেখেছো ?

—অপূর্ব্ব রূপসী ! দেবী যদি বলতে হয় তো এঁকে ! রাগ করো না, শোনো আগে ঘটনা…এ ম্যান্ ইজ বাট ক্রীচার অফ সার্কামষ্টান্সেস !

বড় একটা নিশ্বাস ফেলে অবনী বললে—তোমার জোড়া মানুষ দুনিয়ায় আর নেই…এ-কথা আমি জোর গলায় বলতে পারি ! তুমি…তুমি… নরাধম।

—রাগ করো না, অবনী। কতকালের বন্ধুত্ব আমাদের। শোনো, সব কথা বলি…শুনে যদি বলো, আমার অপরাধ হয়েছে…যে-শাস্তি দেবে, আমি মাথা পেতে নেবো।

—বলো…

এ-কথা বলে অবনী চারিদিকে তাকালো…তারপর বললে—চলো ঐ আতাগাছগুলোর ওদিকে পাথরের ঐ বেদীটাতে গিয়ে বসি…ওখানে বসে শুনবো তোমার আরব্য রজনীর নতুন কেচ্ছা !

দুজনে বসলো গিয়ে পাথরের বেদীতে এবং হিমাদ্রি সুরু করলো তার কাহিনী।

হিমাদ্রি বললে—ছাত্রকে নিয়ে ট্রেনের ফার্ষ্ট ক্লাশ কম্পার্টমেণ্টে উঠে বসলুম…দেখি কামরায় বেশ ভিড়। কামরায় আসছেন…ব্রজরাজ গোস্বামীজী। নাম শুনেছো ! প্লেন সাধু—চিমটে লোটাধারী সাধু নয়… সিল্কের গেরুয়া পরা…গায়ে গেরুয়া রঙের সিল্কের আলখাল্লা…মাথায় জটা নয়…বড় বড় চুল…চোখে সোনার চশমা…ফর্শা রঙ…নামজাদা পণ্ডিত মানুষ। জপতপ করেই দিন কাটান না' দেশের লোক যাতে প্রাদেশিক সঙ্কীর্ণতা ত্যাগ করে ঐক্যবদ্ধ ভারতীয় জাত বলে নিজেদের গড়ে তুলতে পারে…সেই শিক্ষা দেওয়া ওঁর ব্রত। পলিটিকাল সাধু বলতে পারো… তবে নো-পার্টি মানুষ…কংগ্রেস, কমিউনিষ্ট, ফরোয়ার্ড ব্লক, পি-এস-পি…

কোনো দলের তাঁবেদারী করেন না। কামরায় তিনি ছিলেন···তাঁর পাঁচ-সাতজন শিষ্যকর্ম্মী···তিনি আসছিলেন দিল্লী হয়ে লাক্ষ্ণৌ হয়ে···কাশীতে। কাশীতেই তাঁর আশ্রম···দশাশ্বমেধে। হ্যাঁ, ওঁদের সঙ্গে ছিলেন চিন্ময়ী দেবী ···গোস্বামীজীর মেয়ে! বয়স চব্বিশ-পঁচিশ বছর···কুমারী···এলাহাবাদ-ইউনিভার্সিটির গ্রাজুয়েট···বাপের সঙ্গে কাজ করেন। অপূর্ব্ব সুন্দরী ···মুখে-চোখে বুদ্ধির তেমনি দীপ্তি!

হেসে অবনী বললে—এ্যাণ্ড ইউ ফেল্ ইন লভ্!

হিমাদ্রি বললে—জানো তো, লভ্ এ্যাট ফার্ষ্ট সাইট!

—আরে তোমার ফার্ষ্ট সাইট যে চলেছে রেকারিং ডেসিমেলে! গিদ্ধড়! এমনি করে প্রেমে পড়া···নাঃ, তোমার সম্বন্ধে পাগলা-গারদের ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য! তা তুমি প্রেমে পড়েছো···কিন্তু তিনি তো ব্রহ্মচারিণী···সুতরাং ফাউণ্টেন-এর রিভার-এর সঙ্গে মিঙ্গল্ড্ হবার চান্স!

হিমাদ্রি বললে—ভালোবেসে ফেলি যখন, তখন ও-চিন্তা মনের কোণেও জাগে না, ভাই।

অবনী হাসলো···বললে—তুমি একটি রিসার্চ্চের বস্তু, হিমাদ্রি! তারপর ···ও···আজ সকালে সেখানে বুঝি···

হিমাদ্রি বললে—হ্যাঁ। গোস্বামীজীর সঙ্গে আর চিন্ময়ী দেবীর সঙ্গে ট্রেনে বেশ আলাপ হলো। কাশীতে থাকি শুনে ওঁরা দুজনেই বললেন, সকালে আসবেন আমাদের আশ্রমে—শিবালায়। বললেন, আনন্দধাম··· যাকে জিজ্ঞাসা করবেন···সেই বলে দেবে কোথায় আমাদের আনন্দধাম।

—তাই গিয়েছিলে? ছাত্রকে না পড়িয়ে···

—বোঝো তো···ও-ছেলেকে পড়ানো, না-পড়ানো···দুই সমান। তাহলেও আমি কর্ত্তার কাছ থেকে রাত্রেই ছুটি চেয়ে নিয়েছিলুম···বলেছিলুম,

আমার এক আত্মীয়ের সঙ্গে দেখা হলো…কাল সকালে তিনি যেতে বলেছেন …খুব বেশী দরকার।

—মিথ্যার আশ্রয়! তা যাক…তারপর আনন্দধামে প্রেমচর্চ্চা হলো?

জিভ্ কেটে দুচোখ কপালে তুলে হিমাদ্রি বললে—পাগল হয়েছো! সকালে চিন্ময়ী দেবী গান গাইলেন দিব্যি কালোয়াতী ঢংয়ে। এবং আশ্চর্য্য হবে, রবীন্দ্রনাথের গান গাইলেন—

সত্য মঙ্গল প্রেমময় তুমি
ধ্রুবজ্যোতি তুমি অন্ধকারে!

অবনী বললে—তারপর?

হিমাদ্রি বললে—গান হলে উনি বাণী দিলেন…ঐক্যের বাণী…বাঙালী বিহারী পাঞ্জাবী উড়িয়া আলাদা-আলাদা নয়…সকলে ভারতবাসী। বাণীর পর নিজের লেখা গান গাইলেন। সে-গানটা…আহা…সব কথা মনে নেই —তবে গোড়ার লাইন হলো—

মিল্ যা মিল্ যা হো ভারতবাসী…
আমি বাঙ্গালী, তুমি বিহারী…
তুমি উড়িয়া, তুমি পাঞ্জাবি—নহি নহি কভি নহি
বলো, বলো, হৃদয়োচ্ছ্বাসি……

তারপর কি, মনে নেই।

হেসে অবনী বললে—গানের কথাতেই উনি সব মিলিয়ে মিশিয়ে খাশা খিচুড়ী পাকিয়েছেন, দেখছি!…তারপর?

হিমাদ্রি বললে—তারপর প্রাতরাশ…ব্রেকফাষ্ট! তা খাওয়ার বাছবিচার নেই…চা, টোষ্ট, ডিম…ফল। আশ্রমে মুর্গী চরছে দেখলুম…পৌলট্রি ফার্ম আছে…বহুৎ দাসী-চাকর…সকলের গেরুয়া উর্দ্দি…চাকরদের কোমরে বেল্ট…দাসীদের বুকে ব্যাজ—'সেবিকা' বলে।

অবনী বললে—খাশা ব্যাপার তো···দেখবার মতো!

হিমাদ্রি এ-কথা কানে তুললো না। সে বললে—খাওয়ার পর আমাকে নিয়ে ঘুরে বাগান দেখালেন। বাগানের মধ্যে একটি মন্দির আছে···মন্দিরে ভারতমাতার মূর্ত্তি। চিন্ময়ী দেবীকে ঐ একটু সময়েই যা দেখলুম আর বুঝলুম, দেশের নামে অগ্নিময়ী! দেশের সব জাতের সব মুল্লুকের মানুষের মনে যত অন্ধ সংস্কার আছে, সঙ্কীর্ণতার জঞ্জাল আছে···সে-সব জালিয়ে দেশের সব মানুষের মনকে খাঁটি সোনা বানিয়ে তুলতে চান।

বাধা দিয়ে অবনী বললে হেসে—সোনার প্রকাণ্ড একটি তাল··· বলো!

এ-কথাও হিমাদ্রির কানে গেল না···হিমাদ্রি বললে—তিনি চান একজন সঙ্গী···সহকর্ম্মী···পুরুষ সহকর্ম্মী···তার বয়স হবে তরুণ···তাহলে তিনি শক্তি পাবেন।

—ও! অবনী বললে—তোমাকেই বুঝি তিনি সিলেক্ট করেছেন?

—তা নয়। হিমাদ্রি দিলে জবাব···হিমাদ্রি বললে—গোস্বামীজীর শিষ্য বড় অল্প নয় দেখলুম···প্রায় ত্রিশজন হবে। বয়স তাদেব বিশ থেকে চল্লিশ-বিয়াল্লিশ পর্য্যন্ত···স্বামীজী নানা জায়গায় ঘুরে তাঁর এ-মন্ত্র প্রচার করছেন···উত্তর-পশ্চিম, বেহার, পাঞ্জাব, উড়িষ্যা···এসব জায়গায় বহু শিষ্য পেয়েছেন···বাঙালী শিষ্য মোটে দুটি। স্বামীজী বলছিলেন, বাঙালীর মনে দ্বিধা-সংশয় বড় বেশী···তারা সব-কিছুর মধ্যে খোঁজে গূঢ় তাৎপর্য্য। বাঙালীর সম্বন্ধে স্বামীজীর মনে গভীর হতাশা! উনি বল্লেন, বাঙালী সব-কিছুর মধ্যে লাভ-লোকসানের অঙ্ক খতিয়ে দেখতে চায়!

হেসে অবনী বললে—তার কারণ, বাঙালী বহুৎ কিছু শিখেছে! তা যাক···তুমি তাহলে আশ্রমে যোগ দিচ্ছ?

হিমাদ্রি বললে—মহান আদর্শ! তাছাড়া ভারত গভর্ণমেণ্ট স্বামীজীকে

সাহায্য করতে প্রস্তুত উইথ মনি, মেন এ্যাণ্ড আদার রিশোর্সেস···যা তাঁর প্রয়োজন হবে।

অবনী বললে—তাহলে তুমি···তা ভালো! মহান আদর্শ··তার উপর মহান্··কি বলবো? মহতী রূপসী তরুণী!

হিমাদ্রির মাথা ঝনঝন করে উঠলো—কি যে বলো! তা নয়···তবে হঁ্যা, ওঁর সঙ্গে থেকে কাজ করার স্থযোগ—উনি চান শক্তি! যদি আমি··· কি বলো?

অবনী বললে—আমি বলি, ও আর দ্বিধা নয়···বিলম্ব নয়—শুভস্য শীঘ্রং···খাওয়া-পরা আর থাকবার আস্তানা মিলবে! তার উপর ওঁর সঙ্গী হয়ে! এখানে এ দুষ্টু গোরু তাড়িয়ে কোনো লাভ নেই। তামাসা ক'ছি না···লেগে যাও! তোমার প্রেমের সিদ্ধিলাভ এইখানেই হয়ে যাবে! মোদ্দা, আমি খুব বেঁচে গিয়েছি!

হিমাদ্রি বললে—কিসে?

অবনী বললে—পূর্ণিমা দেবীকে তোমার হৃদয়ের বেদনা, হৃদয়ের আশা-ভালোবাসার কথা বলেছি···ভাগ্যে তোমার নামটা করিনি! নামটা করিনি তার কারণ, তোমাকে তো চিনি···সেই বনশ্রী থেকে নিত্য তোমার হৃদয়ের যে-সঘন পরিবর্ত্তন দেখছি···ভেবেছিলুম, আই উড সাউণ্ড ইউ জাষ্ট নাউ এ্যাণ্ড দেন···তা মহাদায়ে খুব রক্ষা পেয়েছি আমি।

হিমাদ্রি বললে—না ভাই, পূর্ণিমা দেবী নয়। রূপসী, স্বীকার করি··· দেবী···তাও স্বীকার করি! কিন্তু চিন্ময়ী দেবীর সঙ্গে তুলনা করলে তা ভাই স্পষ্ট বলবো, চিন্ময়ী দেবী যদি হন লক্ষ্মী দেবী··পূর্ণিমা দেবী তাঁর পাশে···

হেসে অবনী বললে—মাকাল ষষ্ঠী···না, মনসা দেবী?

আট

দু'দিনের মধ্যে সদাশিবকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে তাঁর অনুমতি এবং নিজের পাওনা-গণ্ডা চুকিয়ে নিয়ে হিমাদ্রি এ-বাড়ী ত্যাগ করে শিবালায় আনন্দধামে গিয়ে আস্তানা পাতলো।

সেখানে নূতন জীবন! প্রথম দিন মোহ-আবেশে এত ভালো লাগলো··· হিমাদ্রি ভাবলো, এতদিনে জীবন তার ধন্য হলো!

চিন্ময়ী দেবী তাকে নিয়ে ব্যস্ত···নানা কথা, নানা প্ল্যান নিয়ে আলোচনা।

গোস্বামীজীর কাছে চিন্ময়ী দেবী বললে—ইনি ভারী খাঁটী মানুষ··· আমাদের কাজের ধারা বুঝেছেন···বুঝে কায়মনে এ-কাজ করবেন বলে আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন। বাঙালী চাইছিলুম···এমনি মনের বাঙালী ···আজ আমাদের সে-আশা পূর্ণ হলো।

গোস্বামীজী বললেন—ওঁকে সব কথা বুঝিয়ে তৈরী করে তোলো··· সামনের হপ্তায় ওঁকে পাঠাবো বাঙলা দেশে। কলকাতায় আমাদের যে-শাখা খোলবার কথা আছে···ওঁকে সেই শাখার চার্জে রাখতে চাই।

চিন্ময়ী দেবী বললে—আমারো তাই ইচ্ছা।

হিমাদ্রির ট্রেনিং সুরু হলো। এক গাদা পুস্তিকা দিয়ে চিন্ময়ী দেবী বললে হিমাদ্রিকে—এগুলো ভালো করে পড়ে আমাদের কাজের ধারা কি ভাবে চলবে···পয়েন্টস নোট করুন। তারপর কাজ।

হিমাদ্রি যেন অথৈ জলে পড়লো! যা ভেবেছিল···এখানে এসে দেখে, তার কোনো আশা নেই! চিন্ময়ী দেবী যে-মূর্ত্তিতে তাকে বিভ্রান্ত করেছিল···চকিতে সে-মূর্ত্তি কোথায় যেন নিরুদ্দেশ হয়েছে! এখন এ-মূর্ত্তি···

টীচারের মূর্ত্তি! তার সঙ্গে অন্য কোনো কথা নয়···শুধু এই কাজের ধারা নিয়ে আলোচনা এবং শিক্ষালাভ।

উপায় নেই! হিমাদ্রি ভাবলো, কাজে খুশী করতে পারলে হৃদয়ের বাসনা জানানো কঠিন হবে না হয়তো এবং তখন চিন্ময়ী দেবী···

সাতদিন পরে হিমাদ্রিকে কলকাতায় পাঠানো হলো···সেখানকার কর্ম্মক্ষেত্র চালাবার জন্য যে-অফিস খোলা হয়েছে বালিগঞ্জে···সেইখানে!

হিমাদ্রির জন্য অবনীর আর এতটুকু মাথাব্যথা নেই···এখন মাথাব্যথা নিজের জন্য! পূর্ণিমাব সম্বন্ধে যা বুঝেছে···তাতে তার মনের মধ্যে চিরদিনকার যে হালকা মানুষটি জীবন বা ভবিষ্যতের চিন্তা-দায়িত্ব সম্বন্ধে নির্লিপ্ত ছিল—সে-মানুষটি রীতিমত বিচলিত হয়ে উঠেছে!

যতখানি পাবে অবনী এখন বাহিরে বাহিরে থাকে···বাড়ীতে ঢোকবার সময় তার বুকখানা দুলতে থাকে!

পূর্ণিমার সঙ্গে দেখা হয়। পূর্ণিমা দূরে দূরে থাকে না···অবনীর কাছে যতক্ষণ পারে, থাকে—অন্য কথা হয় না···অবনীকে পেলেই সে বসে বেহালা নিয়ে···আবদার ধরে, এ-গানটা আজ শিখিয়ে দিতে হবে···সেই সুরটা তেমন রপ্ত হচ্ছে না! অবনী বোঝে···পূর্ণিমার এ শুধু সঙ্গ-সুখ উপভোগ করা! সে-ও সতর্ক হয়ে সে-সব পুরোনো কথা পাড়ে না···বেহালা নিয়ে বসে এবং পূর্ণিমার সঙ্গে একাগ্র মনে সুরচর্চ্চা করে।

কিন্তু এমন করে দিনের পর দিন কাটানো যায় না···বিশেষ যেখানে পূর্ণিমার মনের পরিচয় তার অগোচর নয়! পিসিমাকে বলে—কাশীবাস কতকাল চলবে আরো? অন্য তীর্থগুলো···

পিসিমা বললেন—কেন, কাশীতে বেশ আছি তো। তোমার কি রাজকার্য্যের ক্ষতি হচ্ছে এখানে?

অবনী বলে—তা নয়···তবে হাজার হোক কুটুমবাড়ী!

—কিসের কুটুমবাড়ী! তোমার এমন বোধ হয় কেন, বুঝি না। এখানে তোমাকে কুটুম বলে কেউ তো দেখে না।

অবশেষে একদিন মরিয়া হয়ে অবনী বললে—যে-আশা তুমি করেছিলে পিসিমা···এঁদের পূর্ণিমার সঙ্গে আমাকে বিয়ের বাঁধনে বাঁধবে···সে-আশা যখন নেই···

পিসিমা ফোঁস করে উঠলেন—কে তোমাকে বলেছে···তার জন্য এখানে আমি আছি!

অবনী বললে—তোমার ন্যাওর স্পষ্টই বলেছেন, আমার মাথার ছিট আছে···পাগল-ছাগলের সঙ্গে কেউ তার মেয়ের বিয়ে দেয় না!

পিসিমা এ-কথার জবাব দেন না···সরে যান।

অবনী তখন চিঠি লিখলো কলকাতায় গঙ্গাপদকে···লিখলো—কলকাতায় খুব জরুরি কাজ···এমনি খবর জানিয়ে অবনীকে যেন চটপট কলকাতায় ফেরবার কথা লিখে পত্র দেয়। কি জরুরি কাজ···সে সম্বন্ধে খশড়া একটা চিঠিও অবনী মুসাবিদা করে পাঠালো গঙ্গাপদকে। এবং তার উত্তরে গঙ্গাপদর চিঠি এলো। গঙ্গাপদ লিখেছে···পিসিমাকে লিখেছে···অবনীর নির্দ্দেশমতো। গঙ্গাপদ লিখেছে—

এখানে কতকগুলো গোলযোগ বেধেছে···দু-চারটে মামলা-মকর্দ্দমা করতে হবে, পিসিমা—সেজন্য অবনীর অবিলম্বে এখানে আসা চাই। না হলে ইত্যাদি।

এই চিঠি দেখিয়ে অবনী বললে পিসিমাকে—দেখেছো চিঠি··· এখন?

পিসিমা বললেন—তুমি যাও···আমি যাবো না। আমি এখানে ভালো আছি···রোজ গঙ্গাস্নান···তারপর মা অন্নপূর্ণা, বাবা বিশ্বনাথ দর্শন···

এইখানেই যদি দেহ রাখতে পারি! মিথ্যা আর মায়ায় জড়িয়ে সেখানে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকা কেন?

অবনী বললে—কাজ চুকলে আমাকে আবার আসতে হবে না তো?

—তোমার মর্জ্জি!

অবনী যাবার জন্য তৈরী হলো…এবং যাবার সময় সদাশিব, বিন্দুবাসিনীকে প্রণাম করলে সদাশিব গম্ভীর হয়ে তার পানে শুধু চেয়ে রইলেন। বিন্দুবাসিনীর দু চোখ ছলছলিয়ে এলো। তিনি বললেন—আবার এসো বাবা কাজ চুকলে।

পূর্ণিমার সঙ্গে দেখা হলো। পূর্ণিমা কোথায় ছিল…তার পায়ের কাছে ঢিপ করে প্রণাম করতেই অবনী তার হাত ধরে তুললো…বললে—আসি পূর্ণিমা ভাই!

পূর্ণিমা কোনো জবাব দিলে না…হাত ছাড়িয়ে নিয়ে সরে গেল। অবনী গিয়ে মোটরে বসলো…মোটর চললো ক্যাণ্টনমেণ্ট ষ্টেশনের দিকে।

তৃতীয় পর্ব্ব

এক

কলকাতায় নিজের আস্তানায় ফিবে অবনী স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলো! কিন্তু একটা দিন মাত্র…

দ্বিতীয় দিনে বর্গীব আক্রমণেব মতো এসে উদয় হলো তার এক মাসতুতো ভাই…মিহিব আর মিহিরের বোন গৌরী। তাদের দেখে অবনী চমকে উঠলো।

মিহির বললে—জানো অবুদা, মা-বাবা মারা যাওয়া ইস্তক বাড়ীতে আর ভালো লাগছিল না…একটা কোনো কাজ করা চাই। দেশে…জানো তো, নাট্যকলা নিয়ে ছিলুম দুজনে…তা সেখানে এ-কলার চর্চ্চা…বেনাবনে

মুক্তা ছড়ানো! তার উপর গৌরী গান যা গায়…খাশা! ওস্তাদ রেখে গান শিখেছে…বাবার সখ ছিল…তা সব রকমের গান ও রপ্ত করেছে—ধ্রুপদ-খেয়াল বলো, আধুনিকসঙ্গীত, রবীন্দ্রসঙ্গীত বলো…খাশা গায়। শুনবে?

অবনী বললে—এখনি? তুদিন জিবো··

—জিরুবো কি! উটে চড়ে আফ্রিকার মরুভূমি পার হয়ে আসছি না তো! জিরুবার দরকার? হুঁঃ…এলাহাবাদ থেকে কলকাতা…এ কতটুকুন …এসেছি রিজার্ভ বার্থে…তুমি বলো জিরুতে!

মিহির ডাকলো—গৌরী…

পাশের ঘরটা তাদের ভাইবোনকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে…সে-ঘর থেকে গৌরী দিলে সাড়া—যাই।

এবং গৌরী এলো…স্নান করে বেশেভূষায় খাশা সাজিয়ে তুলেছে নিজেকে। মেয়েটি দেখতে ভালো…পশ্চিমী কেতায় তুচোখের কোণে সরু কালো কাজলরেখা টানার জন্য মুখখানি বেশ মিষ্টি দেখাচ্ছে · ডাগর টানা তুটি চোখ…স্বচ্ছ, সহাস দৃষ্টি সে তুটি চোখে।

মিহির বললে—অবুদাকে একটা করে গান শুনিয়ে দে তো!

গৌরী বললে—এখনি! না, না…গান শোনাবো সন্ধ্যার সময়।

অবনী বললে—সেই ভালো।

মিহির বললে—এত লটবহর এনেছি…দেখে তোমার তাক লেগে গেছে হয়তো! তা ঐ বড় কাঠের বাক্সটা…ওতে আছে গৌরীর গিটার আর বেহালা…ও তুটোয় ওর হাত বেশ পাকা। একটা ডালসেটিনা আছে… ওটা বাবার আমোলের—হ্যারল্ড কোম্পানি ছিল কলকাতায়…তাদের ওখান থেকে কেনা। অতকালের যন্ত্র…তবু এখনো আছে কেমন!

'অবনী বললে—তা বেশ। কিন্তু হঠাৎ এসব নিয়ে কলকাতায়?

মিহির বললে—কি জানো! এলাহাবাদে আমার ড্রামাটিক ক্লাবের খুব নাম। এত ভালো প্লে আমাদের যে দিল্লীতে পর্য্যন্ত নিমন্ত্রণ পেয়ে গিয়েছি···সেখানে প্লে করেছি···বিফোর দী রুলার্স—তাঁরা দেখে বহুৎ তারিফ করেছেন!

মিহিরের কণ্ঠে যে-কাহিনীর স্রোত বয়ে চললো···সে-স্রোত আর থামতে চায় না!

ক্লাবের বহু কীর্ত্তি-কথার পর মিহির বললে—জানো, আমি এ-ক্লাবের ড্রামাটিক ডাইরেক্টর। অভিনয়ে···সকলে বলে, আমার একটা আশ্চর্য্য জ্ঞান আছে। তাই ক মাস থেকে দুজনে ভাবছি, এলাহাবাদে পড়ে পচে মরা কেন···আমরা একবার দাঁড়াবো জগতের সামনে···আমাদের কী ট্যালেণ্ট, জগৎকে দেখাবো।

অবনী সবিস্ময়ে তাকিয়ে আছে মিহিরের দিকে···গৌরী লক্ষ্য করলো ···সে বললে—ওসব কথা রেখে আসল কথাটা বলো না, দাদা।

—হ্যাঁ, বলি।

মিহির যা বললে, তার মর্ম্ম—মিহির আর গৌরী দুজনে চায় সিনেমায় নামতে। ওখান থেকে বোম্বাইয়ে যেতে পারতো···কিন্তু আগে বোম্বাই নয় ···আগে বাঙলা ছবিতে নেমে খ্যাতি চায়···তাই কলকাতায় এসেছে। এখানে কোনো কোম্পানিতে ঢুকে মিহির নামতে চায় হীরোর পার্ট নিয়ে··· আর গৌরী আপাততঃ প্লে ব্যাক-এ গান দেবে···তারপর তারো এ্যামবিশন···টু বী এ ফিল্মষ্টার!

শুনে অবনী চমকে উঠলো! অবনী বললে—ফিল্মে শেষে!

মিহির বললে—কেন···না-নামবার হেতু?

অবনী বললে—মানে···

কিন্তু ঐটুকু বলেই তাকে থামতে হলো! মানে কি, বলা হলো না···

মনে হলো, মানে…নেই। বড় ঘরের এত ছেলেমেয়ে যখন ফিল্মে নেমে গৌরব প্রতিষ্ঠা এবং প্রচুর অর্থ রোজগার করছেন…আর্টের লীলাক্ষেত্র… সেখানে নামায় কোনো বাধা থাকতে পারে না!

অবনী বললে—এখানে কোনো ফিল্ম-কোম্পানির সঙ্গে জানাশুনা আছে?

মিহির বললে—ঐ যে জাইগান্টিক ফিল্ম কোম্পানি…ওদের একজন ডাইরেক্টর সেবারে এলাহাবাদে গিয়েছিলেন…ওঁর কি ছবি রিলিজ হয়েছিল…তার প্রথম ওপনিং শোতে ওভেশন নেবার জন্য। তাঁর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল…আমার বাড়ীতে তাঁকে খাতির করে নিয়ে গিয়ে তিনদিন রেখেছিলুম। তখন আমাদের প্রেব রিভিউর কাটিংস পড়েছিলেন…গৌরীর গান শুনেছিলেন…বলেছিলেন, এমন ট্যালেণ্ট…ফিল্মে নামেন না কেন! বলেছিলেন, নিজে একখানা ছবি তৈরী করুন…বেশী নয়…বিশ-পঁচিশ হাজার খরচ করবেন…বাকি টাকা…তা লাখ খানেক দরকার হয় যদি… ডিষ্ট্রিবিউটর দেবে…ওঁর জানা ডিষ্ট্রিবিউটর আছে…উনি ব্যবস্থা করে দিতে পারবেন। তাই…এখানে আসা।

অবনী বললে—ডাইরেক্টরের নাম?

মিহির বললে—গোলাপ বোস…তাঁকে চিঠি লিখে জানিয়েছি… কলকাতায় আসছি।

অবনী বললে—গোলাপ বোস! আরে ব্যস…তাঁর নাম আছে… শুনেছি, ছবির পর ছবি করে নিজে হচ্ছে লাখোপতি…কিন্তু মালিকরা হচ্ছে ফ্ল্যাট!

মিহির আরো বললে—জানো…নাম! জগতে এসে যদি নাম রেখে না যেতে পারলুম, তাহলে…সেই ছেলেবেলায় স্কুলের বইয়ে পড়েছিলুম— বৃথা জন্ম এ-সংসারে!

অবনী বললে—তা ফিল্মে নামলেই নাম হবে, এমন কি কথা আছে। ফিল্মে তো দেশের একশো-জনের মধ্যে আশিজন নামছে…কজনের নাম হচ্ছে, বলো?

গৌরী বলে উঠলো—বোঝো না অবুদা…ফিল্মে নাম করতে হলে ট্যাকটিক্স্ চাই…সেই সঙ্গে চেহারা…তা দাদার চেহারা…হীরো সাজবার মতো! ধরো, 'চন্দ্রশেখর' ছবি তোলা হবে…তাতে যদি দাদা 'প্রতাপ' সাজে…তাহলে চেহারাতে মাত করে দেবে…ভোঁদা প্রতাপ দেখবে না কেউ।

—কিন্তু চন্দ্রশেখর ছবি সেদিন হয়ে গেছে! আবার…

বাধা দিয়ে মিহির বললে—তাব জন্য বাধা নেই! বঙ্কিমবাবুর বইগুলোর নো কপিরাইট…যে খুশী, যখন খুশী ও-গল্প নিয়ে ছবি তুলতে পারে!

অবনী বললে—তা পারে! কেউ তুলছে বুঝি? তারা তোমাকে নামাতে চায় ঐ প্রতাপের পার্টে?

হেসে মিহব বললে—আছে…আছে…দেয়ার্স এ সিক্রেট!

—কি সে-সিক্রেট?

মিহির বললে—ঐ তো বললুম! পনেরো হাজার টাকা আমি যদি বার করি, তাহলে ছবিতে লাখ টাকা দেড়-লাখ টাকা খরচ হলেও বাকি সব টাকা দেবে ডিষ্ট্রিবিউটর।

অবনী বললে—ফিল্ম-ল্যাণ্ডের খবর জানি না…তবে শুনেছি, ডিষ্ট্রিবিউটররা এখন ভালো লেখকের লেখা ভালো গল্প চায় না। তারা বলে, ধারাপাত তোলো…তাতে যদি ষ্টার-মার্কা হীরো-হীরোইন সাজিয়ে দুজনকে পালটা-পালটি করে নামতা আউড়ে নাও…কেল্লা মার দিস্…সে-ছবির জন্য খরচ করবে দেড়লাখ, দুলাখ! কিন্তু তোমরা তো ষ্টার নও… তোমার নামে অত টাকা দেবে কেন?

গৌরী বললে—আমি বলছি দাদাকে, আমি প্লে-ব্যাকে গান গাইবো

কেন? আমিও নামতে চাই। বিজ্ঞাপন দেবে—নিউ ষ্টার ফাইণ্ড! তার পর আমার চেহারা—ওয়েল, আই ষ্ট্যাণ্ড নো লোয়ার গ্রাউণ্ড দ্যান বিউটি ষ্টার্স অফ দী ডে! দাদা বলে, না···ভাইবোনে একসঙ্গে নেমে লাভ নেই। দুজনে তো হীরো-হীরোইন হতে পারবো না···ইট উড বী মোষ্ট ডেলিকেট ইন্ পোজিশন!

কথা শুনে অবনীর তাক লেগে গেছে! দুজনে যেন অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ! অবনী ভাবলো, দুনিয়াটা এ হলো কি? ফিল্মের নামে এমন পাগল! রবীন্দ্রনাথের সেই গানটা মনে পড়লো—ওরে ভাই, আগুন লেগেছে বনে বনে—ডালে ডালে লতায় পাতায় রে! মনে হলো, ও-গানের লাইনগুলো বদলে যদি লেখা যায়—ফিল্মের আগুন লেগেছে ঘরে ঘরে···খ্যাঁদা বোঁচার পুঁটি ভুঁদি ফিল্মে নামতে আসে ঘর ছেড়ে থরে-থরে!

কিন্তু একথা এদের কাছে প্রকাশ করা চলে না! অবনী বললে—তোমাদের এ-ডাইরেক্টরের সঙ্গে দেখা হচ্ছে কবে?

মিহির বললে—তোমার এখানে কাল সকালে আসতে বলেছি। বলেছি, এখানে আমরা আছি। তোমার বসবার ঘরটা কাল সকালে পারবে তো ছেড়ে দিতে···say, ঘণ্টা দুইয়ের জন্য?

—তা পারবো না কেন?

—তুমি থাকবে সে-সময়? মিহির করলো প্রশ্ন।

অবনী বললে—আমার থাকার প্রয়োজন?

মিহির বললে—তুমি খুব ইনটারেষ্টেড হবে, অবুদা। মানে···ধরো, তুমি আমি দুজনে যদি ফাইনান্স করি···টাকা তুমি দিলে সাড়ে সাত হাজার আমি দিলুম সাড়ে সাত হাজার···তারপর বাকি যা পড়বে, ডিষ্ট্রিবিউটর আছে···

অবনী হাসলো। হেসে সে বললে—না ভাই, আমার সামান্য পুঁজি

…ও-ব্যবসার কিছু বুঝি না…ওতে সেটুকু দিলে যদি যায়, তাহলে তারপর ?

উত্তেজিত কণ্ঠে মিহির বললে—যাবে না…যেতে পারে না। এ খুব মজার কারবার। আমি বেশ ভালো করে ষ্টাডি করেছি…হিসাব কষে দেখিয়ে দেবো, গেণ্ডিফাই যদি কেউ না করে…তাহলে এ-ব্যবসার মার নেই…দুধের ব্যবসার চেয়েও ভালো। ছবি ফ্লপ করে যদি…বাঙলা দেশের সর্ব্বত্র, তাছাড়া বাঙলার বাইরে যেখানে যেখানে বাঙালী আছে…এক হপ্তা করে ছবি ঘুরে আসে যদি, তোমার খরচের সব টাকা উইথ্ এনফ্ ইন্টারেষ্ট উড কাম টু ইয়োর পকেটস্! আমার কাছে খাতায় টোকা সব হিসাব। দুবছরের মধ্যে যত বাঙলা ছবি হয়েছে…কোন্‌টাতে কত টাকা খরচ হয়েছে …আর কি রিটার্ণ এসেছে…সব স্পষ্ট লেখা দেখবে।

অবনী বললে—না, এখন আমি বেরুবো…খাতা দেখবার সময় হবে না। পরে দেখা যাবে।

—হ্যাঁ। মিহির বললে—দেখাবো…ছাড়বো না। আমি বলি, আমরা নিজেরা হবো প্রোডিউসার্স। একটা কিছু কর চাই তো। তুমিও বসে বসে বাড়ী ভাড়ার টাকা আদায় করছো…আরে, তাতে টাকা বাড়বে কেন? ব্যবসা…ব্যবসা করা চাই। জানো তো, বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মী এবং এ যুগে ফিল্মের ব্যবসার মতো ব্যবসা নেই! নাচ-গান…আমোদ-প্রমোদ…যার মানে, বাগান-পিকনিক করতে করতে ব্যবসা…এর তুলনা নেই, অবুদা!

দুই

সন্ধ্যার সময় অবনী বেরুবে…কোন গানের আসরে তার নিমন্ত্রণ… একখানা ট্যাক্সি করে মিহির আর গৌরী এসে সদরে নামলো…নেমেই মিহিরের চীৎকার—অবুদা…অবুদা…

অবনী সিঁড়ি বয়ে নেমে আসছে দোতলা থেকে·· সাড়া দিলে—কেন ?

সাড়া দেবার সঙ্গে সঙ্গে সিঁড়ির নীচে দুজনে দেখা···মিহির বললে—ওদের ষ্টুডিয়ো থেকে ফিরছি। একটা কাজ আছে···তোমার হেল্প চাই।

—কি কাজ ? শান্ত সহজ কণ্ঠে অবনীর প্রশ্ন।

মিহির বললে—কাল সকালে তোমার এখানে রীতিমত পার্টি !

—তার মানে ?

মিহির বললে—মানে, ডাইরেক্টর একা আসবে না···তাঁর সঙ্গে আসছে ওদের নিউ ফাইণ্ড এক মহিলা···নাম বিচিত্রা দেবী···সেই সঙ্গে ডাইরেক্টরের এ্যাসিষ্টাণ্ট ধূর্জ্জটি বোস আর ক্যামেরাম্যান ফাল্‌তুপ্রসাদ। মানে, ওদের প্ল্যান প্রায় ম্যাচিয়োর···শুধু আমাদের টার্মস ঠিক করা। তা, তোমার আপত্তি আছে ?

—না, আপত্তি কিসের ?

—তোমাকেও থাকতে হবে। তার কারণ, কলকাতার মানুষদের হাবভাব তুমি ঢের বেশী বুঝবে···তাই তোমার প্রেজেন্স এসেন্সিয়াল ! আর দেখে, বুঝে, সব শুনে···কাল যা বলেছি, ইফ উই টু কুড্ টোগেদার···

কথা বাড়াবার ইচ্ছা ছিল না···অবনী বললে—বেশ, বসবো তোমাদের আসরে।

—তাহলে ভাই, আর একটি কাজ···

—কি কাজ ?

—তুমি বেরুচ্ছো তো···

—বলো···কি করতে হবে।

মিহির বললে—একবার মার্কেটে যদি যাও···আমাদের সঙ্গে। কিছু পেষ্ট্রি টেষ্ট্রি কিনে আনবো···কালকের পার্টির জন্য।

অবনী হাসলো···বললে—মার্কেটে ভালো পেষ্ট্রি-টেষ্ট্রি মিলবে না। তার জন্য যেতে হবে পার্ক ষ্ট্রীটে। ভালো দুটি দোকান আছে···সেখান থেকে নিতে হবে···আর মার্কেট থেকে কিছু ফল।

—তাহলে পারবে যেতে এখন? ট্যাক্সি মজুত আছে দোরে···ষ্টুডিয়ো থেকে আসছি তো···গৌরী ট্যাক্সিতে বসে আছে।

অবনী বললে—আমার একটা নিমন্ত্রণ আছে···ক্লাবে গানের আসর।

মুখখানা করুণ করে মিহির বললে—কতক্ষণ বা সময় লাগবে! কিনে দিয়ে তুমি যেয়ো···ট্যাক্সি থাকবে···দেরী হবে না।

—চলো।

ট্যাক্সিতে উঠে বসলো অবনী আর মিহির···গৌরী ছিল ট্যাক্সিতে বসে···ট্যাক্সি চললো পার্ক ষ্ট্রীটের দিকে।

পেষ্ট্রি, চীজষ্টিক, ক'রকম মিষ্টি এবং মার্কেট থেকে খেজুর, কমলালেবু, আপেল, কলা—পাঁচ রকম ফল কিনে···অবনীকে তার ক্লাবে নামিয়ে গৌরীকে নিয়ে মিহির ফিরলো বাড়ী।

পরের দিন সকালে আটটা বাজতে না বাজতে একখানা প্রকাণ্ড মোটর এসে দাঁড়ালো অবনীর বাড়ীর দোরে। মোটর থেকে নামলো ডাইরেক্টর এবং তার হাত ধরে বিচিত্রা দেবী এবং সেই সঙ্গে আরো দুজন ভদ্রলোক—একজন ডাইরেক্টরের এ্যাসিষ্টান্ট ধূর্জ্জটি বোস আর একজন ক্যামেরাম্যান ফাল্তুপ্রসাদ।

মিহির অভ্যর্থনা করে সকলকে এনে বসালো একতলার বড় ঘরে। এটি বসবার ঘর···সোফা-কৌচে সাজানো।

অবনীকেও অভ্যর্থনা করতে হলো···তার বাড়ী এবং এঁরা তার

বাড়ীতেই অতিথি। মিহির পরিচয় করিয়ে দিলে; তারপর চা এবং জলযোগ।

খেতে খেতে ডাইরেক্টর নিশ্বাস ফেলে…চেয়ারে মাথা হেলিয়ে বসছেন…মাঝে মাঝে। এরা সকলে একথা ওকথা কইছে…সে-সব কথা নিজেদের মধ্যে।

ধূর্জ্জটি বোস বললে ফাল্‌তুপ্রসাদকে—আপনার ও-শটটা যা হয়েছে…যাকে বলে, মার্ভেলশ। এদেশের গোলা আডিয়েন্স ওর দাম বুঝবে না।

ফাল্‌তুপ্রসাদ বললে—আরে মুশয়, ওঁইই তো হামার আপশোষ! কত ভেবে, মগজ খাটিয়ে এসব ট্রিক-শট আমদানি করি…আপনাদের দেশের কাগজওয়ালারা ভুলেও তার কথা বলবে না। ওদের পেয়ারের যারা…তাদের কথাই লেখে লাইন ভরতি করে!

ধূর্জ্জটি বললে—হুঁ…ওসব রিভিউয়ের মধ্যে বহুৎ ব্যাপার আছে ফাল্‌তুপ্রসাদবাবু! তোয়াজ করা চাই। তা আমাদের প্রোডিউসারকে এত বলি…তা ও বলে, বাজে খরচ! বোঝে না…যে-পুজার যে-মন্তর! তারপর সে তাকালো পার্শ্বোপবিষ্টা বিচিত্রা দেবীর দিকে… যেন কাগজের তৈরী পুতুলটি! সাজে-সজ্জায় খাশা দেখতে…ভিতরে কি-পদার্থ আছে, কে জানে!

গৌরী তার সঙ্গে কথা কইলো…বললে—আপনি কোনো ছবিতে নেমেছেন?

—না। বিচিত্রা সলজ্জ ভাবে দিলে ছোট্ট জবাব।

তার এ-জবাবে মেলালো ধূর্জ্জটি নিজের কণ্ঠ…ধূর্জ্জটি বললে—স্যর-এর আবিষ্কার! বিচিত্রা দেবীকে উনি একদিন ট্রামে দেখেন…দেখেই ওঁর কেমন মনে লাগলো! নিঃশব্দে উনি ওঁকে ফলো করলেন…ওঁর বাড়ী পর্য্যন্ত। তার পর বাড়ীর লোকের সঙ্গে আলাপ। ওঁর বাবা কোন

অফিসে সামান্ত চাকরি করেন...পাঁচ-সাতটি ছেলেমেয়ে...সামাল পান না রোজগারের টাকায়। স্তর তখন প্রস্তাব করলেন...ফি ল্ম এঁকে দেবার কথা। ওঁর মা খুব আপত্তি তুলেছিলেন...বলেন—না, না, ওখানে গেলে স্বভাব-চরিত্র ঠিক রাখা সম্ভব হবে না। স্তর তখন দু-চার জনের দৃষ্টান্ত দিলেন—ম্যারেড লেডিজ...হাই ক্লাশ লেডি...স্বামীরা মত দিতে দেরী করেননি এবং তাঁরা ফিল্মে নেমে নাম আর টাকা যা করেছেন...বলবার নয়! বাপ বুঝলেন...বোঝালেন, দারিদ্র্য...যেমন করে হোক, দারিদ্র্য ঘোচানো চাই! স্তর বললেন—এখনি মাসে একশো করে পাবেন...তার পর স্তর দেবেন ট্রেনিং...ছবিতে নামাব সঙ্গে সঙ্গে মাসে মাহিনা হবে প্রথম ছবিতে আড়াইশো...তার পর পর-পর ছবিতে ডবল রেটে মাহিনা বাড়বে...অর্থাৎ প্রথম ছবিতে আড়াইশো...সেকণ্ডখানায় পাঁচশো...থার্ডখানায় একহাজার ...ফোর্থে দু হাজার—তবে স্তর-এর ইউনিট ছাড়া হবে না!

গৌরীর কৌতূহল হলো...গৌরী বললে—ওঁর আসল নাম বিচিত্রা?

ধূর্জ্জটি বললে—না। ওটা ফিল্ম-নেম্...স্তর দিয়েছেন। মানে, চিত্রা মিত্রা...এমনি নাম দিলে চট্ করে পশার হয়।

গৌরী চাইলো বিচিত্রার দিকে...বললে—আপনার আসল নাম কি?

লজ্জানতমুখী হয়ে মৃদুকণ্ঠে বিচিত্রা বললে—আমার আসল নাম সরলা।

এমনি কথার মধ্যে ডাইরেক্টর স্তর-এর সুগভীর নিশ্বাস...তিনি রগ চেপে মাথা তুলে বসলেন।

অবনী বললে—মাথা ধরেছে?

—ও! বলবেন না! স্তর দিলেন জবাব...বললেন—এই মাথা! কি-রোগ যে ধরেছে...একটু চিন্তা করলেই মাথা ধরে!

ধূর্জ্জটি বললে—দিনরাত ফিল্ম সম্বন্ধে চিন্তা করছেন! জানেন, স্তর-

রাত্রে তিন ঘণ্টা ঘুমোন ··ঘড়ি ধরে···আর শুয়ে শুয়ে চিন্তা···হাউ টু মেক এ পিকচার ছাট উড এ্যাষ্টাউণ্ড দী হেমিস্ফীয়ার্স !

অবনী মনে মনে হাসলো···ভাবলো, এ পর্য্যন্ত কি এমন ছবি বানিয়েছেন! অবনী বললে—কখানা ছবি সব সুদ্ধ তুলেছেন এ পর্য্যন্ত ?

—জানেন না! ধূর্জ্জটি যেন আকাশ থেকে পড়লো···এমন বিস্ময় তার! সে বললে—ছবি তুলেছেন···কমপ্লীট ছবি দুখানা···চারখানা ইনকমপ্লীট রেখে ছেড়ে দিয়েছেন···প্রোডিউসারের সঙ্গে বনেনি···মানে, প্রোডিউসার ওঁর কাজে ইণ্টারফীয়ার করেছিল বলে!

অবনী বললে—যে দুখানা কমপ্লীট করেছেন···দেখানো হয়েছিল ?

—হ্যাঁ। প্রথম ছবি বঙ্কিমবাবুর 'রজনী'···এক হপ্তার বেশী চলেনি··· তার কারণ যে-হাউসে রিলিজ হয়েছিল···তাদের সরঞ্জাম ছিল লক্ষ্মীছাড়া··· সাউণ্ড ভালো ফুটতো না···ছবি হতো ঝাপশা! অডিয়েন্স চ্যাঁচামেচি করতে লাগলো···ঢিল ছুড়েছিল···কাজেই ইল লাক!

অবনীর বেশ মজা লাগছে! সে বললে—নেক্সট ছবি ?

ধূর্জ্জটি বললে—নেক্সট ছবি সোশাল। স্যর-এর নিজের লেখা গল্প··· সে ছবির নাম পাকচক্র! সে-ছবি রিলিজ হবামাত্র দুজন মকর্দ্দমা লাগিয়ে ইনজাংশন বার করলো···সে-মকর্দ্দমা এখনো ফয়শালা হয়নি!

ভাগ্যবান পুরুষ! অবনী ভাবলো, তাই এখন এরা পাকড়াও করতে চায় মিহিরকে—এলাহাবাদে থাকে···ফিল্ম-সমুদ্রের হাঙর-কুমীরের সন্ধান রাখে না···ফশ করে জলে নামানো অসুবিধা হবে না।

স্যর দু-চারবার মাথা নাড়লেন···মুখে কোনো কথা নয়···তার পর কোকোর পেয়ালায় একটি চুমুক দিয়ে চেয়ারে ঠেশ দিয়ে মাথা হেলিয়ে দিলেন···মাথা হেলিয়ে চোখ বুজে ডাকলেন—বিচিত্রা দেবী···

কণ্ঠ শুনে সকলে তাকালো স্যর-এর দিকে। বিচিত্রা দেবী বললেন—বলুন, স্যর ?

—মাথা···এই রগ! চোখ বুজেই স্যর নিজের কপালে আঙুল বুলিয়ে বললেন—রগে তেমনি মেশাজ করে দেবেন? আপনার মেশাজিংয়ে আশ্চর্য্য ফল পাই। ভারী চমৎকার হাত আপনার!

ধূর্জ্জটি উৎসাহভরে বলে উঠলো—হবে না হাত! দুমাস ওয়েলেশলি ষ্ট্রীটে মেশাজ-ক্লিনিক্‌সে কাজ করেছিলেন উনি।

মেশাজ-ক্লিনিক্‌স! অবনী চমকে উঠলো···তার দুচোখে সে-চমকের ভাব স্পষ্ট হয়ে ফুটলো।

বিচিত্রা উঠে স্যর-এর রগে আঙুল টিপে টিপে মেশাজ করতে লাগলেন।

ধূর্জ্জটি বললে অবনীকে উদ্দেশ করে—দু মাস···জানেন না তো, সে-সব কী জায়গা! কটাতে পুলিশ হানা দিতে তখন চোখ ফুটলো···উনি ওকাজ ছেড়ে দেন··তার পর কাজের চেষ্টা করছিলেন···সেই সময় স্যর-এর নজরে পড়লেন।

বটে! অবনী কোনো কথা বললো না।

তারপর দশ মিনিট চুপচাপ···ভোজন-পর্ব্ব চলেছে! অত পেষ্ট্রি···অত ফল···চীজষ্টিক···নিঃশেষ হয়ে গেল। ষ্টুডিয়োর এ্যাসিষ্টাণ্ট আর ক্যামেরা-ম্যান যা খেলো···মনে হলো, কতকাল এরা যেন অনাহারে ছিল! দশ মিনিট মেশাজের পর স্যর মাথা তুলে বসলেন। বিচিত্রা দেবীর দু হাত চেপে ধরে···মুখে স্নিগ্ধ মধুর হাসি···স্যর বললেন—মেনি থ্যাঙ্কস··মাথা সেরেছে। সাধে কবি লিখেছেন—হোয়েন পেন এ্যাণ্ড এ্যাঙ্গুইশ রিং দি ব্রাউ·· এ মিনিষ্টারিং এঞ্জেল দাউ!

এ-কথা বলে একটা নিশ্বাস···স্যর বললেন—এবারে বিজনেস-টক্‌স্‌··· আপনি বসুন, বিচিত্রা দেবী।

কথা সুরু হলো। স্তর যা বললেন…তার মর্ম্ম—পনেরো হাজার টাকা পেলেই কাজ সুরু করা চলে…এভরিথিং রেডি…গল্প মায় সিনারিয়ো মজুত। দুজন ডিস্ট্রিবিউটর…একজন হলো মুলুকচাঁদ…আর একজন গোবর্দ্ধন সিকদার…তারা দেড় লাখ পর্য্যন্ত দিতে রাজী। গল্পটা দুজনের খুব পছন্দ…মানে… ওরা বলে, হুঁশিয়ার ভাবে সেক্সি করা চাই। সেন্সরের চোখে ধুলো দিয়ে যাতে চালানো যায়…মজাদার কটা শীন…মজাদার কটা বোলচাল…মানে ওরা বলে, এমন ডায়লাগ মাঝে মাঝে থাকবে… যেন বাপ-ছেলে পাশাপাশি দেখতে বসে এ ওর পানে চাইতে পারবে না! তাহলেই সাকসেশ! ওরা গল্প চায় না…চায় ক্যাচি ব্যাপার!

অবনীর গা বিড়বিড় করছে শুনতে শুনতে…আর পারে না। হঠাৎ নিজের হাতঘড়ির দিকে চেয়ে সে উঠে দাঁড়ালো…বললে—দশটা বাজে… ফার্ষ্ট আওয়ারে আমার ব্যাঙ্কে একবার যাওয়া দরকার। আপনারা কথাবার্ত্তা কন্…আমাকে মাপ করতে হবে…আমি আসি।

এ কথা বলে কারো উত্তরের অপেক্ষা না করে অবনী পড়লো ঘর থেকে বেরিয়ে।

দুপুরে খেতে বসে কথাবার্ত্তা…সকালের মিটিংয়ের রিপোর্ট…মিহির বললে—গল্পটা শুনিয়ে গিয়েছে…ফিল্মে যেমন গল্প হয়…নাচ আছে, গান আছে, একজোড়া নায়িকা, একজোড়া নায়ক, লাগসৈ বুলি। বলেছে, পনেরো হাজার এখনি দিতে হবে না…টু ষ্টার্ট উইথ—পাঁচ হাজার হলেই হবে! এ পাঁচ হাজার ব্যাঙ্কে ডিপজিট থাকবে ডাইরেক্টর আর আমার জয়েণ্ট নামে…জয়েণ্ট সহিতে চেক কাটা…ষ্টুডিয়োর ভাড়া দু মাস পরে দিলে চলবে। র ফিল্ম ক্রেডিটে চলবে…ডিষ্ট্রিবিউটরের টাকা পেলে তাই থেকে ষ্টুডিয়োর ভাড়া আর ফিল্মের দাম দিলে চলবে।

ডাইরেক্টর এখন নেবে কনট্রাক্ট হবার সঙ্গে পাঁচশো এ্যাডভান্স···তারপর মাসে মাসে ঐ পাঁচশো করে···বাকি রেমিউনারেশন, শীনারিয়োর দাম··· এগুলো থোক একটা এ্যামাউন্ট ধরে ফিল্মের উপর চার্জ থাকবে—দেখিয়ে যে-টাকা আসবে···তাই থেকে একটা পার্সেণ্টেজ ওঁকে দিতে হবে। খরচ বলতে গাড়ী, টিফিন, সেট তৈরী আর আর্টিষ্টদের মাহিনা। বলছে, গৌরী যদি একটি হীরোইনের পার্ট নামেন···প্লে-ব্যাকে গাইবেন কেন···একেবারে লিডিং ক্যারেকটার···তাহলে দু-দুজন নতুন ফাইণ্ড···খুব জোর এ্যাট্রাকশন হবে। গৌরীর রেমিউনারেশন থোক একটা দেওয়া হবে···ছবির সেল থেকে···মানে, সব দিকে খরচ কমিয়ে বেশ একনমিকাল প্রোডাকশন। আমি বলি, নেমে যাই অবুদা···পনেরো হাজার বৈ নয়! আমি জানি তোমার মনে খটকা···বেশ, তুমি টাকা দিয়ো না। তবে এ-কোম্পানিতে তোমার থাকা চাই···ফর সুপারভিশন এ্যাণ্ড এ্যাডভাইস! তুমি শুধু তোমার জানা এটর্ণিকে বলে দাও, দলিলপত্রগুলো করে দেবেন। গৌরীরও খুব ইচ্ছা, অল্প টাকা খরচ করে এতবড় চান্স···তার জীবনের মস্ত এ্যামবিশন···

স্বেচ্ছায় এরা ঝুলতে চায় এবং ঝুলবেই···অবনী মিথ্যা কেন মানা করবে? মানা করলে এরা দুজনে শুনবেও না! অবনী বললে—বেশ! তার পর গৌরীর দিকে চেয়ে বললে—তুমিও পর্দায় নামছো তাহলে!

—হ্যাঁ। এমন চান্স··

হেসে অবনী বললে—গৌরী নামেই নামবে? না, এদের আছে বিচিত্রা দেবী···তুমিও অমনি চিত্রা-মিত্রা নাম নিচ্ছ? কি নাম নেবে? বিমিত্রা? না, ভূমিত্রা?

গৌরী হাসলো···সলজ্জ হাসি। হেসে গৌরী বললে—কটা নাম মাথায় আসছে···তবে এখনো কোনোটা ঠিক করিনি।

—কি-কি নাম···শুনতে পাই? অবনী করলো প্রশ্ন।

গৌরী বললে—কিঙ্কিনী···ঝলকা···না, একখানা বড় বাঙলা অভিধান খুলে দেখে দেখে নাম ঠিক করা যাবে! ঘোড়া হলে চাবুকের অভাব হয় না, অবুদা!

—হুঁ। তা বেশ···আমি আর কি বলবো! আশীর্ব্বাদ করে বলি, অয়ং আরম্ভঃ শুভায় ভবতু।

তার পর পনেরো দিন ধরে অবনীর বাড়ী যেন মুশাফিরখানা! একতলায় তার বসবার ঘরে এদের আসর বসছে সর্ব্বদা। এ-লোক ও-লোক··· কত লোক আসছে···কত শলাপরামর্শ চলছে···যেন রঘুবংশের রঘুরাজা দিগ্বিজয়ে বেরুবেন, তার আয়োজন চলেছে···না, কুরুক্ষেত্র মহাসমরের আগে কুরুপাণ্ডবদের শলাপরামর্শ চলেছে···দূত আসছে···দূত যাচ্ছে··· ভীষণ সমারোহ।

অবনী নিজেকে সম্পূর্ণভাবে সরিয়ে রাখতে চায়···পারে না। মাঝে মাঝে ঢেউয়ের মতো মিহির আর গৌরী এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে, বলে—কাজ এমনি চলেছে···এতখানি এগিয়েছে···এখন তুমি কি বলো?

এটর্ণির বাড়ী দলিল লেখাপড়া হয়ে গেছে···ব্যাঙ্কে দু নামে পাঁচ হাজার টাকা জমা দেওয়া হয়েছে! লেখাপড়া হয়েছে—পর-পর দু মাসে পাঁচ হাজার করে আরো দশ হাজার সে জমা দেবে। আর্টিষ্ট নির্ব্বাচন চলেছে। অবনীর বসবার ঘরটা তারা অফিসে রূপান্তরিত করে নিয়েছে।

গঙ্গাপদকে ডেকে অবনী বলে—আমার কোষ্ঠীখানা একবার দেখাতে ইচ্ছা করে গঙ্গাদা···সারা জীবন এমনি পরের ঝামেলা নিয়েই কাটাতে হবে কি না।

হেসে গঙ্গাপদ জবাব দেয়—যে আসে, এসে যা বলে···তুমি তাতেই মেতে ওঠো!

—উপায় কি, বলো গঙ্গাদা! একটা কিছু করা চাই তো। তাছাড়া দেখছো, শুধু মজার মজার ব্যাপার! ভাবি, এত লোকের মাথা খারাপ হয়েছে···না, আমার মাথা খারাপ হয়েছে?

হেসে গঙ্গাপদ বলে—দুটো কথাই সত্য। দু পক্ষেরই মাথা খারাপ। নাহলে পিসিমা যা বলেন, বিয়ে করে ঘর-সংসার করতে···আর পাঁচজনের মতো···যা রীতি! তা নয়···

অবনী জবাব দেয়—উঁহু···জানো তো, বিয়ে করতে একালে ভয় পাই। কত রকমের মানুষ···তাদের মনে কত রকমের ব্যাপার···যেন গোলোকধাঁধা···বিয়ে করে শেষে গোলোকধাঁধায় পড়ে হিমসিম খাবো! এসব ব্যাপারে খানকটা জড়িয়ে পড়লেও বাঁধন কেটে যখন খুশী বেড়িয়ে পড়া যায়। কিন্তু বিয়ের বাঁধন···

গঙ্গাপদ বললে—তোমার সেই বন্ধু···হিমাদ্রিবাবুর কি খবর?

—জানি না। কাশীতে সেই শেষ দেখা। কোন গোস্বামীবাবাজীর দলে জুটেছে···তিনি ভারতের ঐক্য-সাধনের ব্রত নিয়ে এদেশ-ওদেশ ঘুরছেন। কাশীতে আস্তানা···আস্তানার নাম 'আনন্দধাম'। সেখানেও তার সেই এ্যাট্রাকশন···হিমাদ্রি বলে, মনের দুর্বলতা। আনন্দধামেও সেই দুর্বলতা। গোস্বামীর মেয়ে আছে···চিন্ময়ী, না, মৃন্ময়ী নাম। ছাখো, কবে নিশ্বাস ফেলতে ফেলতে এসে না উদয় হয়! এসে বলবে, ইন লভ ·· ম্যাডাল ইন লাভ উইথ ছাট দেবী!

হাসতে হাসতে গঙ্গাপদ বললে—যা বলেছো! মাথা খারাপ! আমি বলি, লভ যদি তো ছুটোছুটি কেন···বিয়ে করে ফ্যালো।

অবনী বললে—এগিয়ে যায় মসজিদের দরজা পর্য্যন্ত···মসজিদে

ঢুকতে পারে না! আচ্ছা, ওর কাকা স্যর বিদ্যুৎবরণের খবর জানো?

—না। শুনেছিলুম, তিনি বুড়ো বয়সে বিয়ে করে স্ত্রীকে নিয়ে ওয়ার্ল্ড টুর করে বেড়াচ্ছেন।

হেসে অবনী বললে—আমাদের ভাগ্য…এতগুলো উন্মাদকে প্রত্যক্ষ করছি!

রাত্রে খেতে বসেছে তিনজনে…অবনী, মিহির আর গৌরী।

গৌরী বললে—গল্পটা শুনবে অবুদা…ছবির গল্প?

অবনী বললে—না ভাই…ছবি হলে পর্দ্দায় ছবি দেখবো। গল্প আগে থেকে শুনে রাখলে ইনটারেষ্ট থাকবে না।

গৌরী বললে—দাদার আর আমার সম্পর্কে ক্লাশ করবে না… গল্পটা ভেঙে তৈরী করা হয়েছে। মানে, দাদা আর আমি খুব ধনীর ছেলেমেয়ে। দাদার টেষ্ট কমিউনিষ্টিক…আমার কিন্তু তা নয়—আমি খুব গে-ক্যারেক্টার …পার্টি গান নাচ নিয়ে থাকি। আর দাদা যত স্লম্ সাফ করে…বস্তির মানুষদের দুঃখ-দুর্দ্দশা দূর করে তাদের মানুষের লেভেলে আনতে চায়। এক বস্তির মেয়ের সঙ্গে…সে-মেয়ে সাজছে ঐ বিচিত্রা দেবী…বিচিত্রার সঙ্গে হলো দাদার লভ। কিন্তু বিয়ে হবে না…তার কারণ, বিচিত্রার বাবা এক আশ্চর্য্য ধাতের মানুষ।

অবনী বললে—না, না…এত ডিটেল দিয়ে বলো না…আমি এখন শুনবো না।

গৌরী বললে—আচ্ছা, আচ্ছা…তবে আমার রোলটা বেশ হালকা… নাচে গানে ট্রায়াম্ফ করবার খুব চান্স পাবো। ডাইরেক্টর বললেন, এই একটি রোল করেই আমি ষ্টার হয়ে যাবো। দুখানা রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতে

হবে আমায়—আমি নিজে চুজ করে নেবো···আর দুখানা হিন্দী গান গাইবো। হিন্দী গান দুটো লেখা হবে···আর তাতে সুর যা দেওয়া হবে··· তার কাছে কোথায় লাগে 'লারেলাপ্পা'! আমার ক্যারেক্টারটা খুব ড্রামটিক হয়েছে। আমিও কটা সাজেশন দিয়েছিলুম···সে-সাজেশন ওঁরা নিয়েছেন।

অবনীর সঙ্গে দেখা হলেই ছবির কথা চলে। অবনীর কোনো কৌতূহল নেই···তবু শুনতে হয়।

ছবির মহরতের তারিখ স্থির হলো এবং সে-মহরতে অবনীকে যেতে হলো নিমন্ত্রিত হয়ে।

মহরতের পরের দিন মিহির বললে—তোমার আস্তানা ছাড়ছি, অবুদা। ষ্টুডিয়োর কাছে চমৎকার সাজানো ফ্ল্যাট পাওয়া গিয়েছে। ওখানে সুবিধা খুব···অফিসও ঐখানে আমার একটা ঘরে···তোমার উপর উপদ্রব ঘুচলো।

অবনী বললে—আমি কোনো দিন বলেছি, উপদ্রব?

—তা নয়, তবে এতলোক আসছে যখন-তখন···তাদের কত ঝামেলা। তা নয়···ওখানে যাচ্ছি সুবিধার জন্য··টাইম সেভিং হবে খুব! তাছাড়া চোখের সামনে সব থাকবে।

গৌরী এবং মিহির এ-বাড়ী থেকে বিদায় নিয়ে গেল। অবনী আবার একা।

কিন্তু তাও এক হপ্তা মাত্র। পিসিমা হঠাৎ এসে উপস্থিত হলেন। অবনী বললে—কাশীবাসে অরুচি হলো?

—না রে···তোকে একা এখানে ফেলে রেখে মন টিঁকলো না··· তাই এলুম।

হেসে অবনী বললে—বিয়ের পাত্রীর সন্ধান পেয়েছো ?

—আবার ! পিসিমা দু-চোখ বিস্ফারিত করলেন···বললেন—আবার বলবো বিয়ে করতে·· তেমন বাপের বেটী আমি নই। তোমার যা খুশী করো। আমি কে···একটা অখণ্ডে পিসি বৈ নই···আমি যাতে সুখী হই··· তা তুমি করবে কেন, বাবা ! বিশেষ, একালের ছেলে তুমি।

কথাটা বলে পিসিমা মস্ত একটা নিশ্বাস ফেললেন।

সে-নিশ্বাসে অবনীর বুক দুলে উঠলো···কিন্তু উপায় কি !

পিসিমাকে জড়িয়ে ধরে অবনী বললে—না পিসিমা···এমন সব কথা তুমি বলো না ! তোমাকে ছাড়া আমি আর কাকে জানি, বলো ? তুমি ছাড়া পৃথিবীতে আমার কথা ভাববে, আমার ভালো বুঝবে, এমন আর কেউ নেই। তুমি যদি রাগ করো আমার উপর···তাহলে আমার আর সংসারে থাকা কেন ! যেদিকে দুচোখ যায়···চলে যাবো।

কথায় শেষ দিকটাতে অবনীর কণ্ঠ এমনিতে ভারী হয়ে এলো।

পিসিমার বুকখানা যেন ভেঙ্গে চুর হয়ে যাবে···তিনি তেমনি ব্যথা পেলেন ! তিনি বললেন—না রে, না···যা আমি মুখে বলছি, তা কি সত্যি ! তা নয় ··তবে আমার বয়স হয়েছে···কোন্ কালে চলে যাবার কথা···আছি কি করে, জানি না ! যখন ভাবি, চলে যাবো জন্মের মতো···তোর জন্য মনটা তখন এমন অস্থির হয় ! ভাবি, তেষ্টায় একটু জল চাইলে কে দেবে ? তোর শরীর যদি অসুস্থ হয়···কে দেখবে ? জানি, লোকজন আছে···কিন্তু তারা টাকার গোলাম, বাবা···তারা কি দরদ জানে ? না, যত্ন জানে ? তাই···ভালো মেয়ে দেখে তোর সঙ্গে বিয়ে দিয়ে যদি ঘরে বসাতে পারি··· তাহলে আমার কোনো চিন্তা থাকবে না। সত্যি, ভেবে দ্যাখ্···ঘরে এসে দাঁড়াবি বসবি কার কাছে ? কার সঙ্গে দুটো কথা কইবি ? তোর বন্ধু-বান্ধব···সকলে বিয়ে করে কেমন ঘর-সংসার করছে···শান্তিতে আছে।

আর তোর ঐ কথা··· বিয়ে করলে বিপদ হবে! বৌ কি ঢেঁকি? না, জাঁতা? এঁ্যা···বল্!

অবনী বললে—তা নয়···তবে একালে চারিদিকে যা দেখছি—এই যে এলাহাবাদে থাকে আমার এক মাসতুতো ভাই আর বোন···মাথার উপর কেউ নেই···বিয়ে-থা করেনি···কলকাতায় এসেছে···ফিল্মে নামছে।

পিসিমা বললেন—ও···তোর মুক্তো মাসির ছেলেমেয়ে! তা মুক্তো তোমার আপন মাসি নয়···তোমার মায়ের দূর-সম্পর্কে মামা ছিল···সেই মামার মেয়ে। সে-মামা ছিল ভয়ানক গোরা মেজাজের···তোর মেসোও তেমনি। বাপের ঐ এক মেয়ে ছিল মুক্তো···তোর মেসো মুক্তোকে বিয়ে করে শ্বশুরের সর্ব্বস্ব পেয়েছিল। তার ছেলেমেয়ে এখানে ছিল এসে?

—হ্যাঁ। তা যাক···তোমার কাশীর হাওয়া···ডাক্তার সাহেবের কি খবর?

পিসিমা বললেন—বৌ এসেছে বালীতে। সেখানে তার মামার বাড়ী··· মামারা মস্ত বড়লোক···মেয়ে পূর্ণিমার বিয়ের জন্য বৌ ছটফট করছে··· বলে, কাশীতে থেকে বিয়ের কিছু করা যাবে না···তাই জোর করে বালীতে এলো···ওখানে থেকে পূর্ণিমার বিয়ের ঠিক না করে নড়বে না! আমি তার সঙ্গেই চলে এলুম। সে গেল বালী···আমি এলুম বাড়ী!

—ও···বটে! তাহলে একদিন গিয়ে দেখা করে আসবো'খন।

পিসিমা বললেন—তাহলে বৌ খুব খুশী হবে। তাছাড়া বৌ বলেছে তোকে বলতে, কলকাতার ছেলে···কত ছেলের সঙ্গে জানাশোনা···দ্যাখ না রে···পূর্ণিমার জন্য ভালো একটি পাত্র!

অবনী বললে—বাপরে···অমন কাজও করে! কারো বিয়েয় থাকতে নেই, পিসিমা···কে জানে, কোন্ বর কি রকম উৎরোবে···কোন বৌ কি

দাঁড়াবে শেষে! মাঝে থেকে বিয়ে দিইয়ে আমি হবো নিমিত্তের ভাগী! অমন কাজও করতে আছে!

পিসিমা কি ভাবছিলেন···অবনীর কথা শেষ হলে তার পানে চেয়ে পিসিমা বললেন—তোর সঙ্গে হলে সকলে কি খুশী হতুম! বৌ এখনো বলে···আমিও বলি···কিন্তু তুমি যে-কীর্ত্তি করে এসেছো সেখানে··· ছেলেটাকে ঠেলে জলে ফেলে। আমার ছাওরের বিশ্বাস, মাথা খারাপ। যে-ছেলের মাথা খারাপ···তার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে কি করে দেবে!

হেসে অবনী বললে—সত্যি কথা! তাছাড়া এ-কথাও ঠিক···তুমিও অস্বীকার করতে পারবে না···আমার মাথা আর পাঁচজনের মতো সুস্থ নয়··· সুস্থ হলে কি আর এমন যা-তা খেয়ালে চলি! তুমি ভালোবাসো বলে বলো, খেয়ালী···পাঁচজনে এমন খেয়ালীকে বলে, পাগল!

তিন

দু'মাস পরের কথা···

অবনীর দিন কাটছে মন্দ নয়। হুজুগে মানুষ···একটা-না-একটা হুজুগ লেগেই আছে। কোনো কন্যাদায়গ্রস্ত এসে ধরে—মেয়েটার বিয়ের জন্য সাতশো খানেক টাকা দরকার, বাবা···বাকি কষ্টে সৃষ্টে জোগাড় করেছি। এই সাতশোর জন্য ধরেছি বটকেষ্ট কর্ম্মকারকে··· যুদ্ধের সময় পুরোনো লোহা-লক্কড় বেচে···আর কালোবাজারী করে ক'লাখ টাকার মালিক—সে ঐ গন্ধমাদন থিয়েটার লীজ নিয়ে চালাচ্ছে। বাঙলা থিয়েটারের জ্বালোই তো বাবা, ভাঙ্গন চলেছে···যে-বই যে খুলছে···জমে যাচ্ছে কুলপী-বরফের মতো। তা তার সঙ্গে এককালে খুব দহরম-মহরম ছিল···সে সাতশো টাকার টিকিট দিয়েছে···বলেছে, বেচে যদি জোগাড় করতে পারো···তার

থিয়েটারে একটা নাইট সে দেবে। তা বাবা, ক'খানা বক্স তোমায় বেচে দিতে হবে। তোমার চেনাজানা বহুৎ বড়লোক আছে তো।

ব্যস্‌···কন্যাদায়গ্রস্তের কন্যাদায় ঘোচাতে অবনী চেনাজানা বন্ধুবান্ধবদের ধরে বক্সের টিকিট, অর্কেষ্ট্রার টিকিট গছিয়ে তাকে দিলে জোগাড় করে প্রায় পাঁচশো টাকা।

কে এসে ধরলো, পাড়ার কার সঙ্গে হয়েছে কি-না-কি মামলা···তার লড়বার তাকত্‌ নেই···মিটিয়ে দিতে হবে। অবনী কোমর বেঁধে লেগে সে-মামলা মিটুতে চললো।

অর্থাৎ, নিজের কাজ নেই···পাঁচজনের কাজ নিয়ে সে দিন কাটিয়ে চলে!

সেদিন তার বন্ধু চৈতন মিত্তির এসে ধরলো—ডায়মণ্ড হার্বারের কাছে সরিশা গ্রাম···সেখানে চৈতনদের পৈত্রিক কিছু জমি আছে···বহু সরিক···সরিকদের সঙ্গে আপোষে সে-সব জমি ভাগবাটোয়ারা করে নিয়েছে···চৈতনের জমিগুলো মাপ-জোপ করিয়ে বেড়া দিয়ে ঘিরে আলাদাভাবে কায়েমি করতে চায় চৈতন···তার সঙ্গে গিয়ে অবনীকে সাহায্য করতে হবে। অবনী ছুটলো চৈতনের সঙ্গে সরিশা গ্রামে।

সরিশায় দু'দিন থেকে তিন দিনের দিন সেখানে খাওয়া-দাওয়া সেরে ফিরবে···অবনীর খেয়াল হলো, একবার ডায়মণ্ড হার্বার ঘুরে যাবে। একখানা টু শীটার গাড়ী কিনেছে ক'মাস···লাইসেন্স নিয়ে নিজে গাড়ী চালায়। চৈতন তার সঙ্গে থাকতে পারলো না—তাকে এখন কলকাতায় ফিরতে হবে···উকিলের সঙ্গে আছে তার এনগেজমেণ্ট···কি সব দলিল-দস্তাবেজ রেজিষ্ট্রী করা দরকার। চৈতন ফিরলো কলকাতায়···অবনী এলো ডায়মণ্ড হার্বারে।

এখানে সে শ্রী আর নেই! ছোটবেলায় কতবার এসেছে ডায়মণ্ড

হার্বারে···পরিষ্কার ছিল···পরিচ্ছন্ন ছিল···এখানে বেড়িয়ে, বসে, দাঁড়িয়ে কি আনন্দ না পেতো···হামক ভাড়া করে গাছে খাটিয়ে চুপচাপ পড়ে থাকা—এখন সে ডায়মণ্ড হার্বার···তার ডায়মণ্ডত্ব ঘুচে মূর্ত্তি যা হয়েছে··· বসতে বা দাঁড়াতে ইচ্ছা করে না। তবু এসেছে। খানিকটা থেকে যেতে হলো।

বিকেল বেলা···রোদ পড়ে এসেছে···অবনী চললো গাড়ী ছেড়ে পায়ে পায়ে ডাক বাঙলোয়···একটু চা খাবে···সেই সঙ্গে আরো কিছু যদি মেলে। ডাক-বাঙলোর কমপাউণ্ডে পা দিয়েই চমকে উঠলো! লনে দুখানা বেতের চেয়ার পাতা···গোল একটা বেতের টেবিল···টেবিলের উপর চায়ের পট, পেয়ালা প্রভৃতি এবং এত ফল···এবং কি-সব খাদ্যসামগ্রী··· এবং চেয়ার দুখানির একখানিতে স্যর বিদ্যুৎবরণ এবং আর একখানিতে হিমাদ্রির সেই মালতী মাসি। মালতী মাসির সাজসজ্জা দেখে সে-মাসি বলে চেনা যায় না। অবনীর মনে হলো, একালের একজন ফ্যাশনেবল্ লেডি!

সরে আসবে, তা আর হলো না। স্যর বিদ্যুৎবরণ তাকে দেখে ফেললেন···চেয়ার ছেড়ে তিনি উঠে দাঁড়ালেন···বললেন—স্বপনবাবু! আরে···এসো, এসো!

সাগ্রহে অভ্যর্থনা করলেন স্যর বিদ্যুৎবরণ···সঙ্গে সঙ্গে হাঁকলেন— বয়···

বাঙলোর বয় এসে দাঁড়ালো···স্যর বললেন—ওর একঠো কুর্শী।

বয় কুর্শী নিয়ে এলো···স্যর বললেন অবনীকে—বসো স্বপনবাবু।

অবনীর বুকখানা ছ্যাঁৎ করে উঠলো! ইস···স্বপনবাবু! লেখক স্বপন বিশ্বাস সে···অবনী নয়! কথাটা একরকম ভুলে গিয়েছিল। মনে হলো, ভাগ্যে স্যর মনে করিয়ে দিলেন···নাহলে নিজের আসল পরিচয়েই তো···

স্যর বললেন—চা-টা দিতে বলি ?

অবনী বললে—আজ্ঞে…

—আহা…না, না…আমার কাছে কিসের সঙ্কোচ ! তোমার কাছে আমি কতখানি ঋণী…উঁঃ…এ-জন্মটা তো স্রেফ গিয়েছিল…ভাগ্যে তোমার লেখা নভেল পড়েছিলুম…তাই লাষ্ট চ্যাপটার্স অফ মাই লাইফ এতখানি গ্লোয়িং হয়ে উঠেছে ! এঁকে চিনতে পারছো নিশ্চয়…মালতী দেবী…এখন আমার স্ত্রী। আমার…আমার…আমার…

কি যে বলবেন…স্যর ঠিক করতে পারছেন না…তিনি তাকালেন মালতীর দিকে। মালতীর ঠোঁটে হাসির রেখা…মালতী চেয়ে আছে অবনীর দিকে…অবনী বলে উঠলো—ইয়োর এঞ্জেল।

—একজ্যাকট্‌লি সো ! লেখক না হলে কথা জোগাবে কে ! হা-হা-হা…তা হ্যাঁ…এখানে ! নতুন নভেলের মেটিরিয়াল সংগ্রহ হচ্ছে…উঁ !

অবনীর মাথায় রক্ত ছলাৎ করে উঠলো। সে বললে—আজ্ঞে…এমনি ঘুরে ঘুরেই…তবে এখানে সেজন্য আসিনি…এসেছিলুম একটু কাজে…তাছাড়া একটু চেঞ্জ ! তা, হিমাদ্রির কি খবর ?

—হিমাদ্রি ! স্যর যে চোখে চাইলেন, দেখে অবনীর মনে হলো…স্যর যেন খেয়াল করতে পারছেন না, কে হিমাদ্রি…কার কথা সে জিজ্ঞাসা করলো !

অবনী বললে—হ্যাঁ…হিমাদ্রি…আপনার ভাইপো।

—ও…হিমাদ্রি। হ্যাঁ ! স্যর বললেন—না, বহু কাল তার কোনো খবর পাইনি। বুঝলে স্বপনবাবু—আমি বিবাহ করলুম…তার এটা ভালো লাগলো না। মানে, একালের ছোকরা…খেটে কিছু করবে সে মাথা নেই…তা করতেও চায় না ! খুড়োর দৌলতে যদি আমীরী-চালে গায়ে বাতাস লাগিয়ে থাকা যায়…তাহলে কি বয়ে গেছে মাথা ঘামাতে, দেহ খাটাতে !

ভাবে না, খুড়োর এত যে হয়েছে···এ কি গায়ে হাওয়া লাগিয়ে বেড়িয়ে! খুড়োকে এর জন্য কি খাটুনি না খাটতে হয়েছে···পৃথিবীতে কোনো দিকে কখনো চেয়ে দেখিনি! বিয়ে সেকালে একটা করেছিলুম। মানুষ যেমন করে থাকে···তা সে স্ত্রী মানুষ, না, জানোয়ার···তা জানবার অবসর ছিল না! স্রেফ কাজ নিয়ে মেতেছিলুম। এখন···তাও ভাগ্যে তোমার নভেল পড়েছিলুম, স্বপনবাবু···তাতেই তো বুঝলুম, আমার মধ্যে মন বলে একটা পদার্থ আছে···সে মন চায়···

এই পর্য্যন্ত বলে তিনি তাকালেন মালতীর দিকে···বললেন—এই মালতী···পাশে পাশে ছিল বরাবর·· আমাকে বেঁধে খাওয়াতো···আমাকে দেখতো শুনতো···যেমন চাকর-বাকরে করে···তেমনি। কিন্তু মালতী আসলে কি ওর কাছে থেকে কি সুধা পেতে পারি···তা কি বুঝতুম! বুঝেছি, জেনেছি শুধু তোমার নভেলের গুণে। তোমার ঋণ শোধবার নয় স্বপনবাবু···সত্যি। মালতী সেদিন গান গাইছিল···তোমাদের কবি রবি ঠাকুরের গান গো···খাশা গানটা···কি মালতী? গানটা—

মালতী সলজ্জ হলো···মাথা নামালো।

স্যর বললেন—না, না, বলো! শুধু বলা কেন···শুনিয়ে দাও ওঁকে ···এঁর জন্য তুমি আমি দুজনে আজ·· হুঁ···গাও···গাও। রোদ পড়ে এসেছে·· ঝাউ গাছের পাতা দুলিয়ে ঝিরঝিরে বাতাস···আমার বড় ইচ্ছা করছে···গাও সে-গানটা।

বয় এলো চা নিয়ে···সেই সঙ্গে পেষ্ট্রি···আর কিছু ফল।

স্যর বললেন তাকে—তুম্ যাও।

বয় চলে গেল। স্যর বললেন অবনীকে—খাও, স্বপনবাবু···খেতে খেতে গান শুনবে। মালতীর গান। মালতী খাশা গাইতে পারে! ওর মধ্যে কত গুণ ছিল···কে জানতো! রেঁধে আর আমার সেবা করে দিন

কাটাচ্ছিল। তোমার নভেল···শুধু তোমার নভেল···বুঝলে স্বপনবাবু, আমাদের দুজনকে যেন·· যেন···মালতী বেশ বলে···মালতী বলে, আমরা যেন পাথর হয়ে পড়েছিলুম! গৌতম মুনির শাপে যেন অহল্যা···রামচন্দ্রের পায়ের ছোঁয়া পেয়ে পাথর থেকে অহল্যা যেমন প্রাণ পেয়ে মানুষ হয়ে বেঁচে উঠেছিল···মালতী বলে, তোমার নভেলের দৌলতেও আমরা দুজনে তেমনি·· কেমন, এই কথাই তুমি বলো মালতী···এঁ্যা!

এ-কথা শুনে মালতী লজ্জায় রাঙা···অবনীও লজ্জায় মাথা তুলতে পারে না। অবনীর মনে হলো, নাটক-নভেলে যা লেখে···বুড়ো হলে মানুষের ভীমরতি ধরে···কি করছে, কি বলছে··হ্রস্ব-লঘু জ্ঞান থাকে না··· এঁর সেই দশা! বিশেষ·· বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা হয় যদি, তাহলে···বুড়োরা যে মানুষ থাকে না···মানুষের আদিপুরুষ ডারুইনী মতের বানর হয়ে দাঁড়ায়···কথাটা খুব খাঁটী! কিন্তু তা নয়···অবনীর মাথায় রক্তের ঢেউ ছুটেছে·· এ-ফাঁদে জড়িয়ে পড়েছে···এখন নিস্তার পায় কি করে!

অবনী নিঃশব্দে খেতে লাগলো···স্যর বিহ্যৎবরণের উচ্ছ্বাস চলেছে সমানে এবং উচ্ছ্বাসের এ-তোড়···অবনীর মনে হচ্ছে, যেন সেই পুরাণে পড়েছে ··মহাদেবের জটা ফুঁড়ে গঙ্গার স্রোত বয়ে যেমন ঐরাবতকে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল···স্যর এর এ-উচ্ছ্বাসের স্রোতে মালতীর লজ্জা-সরম আর রইলো না···ভেসে ছিঁড়ে চূর্ণ হয়ে গেল! এবং স্যর-এর এ-উচ্ছ্বাসের তোড়ে মালতীকে গাইতে হলো···রবীন্দ্রনাথের সেই গান।

মালতী মাথা নীচু করে অত্যন্ত সলজ্জ মৃদু কণ্ঠে গাইলো—

আমার প্রাণের মাঝে সুধা আছে, চাও কি!

মালতীর গলা কাঁপছে···মাথা তুলতে পারছে না সে···দুটি ছত্র গাইতে গাইতেই কণ্ঠের বাণী ছিঁড়ে ঝরে গেল···যেন ফুলের আলগা পাপড়ি—তার কণ্ঠ হলো নীরব।

অবনী বুঝলো বেচারীর দুঃখ। বুঝলো, এ-বৃদ্ধের হাতে পড়ে গহনা-শাড়ীর দুঃখ ঘুচেছে···কিন্তু তার জন্য মালতীকে সহ্য করতে হয় কত!

অবনী বলে উঠলো—থাক, আমি কিন্তু বসতে পারবো না। মানে···

খাওয়া হয়ে গিয়েছে···অবনী উঠে দাঁড়ালো। স্যর বললেন—না, না, কোথায় যাবে স্বপনবাবু, এর মধ্যে! গাড়ী আছে তো—যদি বলি, রাত্রে এখানে খাওয়া-দাওয়া সেরে···

—আজ্ঞে! এটুকু বলার সঙ্গে তার মাথায় এলো আইডিয়া···সে বললে —একখানা নভেল লিখছি···সেটা আজ রাত্রে শেষ হবে। প্রায় শেষ করে এনেছি—কাল ছাপাখানায় দেবার কথা।

—ও···তাই নাকি! স্যর বিত্তংবর পর দুচোখে শ্রদ্ধা বিস্ময়ের দৃষ্টি। তিনি বললেন—তাহলে···তা হ্যাঁ, আপনার শেষ নভেলটা কি— আহাহা, কি নামটা বলুন তো?

প্রশ্নটা তিনি নিক্ষেপ করলেন অবনীর উদ্দেশে! অবনীর মনে হলো, লক্ষ্মণের বুকে শক্তিশেল পড়েছিল যখন···তখন লক্ষ্মণের অবস্থা হয়েছিল তার এখনকার অবস্থার মতো!

কি সে বলবে? জানে না স্বপন বিশ্বাসের কোনো বইয়ের নাম! হিমাদ্রির প্রয়োজনে একদা কটা নাম আয়ত্ত করেছিল···কিন্তু কালের ঝাপটায় কোথায় সে-সব নাম গেছে হারিয়ে।···

অথচ একটা নাম চাই! কি বলবে? সে কেমন উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে তাকালো স্যর-এর দিকে···বললে—কোন্‌টা আপনি মীন্ করছেন?

স্যর বললেন—আপনার লাষ্ট যেটা বেরিয়েছে!

অবনী বললে—মানে, দু-তিনজন পাবলিশার বার করছে কিনা··· কোনটা আগে কোনটা পরে আমার খেয়াল থাকে না। কখানা প্রায়

একসঙ্গেই বেরিয়েছে কি না, তাই—মানে, আপনি কোন্‌টা মীন্‌ করছেন ?

স্যর তাকালেন মালতীর পানে···বললেন—কি নামটা, মালতী ? সেই যে যেটাতে রিক্সওয়ালার সঙ্গে সেই জ্যোৎস্নাময়ীর ভালোবাসা।

মালতী মুখ তুলে তাকালো স্যর-এর দিকে·· বললে—ও···সেটা···সে-বইখানার নাম 'আলোর ফসল!'

—হ্যাঁ, হ্যাঁ! স্যর বিদ্যুৎবরণ বলে উঠলেন—বইগুলোর নামও আপনি দেন দিব্যি···বইয়ের নাম শুনে কিছু বোঝা যায় না তার মধ্যে কি আছে! তাই তো চাই! সেকালে বইয়ের নাম ছিল একখানার দুর্গেশ-নন্দিনী, আর একখানার নাম কৃষ্ণকান্তের উইল। নাম শুনেই বোঝা যায়, একটাতে আছে কোন্‌ দুর্গওয়ালার মেয়ের কেচ্ছা···আর একখানাতে আছে উইল নিয়ে ফ্যাশাদ হাঙ্গামা!···আপনি নাম দিয়েছেন 'আলোর ফসল'—নাম শুনে চমকে উঠতে হয়! আলোর আবার ফশল কি রে, বাবা ? ফশল হয় জানি, ধান চাল ডাল—আখ, আলু পটল—কপি, কলাইশুঁটি—আপনি বইয়ের নাম দিলেন—আলোর ফসল! নাম শুনে পড়তেই হবে—আলোর আবার ফসল কি রকম! হা হা হা—একেই বলে বিজনেসের মাথা।

স্যর বিদ্যুৎবরণ যত তারিফ করছেন, অবনী ততই চমকে উঠছে··· কেঁচো খুঁড়তে খুঁড়তে কখন ফোঁশ্‌ করে সাপ বেরুবে, অবনীর ভয়। স্যর বিদ্যুৎবরণের কথার মাঝে একটু ফাঁক পেলেই সে তার হাতঘড়ির দিকে তাকায়···আর চেয়ার ছেড়ে ওঠবার চেষ্টা করে—এবারে আমি···মানে···

স্যর তাকে ধরে বসান···বলেন—কাজ তো রোজ আছে···একদিন একটু তোমার রীডারদের সঙ্গে কথা কওয়া···এতে নতুন লেখায় ইনস্পিরেশন পাবে গো, স্বপনবাবু। তা যে বই লিখছেন, এটার কি নাম দিলেন ?

—এটার! অবনীর কপালে দরদর ধারে ঘাম। সে বললে—হ্যাঁ,

এটার নাম···মানে, দু-চারটে নাম লিখে রেখেছি···তার মধ্যে পাবলিশার যে নামটাকে লাগসৈ মনে করে।

—বটে! স্মিত বিদ্যুৎবরণ হাসলেন···হেসে বললেন—তবু কি-কি নাম, শুনি···আমরাই যদি নাম বাত্‌লে দিই—কি বলো, মালতী?

মালতীর লজ্জার মাত্রা কতক কমেছে। সে এখন মাথা তুলে বসেছে এবং দুজনের কথা শুনছে অবনীর পানে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে। বিদ্যুৎবরণের কথায় মালতী বললে—হ্যাঁ, বলুন না নামগুলো। আমরা শুনি···তার মধ্যে কোন্‌টাতে বই পড়বার আগ্রহ হয় আমাদের বেশী···

অবনী কি বলবে! তার ঠোঁট কাঁপছে···গলা শুকিয়ে কাঠ··· কোনোমতে সে বললে—মানে, একটা নাম···

মনে পড়লো মালতীর সদ্য গাওয়া গানের বাণী—কিন্তু এ তো একটা··· আরো তিনটে নাম চাই। রবীন্দ্রনাথের গানের লাইন ভাবতে লাগলো। মালতী ঠায় চেয়ে আছে অবনীর দিকে···বিদ্যুৎবরণও। মালতী বললে —কি এত ভাবছেন?

অবনী বললে···কণ্ঠ বেশ অপ্রতিভ···অবনী বললে—না, আমি ভয়ানক ভুলে যাই···লিখতে লিখতে প্লটের খেই হারিয়ে যায়···লেখা কাপি দেখে তবে খেয়াল করতে হয়।

—ভারী মজার তো! সহাস কণ্ঠে মালতী করলে মন্তব্য।

অবনী বললে—হ্যাঁ, বলেন কেন? এত বেশী লিখি···একসঙ্গে তিন-চারখানা নভেল লিখি···পাবলিশারদের তাগিদে।

—হুঁ! মালতী বললে—যাক, এ-বইয়ের নামগুলো?

নিষ্কৃতি নেই! কোনোমতে যে-নাম মনে আসে, এক-নিশ্বাসে অবনী বললে—একটা নাম 'প্রাণের সুধা'···আর একটা নাম 'পথ চলিতে'···আর একটা—ও হ্যাঁ, 'সুদূরের পিয়াসী'···আর একটা 'শূন্য গগনবিহারী'!

বাপ্, যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়লো! পকেট থেকে রুমাল বার করে অবনী মুছলো কপালের ঘাম।

মালতী বললে—আপনাদের লেখা পড়তে পড়তে কেবলি মনে হয়, আপনারা আশ্চর্য্য জগতের মানুষ—যেন আমাদের মতো নন্! আপনারা চলছেন-ফিরছেন, খাচ্ছেন-দাচ্ছেন, বসছেন-দাঁড়াচ্ছেন—মনের মধ্যে কল চলেছে···সে-কলে কত ঘটনা, কত রকমের মানুষজন তৈরী হচ্ছে! সত্যি···আচ্ছা, এত পারেন কি করে?

—ভেবে···ভে-ব্-বে! কোনোমতে অবনী দিলে জবাব।

তারপর আরো দুঘণ্টা যে করে কাটলো···অবনীর মনে হচ্ছিল, রামায়ণে পড়েছে—সীতার অগ্নিপরীক্ষা···সে-পরীক্ষা এত শক্ত ছিল না। ধূ ধূ আগুন জ্বলে···চকিতে সে-আগুনে সীতার পরীক্ষা শেষ—আর অবনীর এ-পরীক্ষা···

হিমাদ্রির উপর রাগ যে-রকম হচ্ছিল—অবনী ভাবছিল, তাকে যদি সামনে পেতুম···

সামনে পেলে কি যে করতো অবনী, জানে না—তবে বেশ সাংঘাতিক রকম কিছু ··

রাত আটটায় বিধাতা সদয় হলেন। স্যর বললেন মালতীকে—এবারে খাওয়া যাক···বয়কে বলেছি, আটটায় ডিনার। কি কি খাওয়াবে, বলে দিয়েছি। তুমি একবার ওঠো—উঠে ব্যবস্থা ছাখো।

মালতী উঠে বাঙলোর দিকে গেল। অবনী বললে—একটু ঘুরে আসি···বেশ জ্যোৎস্না আছে···নদীর পাড়ে ঐ ঝাউগাছগুলোর ওদিকে।

বিদ্যুৎবরণ বললেন—ছাখো, এখান থেকে কোনো মেটিরিয়াল—কেমন?

—আজ্ঞে, হ্যাঁ!

অবনী চলে গেল।

তার পর খাওয়া-দাওয়া···খেতে খেতে বিদ্যুৎবরণ বললেন—আমাদের ওখ'নে এসো, স্বপনবাবু। কবে আসছো, বলো? আমরা এখন মাসখানেক কলকাতাতেই থাকবো—তার পর ইচ্ছা আছে, সাউথ ইণ্ডিয়ায় টুরে বেরুবো।

মালতী বললে—সামনের শনিবার আসুন সন্ধ্যার সময়···রাত্রে ঐখানেই খাওয়াদাওয়া হবে···আরো দু-চারজনকে বলবো। তাঁরা আপনার সঙ্গে আলাপ হলে খুশী হবেন! কেমন, আসছেন তো?

অবনীকে বলতে হলো—আসবো।

সে ভাবলো, যাবার আগে ঐ স্বপন বিশ্বাসের লেখা 'লাল ঘুনশী', 'ছেঁড়া নাগরা'—এমনি কি কি নভেল আছে, দু-চারটে পড়ে নেবে—আসরে ব্যাভ্রম না ঘটে!

চার

যাঁরা বলেন, নাটক-নভেলে যে-সব কথা লেখা হয়, তেমন নাকি আমাদের সত্যকার জীবনে সত্য নয়··অর্থাৎ নাটক-নভেলে যেমন ঘটনা ঘটে, আমাদের সত্যকার জীবনে তা ঘটে না! এবং এর দৃষ্টান্ত দেখিয়ে তাঁরা বলেন, নাটকে নভেলে দেখি, গরীব দুঃখীর উপর নাটকের ধনী নায়ক-নায়িকার এমন বেশী মমতা হয় যে সে-মমতার বশে নায়ক করে গরীবের পুঁটি মেয়েকে বিয়ে এবং ধনীর দুলালী নায়িকা পথ থেকে গরীব দুঃখীকে বাড়ীতে এনে চেয়ার-টেবিলে বসিয়ে তাকে খাওয়ায় চপ কাটলেট, খাওয়ায় স্যুপ, আর পুডিং—এবং কোনো কোনো নায়িকা নাকি সে-গরীবকে ভালোবেসে বাপের রাগ মাথায় বয়ে বাপের অতুল সম্পত্তির তোয়াক্কা না রেখে বিলাস-ভূষণ

ত্যাগ করে সে-গরীবকে বিয়ে করে তার জীর্ণ কুটীরে গিয়ে সুখের সংসার পাতে—তাঁরা বলেন, সত্যকার জীবনে এমন পাগলামি কেউ করে না! আমি কিন্তু তাঁদের এ কথা মানি না! যেহেতু আমি আমার দীর্ঘ জীবনে এমন বহু ব্যাপার দেখেছি, কিন্তু তার ইতিহাস বিবৃত করে কেন আর বোঝা ভারী করি! যাঁরা ঐ অমন কথা বলেন তাঁদের কথা যে খাঁটি নয়, তার প্রমাণ মিলবে আমাদের এই অবনীর ব্যাপারে! অর্থাৎ স্যর বিদ্যুৎবরণের এবং লেডি মালতীর সঙ্গে আচমকা ডায়মণ্ড হার্বারের ডাক বাঙলোয় সেই দেখা-শুনার পর অবনীর জীবনে যা ঘটেছিল, হয়তো কোনো এ্যাওয়ার্ড পাওয়া ঔপন্যাসিকও তেমন ঘটনার কথা তাঁর উপন্যাসে লিখতে সাহস করতেন না। কিন্তু আমি উপন্যাস লিখছি না, আমি লিখছি অবনীর জীবনের সত্য ঘটনার কথা—কাজেই যা ঘটেছিল, আমি তাই লিখছি।

অর্থাৎ ডায়মণ্ড হার্বারের ও-ঘটনার দুদিন পরে অবনী ফিরছিল শেয়ালদা ষ্টেশন থেকে তার টু-শীটারে। সে শেয়ালদা ষ্টেশনে গিয়েছিল পিসিমাকে আর গঙ্গাপদকে ট্রেনে তুলে দিতে—তাঁরা গেলেন কৃষ্ণনগরে রাস দেখতে। টু-শীটার চালিয়ে অবনী আসছে ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট ধরে পশ্চিম মুখে।

ওয়েলিংটন স্কোয়ারে খুব ভিড়, খুব মিটিং চলেছে, পথে গাড়ীর ভিড় —অবনীর গাড়ী চলেছে ধীরে ধীরে। হঠাৎ গেরুয়া আলখাল্লা পরা দাড়ি-ওয়ালা এক ভদ্রলোক ভিড়ের ভিতর থেকে যেন ছিটকে বেরিয়ে এলো··· এলো অবনীর গাড়ীর পাশে···ডাকলো—অবনী! ও! তুমি তাহলে কলকাতায় আছো?

—হ্যাঁ। বলে অবনী দুচোখের সন্ধানী দৃষ্টিতে ভদ্রলোকের মাথায় লম্বা চুল, মুখের দাড়ি-গোঁফ এবং গেরুয়া আলখাল্লাটা বেশ করে দেখলো—না, চিনতে পারে না!

ভদ্রলোক হাসলো···হেসে বললে—চিনতে পারছো না? আমি হিমাদ্রি।

হিমাদ্রি! অবনী চমকে উঠলো—গাড়ীখানাকে ফুটপাথের ধারে এনে থামালো···হিমাদ্রি এলো কাছে···গাড়ীর কাছে।

অবনী বললে—ক'মাসে দাড়ির জঙ্গল গজিয়ে তুলেছো মুখে! ব্যাপার কি?

—আছে। তোমার ওখানে আসবো আজ রাত্রে আটটা নাগাদ··· দেখা হবে তো?

—হবে। আমার ওখানেই রাত্রে খাওয়া-দাওয়া করবে···সেখানেই রাত্রে থাকবে। কেমন?

কপালটা কুঁচকে হিমাদ্রি বললে—খাবো···তবে না, রাত্রে থাকা হবে না! আমাকে সঙ্ঘে ফিরতে হবে।

—সঙ্ঘ! ও, কাশীর সেই গোস্বামীজী?

বাধা দিয়ে হিমাদ্রি বললে—বলবো···রাত্রে যখন যাবো। আচ্ছা আসি—বক্তৃতা দিতে হবে আমাকে।

হিমাদ্রি আর দাঁড়ালো না—চলে গেল।

অবনী দেখলো, হিমাদ্রি গিয়ে ঢুকলো স্কোয়ারে। ভাবলো, বক্তৃতা! ঐ আলখাল্লা, মাথায় বড় বড় চুল, মুখে একরাশ দাড়ি-গোঁফ—আশ্রমের কাজে সাধনা! কিন্তু হিমাদ্রি দেশ বা ধর্ম্ম—সে সবের সাধন-ভজনের ধার ধারে না। তার জীবনে একটি লক্ষ্য—রূপসী তরুণী দেখলে প্রেমে পড়া! কিন্তু প্রেমে পড়লে মানুষ নিজেকে সভ্যভব্য করে—এমন চুল-দাড়ি নিয়ে আলখাল্লা পরে যা-তা মূর্ত্তি গ্রহণ করে না! বললে, বক্তৃতা দেবে! কিসের বক্তৃতা?

রহস্য! যাক, রাত্রে ও আসছে—বললে, তখন বলবে সব কথা।

মনে অদম্য কৌতূহল এবং এই কৌতূহল নিয়ে যে করে তার বেলা কাটলো··

রাত্রি আটটা···কাঁটায় কাঁটায়···হিমাদ্রি এসে হাজির। এলো ট্যাক্সিতে। ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে ভিতরে প্রবেশ—সেই বেশ···আলখল্লা-পরা মূর্ত্তি।

অবনী করলো অভ্যর্থনা—এসো।

হিমাদ্রি এসে বসলো।

অবনী বললে—কিসের কৃচ্ছ্রসাধনা চলেছে, হিমাদ্রি ?

—বলবো, ভাই—ইট ইজ এ হিষ্ট্রী !

—হিষ্ট্রী অফ ষ্ট্রাগ্‌ল্ ? অর সাকসেশ ?

—বলো কেন ! আমার যা ভাগ্য !

এইটুকু বলে হিমাদ্রি ফেললো একটা নিশ্বাস।

অবনী বললে—চা, কোকো, কফি ··কি খাবে বলো ?

—কোকো আর দু একটা মিষ্টি···খিদে পেয়েছে। মিটিং চুকলো প্রায় সাতটায়···তারপর প্রোসেশন করে নিজেদের আস্তানায় ফেরা··সেই গোবাবাড়া—ফিরে আর বসিনি। তোমাকে টাইম দিয়েছি, আটটা। ট্যাক্সি নিয়ে সোজা চলে এসেছি।

কোকো এলো, সন্দেশ-রসগোল্লা এলো। সেগুলোর সদ্ব্যবহার করে তার পর—

হিমাদ্রি যে-কথা বললে, রোমান্সের আর এক পর্ব্ব।

অবনী বললে—গোস্বামীজীর সেই কন্যা···মৃণ্ময়ী ? না, চিন্ময়ী ?

হিমাদ্রির দুচোখ হলো উচ্ছ্বসিত। সে বললে—তোমার মনে আছে নাম ? মৃণ্ময়ী নয়। চিন্ময়ী !

—এবার তাঁর পালা ?

—পালা ! তার মানে ? তুমি তামাসা করছো ! ভাবছো, খেলা··· সখ ?

হেসে অবনী বললে—না। তবে আশ্চর্য্য হচ্ছি, এতকাল ধরে এখনো চিন্ময়ী ! ইতিমধ্যে বহু ময়ীর উদয়াস্ত চলবার কথা ! তোমার আগাগোড়া যা দেখছি শুনছি—

দুঃখে বিগলিতপ্রায় হয়ে হিমাদ্রি বললে—না ভাই, বিশ্বাস করো। আমার এ সখ নয়···যা হয় তাই বলি ! তবে চিন্ময়ী দেবী—হুঁ, আমি এতটুকু আভাস পাচ্ছি না—অথচ আমার এমন হয়েছে, একদণ্ড তাঁর কাছ ছাড়া হতে পারি না। কি বলো ! ওঁদের সঙ্ঘের নিয়ম বলে মাথার চুল কাটিনি। সেই তোমার সঙ্গে কাশীতে যে দেখা, সেই সময় থেকে দাড়ি গোঁফ কামাইনি। আর বক্তৃতা—যা বুঝি না, যা ভাবি না···ওঁরা কতকগুলো প্যাম্ফলেট দিয়েছেন, সেগুলো মুখস্থ হয়ে গেছে—সেই কথা তারস্বরে বলে যাই। বক্তৃতা করে আসছি কাশী থেকে কলকাতায়··· এদিককার কোনো শহর বাদ যায়নি। কলকাতায় এসেছি বালী-উত্তরপাড়া থেকে।

বাধা দিয়ে অবনী বললে—এতখানি কৃচ্ছ্রসাধনা···ঐ চিন্ময়ী দেবীর জন্যই তো ?

—তা নয় তো কি ! বিশ্বাস করবে, যদি বলি ওঁর দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে আর কোনো মেয়ের দিকে চেয়েও দেখিনি এতকাল। ওঁর বিউটি, ওঁর চার্ম আনপারালেল্ড্ !

অবনী বললে—যাক, আমার সঙ্গে কথা—

—হ্যাঁ। হিমাদ্রি বললে—তোমার পরামর্শ···জানো তো আমি কি রকম ভ্যালু করি !

অবনী বললে—কিন্তু আমার এমন বরাত যে, তোমার প্রেমের ব্যাপারে একটু সুরাহা আমি করতে না করতে তুমি এ-ঘাট থেকে ও-ঘাটে তোমার চিত্ত-নৌকা নিয়ে যাও! বরাবর দেখে আসছি, সেই বনশ্রী থেকে তার পর কাশীতে সদাশিব হালদার মশায়ের কন্যা পূর্ণিমা···

হিমাদ্রির মুখে কথা নেই···সে একাগ্র নয়নে তাকিয়ে আছে অবনীর দিকে। অবনী মনে মনে হাসলো···তার পর বললে—তোমার মস্ত দোষ কি জানো?

হিমাদ্রি যেন চমকে উঠলো! সে বললে—কি দোষ?

অবনী বললে—তুমি ভালোবাসতে যতখানি তৎপর···মানে, তেমন-তেমন দেখলেই তোমার লভ এ্যাট ফার্ষ্ট সাইট—তেমনি যদি একটু সাহস করতে পারতে।

হিমাদ্রি যেন কোন্ স্বপ্ন-সায়রে ভাসছে! তেমনি স্বপ্নাতুর কণ্ঠে সে বললে—কিসের সাহস?

অবনী বললে—মুখ ফুটে মনের কথা বলবার সাহস! জানো তো, ডি, এল, রায় মশায় তোমাদের মতো লাভারদের সম্বন্ধে সেই কোন পঞ্চাশ বছর আগে একটা কথা লিখে গেছেন! পঞ্চাশ বছর আগেকার কথা হলে কি হবে—ইট ইজ দী ট্রুথ এ্যাণ্ড ইটার্নাল ট্রুথ।

—কি কথা তিনি লিখে গেছেন?

অবনী বললে···তার দুচোখে সস্মিত হাসি···অবনী বললে—তিনি লিখে গেছেন, যখন মুখ ফুটে বললে চুকে যায় উভয়পক্ষের সকল ল্যাঠা! বুঝলে?

—হুঁ! হিমাদ্রি দারুণ চিন্তাগ্রস্ত···তার পর নিশ্বাস ফেলে বললে—কেমন ভয় করে! তার কারণ, নাটক-নভেলে নায়ক ফশ্ করে বলে ফেলে···কিন্তু বাস্তব জগতে···মানে, ইন রিয়াল লাইফ—মনে হয়, যদি

ফোঁশ করে ওঠে! তাছাড়া আমার কেমন ব্যাধি···একজনের কথা ভেবে ভেবে আকুল হচ্ছি, বলতে পারছি না মনের কথা···এমন সময় আর একজনকে দেখলে ব্যস্, তখন যেন নিশ্বাস ফেলতে পারি! তখন মনে হয়, ওকে বলতে পারছি না···একে হয়তো বলতে পারবো। মানে, নতুনের দিক থেকে যেন কেমন একটা···কি যেন আভাস পাচ্ছি মনে হয়! কিন্তু এক্ষেত্রেও সেই মেল্টিং পয়েন্ট পর্যন্ত আসি···তার পর ভয়···বলা আর হয় না!

হেসে অবনী বললে—এমনি ভয়ে ভয়ে দিনের পর দিন শুধু যে হা-হুতাশ করছো···বলের মতো মনটা কেবলি গড়িয়ে গড়িয়ে চলেছে! এ রোলিং ষ্টোন···জানো তো, নেভার গ্যাদার্স মশ! অথচ বয়স বেড়ে কোথায় চলেছে···হুঁশ নেই! গ্রোইং ওল্ড—এর পর তোমার পানে কোনো নায়িকা একটি মৃদু কটাক্ষও পাত করবেন না যে!

হিমাদ্রি শিউরে উঠলো! ঠিক কথা! এদিকে তার খেয়াল নেই মোটে! মন···তার মনে হয়, এখনো চিরতরুণ আছে! কিন্তু দেহখানা—সত্যই তো, যৌবন যে দেহ থেকে সবে সরে চলেছে! তার বয়স এখন—

বয়সের হিসাব কষতে গিয়ে চঞ্চল হলো। হিমাদ্রি বললে—তাহলে বেশ, ভাই, আর ভয় নয়···এখন তুমি বলে দাও, চিন্ময়ী দেবীকে কি করে—

বাধা দিয়ে অবনী বললে—তাঁর দিক থেকে কোনো আভাস-ইঙ্গিত—

হিমাদ্রি ভাবলো···ভেবে সে বললে—কখনো মনে হয়, বুঝি উনিও! আবার কখনো দেখি, না···শী ডাস্‌ন্ট কেয়ার!

—কিসে এমন মনে হয়? ইনষ্টান্সেস?

হিমাদ্রি বললে—এই কালকের কথা বলি। সকালে আমরা গিয়েছিলুম পাণিহাটিতে···একটা লেকচার ছিল—ফিরলুম বেলা প্রায় দুটোয়। ফিরে আমি বেশ টায়ার্ড ফীল করছিলুম···নিজের ঘরে বিছানায় শুয়ে পড়েছিলুম। হঠাৎ চিন্ময়ী দেবী এলেন···সাজ-পোষাক···মানে, একটু র‍্যাদার—অর্থাৎ মাথার চুলগুলি এলানো, শাড়ী-সেমিজ পরা, কিন্তু গায়ে ব্লাউশ নেই—অর্থাৎ আলুথালু বেশ! এসেই আমার পাশে শুয়ে পড়লেন···বললেন, মাথাটা ধরেছে—যদি একটু মেশাজ করে দ্যান! আমি চমকে উঠেছিলুম। সাচ এ্যালিউরিং মূর্ত্তি, এতখানি ফ্যামিলিয়ারিটি—মাথা টিপে দিতে লাগলুম। উনি আমার হাতখানা চেপে চেপে ধরছিলেন—বেশ আবেগে! আমার রগ শুদ্ধ ঝনঝন করতে লাগলো···ভাবলুম, বলে ফেলি! বললুম, একটা কথা বলবো? রাগ করবেন না তো? চিন্ময়ী দেবী আমার পানে যে-চোখে চাইলেন, দৃষ্টিতে আবেশ—বুঝচো! বললেন, না, রাগ করবো কেন? বলুন। ভেবেছিলুম, নিজের হৃদয়ের কথা বলবো···কিন্তু কেমন বেধে গেল—বললুম, আপনার এত কষ্ট হয়···সত্যি, এমন করে নিজেকে জখম করছেন! যদি কিছু মনে না করেন—মানে, নিজের মনের দিকটা —এই পর্য্যন্ত যেমন বলেছি, উনি উঠে বসলেন···আমার পানে চাইলেন··· মাথার চুলগুলি এলানো—মানে, যাকে বলে, অসম্বৃত বেশ। কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় এক ব্যাটা আমাদের দলে থাকে—কমরেড মাদ্রাজী—পিলে নাম, বড়লোক, এঁদের ফণ্ডে মাসে পাঁচশো করে টাকা দেয়···সে ব্যাটা এসে উপস্থিত। তাকে দেখে চিন্ময়ী দেবী যেন লাফিয়ে উঠলেন—বললেন, ও···ইউ হ্যাভ কাম। বলেই পিলের হাত ধরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

কথাটা এইখানে শেষ করে হিমাদ্রি মস্ত একটা নিশ্বাস ফেললো।

অবনী বললে—পিলের বয়স?

—আমাদের বয়সী। এর সঙ্গে চিন্ময়ী দেবীর একটু বেশী ইণ্টিমেসি। আমার ভয় হয় পিলের জন্য আরো!

—ওসমান! হেসে অবনী করলো মন্তব্য।

—মনে হয়! চেহারা ভালো নয় কিন্তু—ওর পাশে আমি প্রিন্স!

অবনী বললে—চেহারা কিছু নয়। এই সব পার্টি-গ্রুপের মেয়েরা… বুঝলে, আমার মনে হয়, এদের হৃদয়ের আবেগ নির্ভর করে টাকা-পয়সার উপর। চাঁদের জন্য যেমন নদীতে জোয়ার-ভাঁটা, সব পার্টির সুন্দরীদের মনের আবেগ তেমনি টাকা-পয়সার উপর!

—আমার তাই মনে হয়! কাজেই বুঝচো—

অবনী বললে—অন্য বন্দর পেয়েছো?

—তার মানে?

—মানে…অবনী বললে—নেক্সট বিউটি! পেয়েছো কারো দর্শন?

—না। কি করে পাবো? এদের দলে এমন নাক-মুখ গুঁজে পড়ে আছি…দুনিয়ার কোনো দিকে চাইবো কখন?

অবনী বললে—যা শুনলুম, চিন্ময়ী দেবী তাহলে রহস্য!

হিমাদ্রি বললে—আমার মনে হয়—আমার যদি টাকা থাকতো, মানে, কলকাতার মানুষ…একখানা মোটর অন্ততঃ থাকতো! তাহলে…

অবনী বললে—উনি সিনেমা-টিনেমা দেখেন?

—না! হিমাদ্রি বললে—বলেন চীপ্ এ্যাণ্ড ভালগার। তবে ভদ্র নর-নারীর কোনো শো যদি হয়…তা সে যত লক্ষ্মীছাড়াই হোক…বলেন, কালচারাল ডেভেলপমেণ্ট…সে শো দেখতে যান। এই যে একএকটা দল মাটি ফুঁড়ে উঠে বিলিতি পাড়ায় ষ্টেজ নিয়ে নাচগান, নাটক অভিনয়ের ব্যবস্থা করছে—সেগুলোর দিকে বেশ টান আছে! এই তো দিন আষ্টেক আগে নিউ এম্পায়ারে প্যালারাম সম্প্রদায় করলো রবীন্দ্রনাথের

'মায়ার খেলা'র শো। গিয়েছিলেন—আমি, ঐ পিলে, আরো দু'চার-জন গিয়েছিলুম। পিলে কিনেছিল পাঁচ টাকা করে ক'খানা টিকিট। কী লক্ষ্মীছাড়া শো! তবু উনি মশগুল—বলেন, কালচারাল্ শো! কিন্তু তুমি এ-কথা তুললে যে?

অবনী বললে—সিনেমাটা এ-যুগে মস্ত চার্ম জাগায়! তাহলে আশা—

নিশ্বাস ফেলে হিমাদ্রি বললে—আমার মতো হতভাগা পৃথিবীতে আর দেখেছো? বলো?

হেসে অবনী বললে—পৃথিবীর কতটুকুই বা দেখেছি যে এ-কথা বলবো! তবে হ্যাঁ, আমি বলি, তোমার কোষ্ঠী থাকে যদি তো সেটা কোনো জ্যোতিষীকে দেখাও গিয়ে—তোমার পত্নীস্থানে রাহু? না, বৃহস্পতি?

—ধেৎ! বিরক্তিভরে হিমাদ্রি বললে—আমি ও কোষ্ঠী-টোষ্ঠী মানি না, ভাই!

হঠাৎ বাহিরে একখানা ট্যাক্সি থামলো। দুজনে হলো উৎকর্ণ—শোনা গেল দুজনের কণ্ঠ···মিহির আর গৌরী!

তাই। দুজনে এলো। মিহির বললে—দেখা হয়ে গেল···বা! তা হ্যাঁ অবুদা, আমাদের নতুন ছবির মহরৎ কাল—যেতে হবে—কার্ড এনেছি।

একখানা ছাপানো কার্ড দিলে গৌরী অবনীর হাতে। দিয়ে গৌরী বললে—আমরা তুলছি পৌরাণিক ছবি··কালিদাসের কুমারসম্ভব! আমি সাজছি রতি, দাদা সাজছে মহাদেব। আর সেই যে-মেয়েটিকে দেখেছো, সে সাজছে পার্ব্বতী।

—রতি! অবনী বললে—নাচবে?

—নাচবোই তো! নাচের এখন খুব আদর। এলাহাবাদে আছে শঙ্করীপ্রসাদ···খুব ভালো নাচিয়ে—তাঁকে আনিয়ে তাঁর কাছ থেকে

নাচ শিখবো। যে-নাচ দেখিয়ে দেবো···হুঁ, ফিল্ম-ওয়ার্ল্ড চমকে উঠবে!

অবনীর কি মনে হলো, সে বললে—আর একখানা কার্ড দাও। ইনি আমার বাল্যবন্ধু···হিমাদ্রি—এ সব দিকে এঁর বেশ টেষ্ট আছে। এঁকেও আমি সঙ্গে নিয়ে যাবো।

—ও···বেশ! দী মোর দী মেরিয়ার: এ-কথা বলে গৌরী দিলে আর একখানা কার্ড হিমাদ্রির হাতে···বললে—আসা চাই নিশ্চয়!

হিমাদ্রি ধন্যবাদ দিয়ে বললে—আসবো।

অবনী বললে—ইনি হলেন কংগ্রেসের মস্ত একজন ওয়ার্কার। ভারতে প্রভিন্সিয়ালিজ্‌ম্ ঘুচিয়ে ঐক্য সাধনের কাজ করে বেড়াচ্ছেন। মিনিষ্ট্রীতে ঢোকবার লাল্‌চ্ নেই—স্রেফ ব্রতপালনের কাজ।

মহরতের দিন হিমাদ্রিকে নিয়ে অবনী চললো ষ্টুডিয়োয়। বললে—ছাখো, ওখানে যদি হার্টস্ নিউ ফাইণ্ড মেলে—বহু জনসমাগম হবে তো।

আলাপ হলো অনেকের সঙ্গে—কজন সৌখীন মহিলা, সৌখীন ভদ্রলোকের সঙ্গে।

ফেরবার পথে অবনী বললে—হৃদয়ে কাকেও পেলে?

হিমাদ্রি বললে—পাগল হয়েছো! কোমর বেঁধে লাগলে হৃদয়চর্চ্চা হয় কখনো? ইট্ কাম্‌স্ স্পনটেনিয়স্ এ্যাণ্ড উইদাউট ওয়ার্নিং!

হেসে অবনী বললে—যা বলেছো! সেই গান আছে, প্রেম কি যাচ্‌লে মেলে! সে যে হয় আপনি উদয় শুভযোগ পেলে।

স্যর বিদ্যুৎবরণ এবং লেডি মালতীর নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যেতে হলো অবনীকে! যাবার হেতু ছিল, যদি হিমাদ্রির আর্থিক সংস্থান সম্বন্ধে কিছু

করতে পারে! গেল সচেতন হয়ে—বইয়ের দোকানের ক্যাটালগ দেখে স্বপন বিশ্বাসের লেখা বইগুলোর নাম মুখস্থ করে।

আরো দু-চারজন অতিথি এসেছেন। তাঁদের সঙ্গে স্যর দিলেন অবনীর পরিচয় করিয়ে--মস্ত বড় নভেলিষ্ট, স্বপনবাবু—এঁর বই পড়েই আমি বুঝেছি, লাইফটা কি! হা হা হা!

এঁদের সঙ্গে সাবধানে অভিনয় করলো অবনী। তারপর বিদায় নেবার সময় অবনী বললে স্যরকে—আমার লেখা আপনার যদি সত্য এত ভালো লাগে—মানে, আমার লেখায় আপনাকে যদি যথার্থই আনন্দ দিয়ে থাকি, তাহলে আমার সামান্য একটি প্রার্থনা আছে—সে-প্রার্থনাটুকু দয়া করে যদি মঞ্জুর করেন!

স্যর বললেন—কি এমন প্রার্থনা?

মালতীর দু-চোখের দৃষ্টিতে কৌতূহল···মালতী বললে—হ্যাঁ, সত্যি?

অবনী বললে—আমার বন্ধু, আপনার ভাইপো হিমাদ্রি···বেচারী কষ্ট পাচ্ছে। তার কারণ বোনেদী ঘরের ছেলে, চাকরির জন্য যার তার সামনে গিয়ে দাঁড়াতে পারে না—মানসম্ভ্রম আছে। আমার সঙ্গে সেদিন হঠাৎ দেখা হলো একটা মিটিংয়ে—অর্থকষ্ট। বললুম, আপনার সঙ্গে দেখা করতে—তাতে বললে, না—ওঁর কাছে, মাসির কাছে অপরাধী! যদি তাঁরা রাগ করেন! আমি বললুম, পাগল! তুমি আপনজন—তাঁদের দেখবে শুনবে ছেলের মতো···তা, যদি বলো—

স্যর বললেন—এত কিসের তেজ! আমি বলেছিলুম, বিয়ে-থা করুক, ইনিও বলেছিলেন···তা নয়!

অবনী বললে—তাহলে তাকে বলবো? আর আপনার ফার্মে তার চাকরি—মানে, সে পোজিশন—

—হ্যাঁ, সে-পোজিশন ঠিক আছে। স্যর বললেন—তবে হী মাষ্ট একনমাইজ, মাষ্ট নট বী এ প্রডিগাল। কারণ, দিনকাল যা পড়েছে, প্রত্যেকের একনমিকাল হওয়া দরকার। আর তার বিবাহের কি হলো?

মালতী বললে—বলবেন, বৌ নিয়ে আসবে। এ-বাড়ীর বৌ তো—আমার পরে তার বৌয়ের এ-বাড়ীতে সেম্ পোজিশন্!

—বলবো।

পাঁচ

কদিন পরে...

কোথায় হিমাদ্রি? অবনীর মন তুললো হুঙ্কার—ষ্টুপিড! খুড়ো সদয় হয়েছেন, তাঁকে মেনে চ', তাহলে তোর এ-দুর্দ্দশা থাকবে না! হতভাগা! একালের এই সব ময়ূরপুচ্ছ-আঁটা মেয়েদের পিছনে ঘোরো—বোঝো না, আমাদের এ বাঙলা দেশটাও পাশ্চাত্য জগতের মতো কন্‌শস্ হয়ে উঠেছে! স্বাধীনতা পাবার সঙ্গে সঙ্গে সকলে বুঝেছে সেই সার কথা—Money, brighter than sunshines, sweeter than honey! ব্রত! ওরে গাধা! এসব ব্রত. পার্টি—এগুলো মীন্স টু এণ্ড্‌স্! সকলের মাথার উপর দিয়ে-দিয়ে নিজেকে উঁচু মাচায় তোলবার সোপান। মনে পড়লো বঙ্কিমচন্দ্রের সেই অমর বাণী। 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাস শেষ করে বঙ্কিম লিখে গেছেন—যাও প্রতাপ সেই অনন্তধামে—সেখানে লক্ষ শৈবলিনী তোমার পদপ্রান্তে—না, এমনি কথা যেন! অবনী ভাবছিল, বলবে, শোনো হিমাদ্রি, আগে টাকার মাচা তৈরী করে তাতে চড়ে বসো—তখন দেখবে, একটা নয় দুটো নয়—ঝাঁকে ঝাঁকে কত চিন্ময়ী দেবী তোমার জন্য আকুল হয়ে ছুটে আসবে! লক্ষ পিলে কোনো-কিছুতে তাদের লক্ষ্যভ্রষ্ট করতে পারবে না।

কিন্তু মিথ্যা এসব চিন্তা! হিমাদ্রি হয়তো এখন চিন্ময়ী দেবীকে ত্যাগ করে কোন্ হিরণ্ময়ী, কি, কিরণ্ময়ীর জন্য···

হৈ-হৈ কলরব তুলে পিসিমা এলেন বাড়ী ফিরে—সঙ্গে শুধু গঙ্গাপদ নয়—অবনী দেখে, কাশীর বিন্দুবাসিনী দেবী, পূর্ণিমা এবং পূর্ণিমার সেই গোদা বোকা ভাই।

বিন্দুবাসিনী বললেন—চমকে উঠেছো তো বাবা, আমরা হঠাৎ কোথা থেকে!

অবনী কি বলবে, সে সবিস্ময়ে চেয়ে আছে তাঁদের পানে।

হেসে পূর্ণিমা বললে—জ্যাঠাইমা আমাদের ওখানে গিয়েছিলেন, কদিন ছিলেন ওখানে। তারপর আমাদের ধরে নিয়ে এলেন!

পিসিমা বললেন—মেয়ের বিয়ে দিতে এসেছে···তা কলকাতা ছেড়ে কোন্ বালী-উত্তরপাড়ায় বসে আছে। কলকাতাতে পাত্র বলে, গাঁদি হয়ে ঝুলছে। কলকাতায় সন্ধান করতে হবে—তাই নিয়ে এলুম। কি বলিস অবু, ভালো করিনি?

অবনী বললে—নিশ্চয়! কিন্তু পিসিমা···

পিসিমা বললেন—কিন্তু কিসের?

অবনী বললে—এখন পাত্র সন্ধান করতে হলে ঘটক-ঘটকী লাগালে চলবে না। পাত্রপাত্রীরা এখন বুঝদার হয়েছে দেখি। শুনতেও পাই··· ম্যাট্রিমনিয়াল পোর্টফোলিয়ো তারা এখন নিজেদের হাতে নিয়েছে।

কথাগুলো পিসিমা বুঝলেন না, তিনি অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন অবনীর দিকে।

হেসে অবনী বললে—মানে, মেয়েরা এখন স্বয়ংবরা হচ্ছে—ছেলেরাও তাই। তার উপর জাতিভেদ উঠে গেছে—সবর্ণ-অসবর্ণ বিয়ে, মন্ত্রছাড়া

া-করা বিয়ের চলন হয়েছে। তা পূর্ণিমাকে এখানে এনে ভালো করেছো! তবে বাড়ীতে বন্ধ করে রাখলে চলবে না। সেকালে সাবিত্রীকে যেমন তাঁর রাজাবাবা ছেড়ে দিয়েছিলেন—বর খুঁজে আনো, পূর্ণিমাকে তেমনি রোজ খাইয়ে দাইয়ে ছেড়ে দিতে হবে ক্লাবে, সিনেমায়, লেকে, মাঠে পাত্র সন্ধান করতে। চাকরি খোঁজাব মতো পাত্র খুঁজতে বেরুতে হবে।

বিন্দুবাসিনী হেসে উঠলেন। পিসিমা বললেন—শোনো কথা! তুই থাম বাপু, সব তাতে তোর ফোড়ন ভালো লাগে না।

পূর্ণিমার দিকে চেয়ে অবনী বললে—তুমি বুঝেছো, এ-যুগের বিয়ের বাজারের স্বরূপটা! এখন···

—বয়ে গেছে আমার ঘুরতে! বলে পূর্ণিমা একপাক ঘুরে সে-ঘব থেকে বেরিয়ে গেল।

দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর বিন্দুবাসিনী পাকড়াও করলেন অবনীকে··· বললেন—শোনো বাবা, তোমার ভরসাতেই এখানে আসা। পূর্ণিমার বিয়ের ব্যবস্থা তোমাকেই করে দিতে হবে। ওঁকে তো জানো, পাগল হয়ে আছেন—তা নয়, আমাকেও পাগল করে তুলবেন!

অবনী তাকালো তাঁর দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে।

বিন্দুবাসিনী বললেন—মেয়ে ডাগর হয়েছে, ওর বিয়ে দিতে হবে, তা যদি কখনো খেয়াল হবে। নিজের খেয়াল হবে না, আমরা খেয়াল করাতে গেলেও উনি হেসে উড়িয়ে দেবেন! আমি যে কি বিপদে পড়েছি, তুমিই বোঝো, বাবা! এখন যদি বিয়ে না দিই, এর পরে কবে আর বিয়ে হবে! এইটেই হলো মেয়েদের বিয়ের বয়স। এ-বয়স পার হয়ে গেলে কোন্ ভালো ছেলে বিয়ে করবে বলো? তখন দোজবরে

তেজবরে ধরতে হবে! তা তোমার বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যার হাতে পূর্ণিমাকে দিতে পারি?

অবনীর চট করে মনে পড়লো হিমাদ্রির কথা। হিমাদ্রি তো একদিন এই পূর্ণিমার জন্য পাগল হয়েছিল! সাহস হয়নি—তার কারণ, টাকার অভাব—আর ও-বাড়ীতে মাষ্টারী করছিল বলে! এখন যখন স্যর বিদ্যুৎবরণ স্পষ্ট ভাষায় আশা দিয়েছেন—ওকে পুরানো চাকরিতে বাহাল রাখবেন এবং তাঁর তরুণী ভার্য্যা মালতী-মাসিও তাতে সায় দিয়েছেন এবং স্যর বিদ্যুৎবরণ চান হিমাদ্রি বিবাহ করবে, তখন পাত্র হিসাবে হিমাদ্রি কেন না বরণযোগ্য হবে!

সে বললে—আপনার মনে পড়ে ছোট পিসিমা, খোকাকে পড়াতেন সেই হিমাদ্রিবাবু—কাশীতে?

বিন্দুবাসিনী বললেন—হ্যাঁ, কেন মনে পড়বে না?

—দেবেন তাঁর সঙ্গে বিয়ে? ছেলে ভালো, তার উপর ও হলো স্যর বিদ্যুৎবরণ এঞ্জিনীয়ার—তাঁর ভাইপো। বিদ্যুৎবরণের ছেলেমেয়ে নেই, বয়স হয়েছে বহুৎ···স্ত্রী আছেন—সম্প্রতি বিবাহ করেছেন বুড়ো বয়সে—ছেলেমেয়ে হবার সম্ভাবনা নেই। তাঁর অগাধ সম্পত্তি—সে-সম্পত্তির সিকি বখরাও যদি হিমাদ্রিবাবু পান, আরাম করে থাকবেন। তাছাড়া কাকার বড় ফার্মে হিমাদ্রিবাবু ম্যানেজার—মাসে মাসে মোটা টাকা পান—মাহিনা বলুন, আর এ্যালাউয়েন্সই বলুন।

বিন্দুবাসিনী এ-কথা শুনে ক্ষণকাল নিরুত্তরে চেয়ে রইলেন—অবনীর উপর নিবদ্ধ দৃষ্টি। তার পর একটা নিশ্বাস ফেলে বললেন—তুমি যদি মনে করো ভালো পাত্র, তাহলে কেন হবে না, বাবা? তবে মেয়ের মনটা জানা দরকার নয় কি?

অবনী বললে—আচ্ছা, সে-ভার আমার রইলো। পূর্ণিমাকে আমি জিজ্ঞাসা করে দেখবো! আমার উপর এ-ভার দিতে পারেন।

বিন্দুবাসিনী শুনলেন—শুনে খানিকটা নির্লিপ্ত ভাব দেখিয়ে বললেন—আমি যা ভেবেছিলুম, তা যদি হতো! ভাগ্য! ওঁর কি যে মনের ধারণা—সাধে বলি, পাগল সারাতে নিজেও পাগল হননি—আমাকেও পাগল করে তুলেছেন!

ঘণ্টা দুই পরের কথা…

দোতলার বসবার ঘরে অবনী বসে একখানা নভেল পড়ছে—পূর্ণিমা এলো—তার হাতে বেহালা। এসেই পূর্ণিমা ডাকলো—অবুদা…

অবনী বই থেকে চোখ তুলে তার পানে চাইলো…হেসে বললে—বীণারঞ্জিত হস্তে এসো দেবি…

পূর্ণিমা বললে—থাক, রসিকতা করতে হবে না। আমি এসেছি এই বেহালাটা দেখাতে! আপনার বেহালা নিশ্চয়?

—নিশ্চয়। তাতে সন্দেহের কি কারণ থাকতে পারে?

—যথেষ্ট কারণ আছে। পূর্ণিমা বললে—এমন দামী বিলাতী বেহালা…একালে এমন জিনিষ আর পাওয়া যায় কিনা, জানি না—এ-বেহালা এমন অযত্নে রেখেছেন! তার ছিঁড়ে গেছে—বাজিয়ে মানুষের জিনিষ বলে মনে হয় না।

—কেন?

—বাজিয়ে মানুষ হলে এ যন্ত্রের উপর মায়া থাকে না? দরদ থাকে না?

অবনী হাসলো, হেসে বললে—বাজিয়ে অবনী মারা গেছে, পূর্ণিমা।

—যান!

অবনী বললে—সত্যি, কতকাল ওতে হাত দিইনি—তার কারণ, এত ঝামেলা চলেছে!

পূর্ণিমা বললে—ঝামেলা! তবু যদি কাজের মানুষ হতেন। বসে বসে সময় কাটান তো শুধু! এই তো বসে বসে কি একটা বাজে বই পড়ছেন! উঠুন, চলুন এখনি আমাকে নিয়ে···কোনো ভালো দোকানে! বেহালাটা নিয়ে চলুন—সারাতে দেবেন!

অবনী বললে—এখনি?

—হ্যাঁ, এখনি! আমার বেহালা কাশীতে পড়ে আছে। রাগ করে সেটা নিয়ে আসিনি! কিন্তু এখানে এসে এ-বেহালা দেখে আমার ভয়ানক ইচ্ছে, আপনার কাছে ভালো করে ছড়ি চালাতে শিখবো। একদিন দেরী করা চলবে না। উঠুন, গাড়ী বার করুন। আমি তৈরী হয়ে আসছি··· আপনিও চটপট তৈরী হয়ে নিন।

কথাটা বলে বেহালা হাতে পূর্ণিমা চলে গেল।

এবং আধঘণ্টার মধ্যে সে ফিরলো সাজসজ্জা করে। অবনীকেও তৈরী হতে হলো। তার পর দুজনে এসে মোটরে উঠে বসলো। অবনী ড্রাইভ করবে···পাশাপাশি দুজনে বসলো—মোটর চললো ডালহৌসি স্কোয়ারে বাজনার দোকানে!

দোকানে বাজনা দিয়ে দুজনে আবার এসে গাড়ীতে বসলো। অবনী বললে—বাড়ী ফেরা?

—না, না, চলুন···বেশ খানিকটা ঘুরিয়ে আনবেন। আপনাদের কলকাতা শহরে যখন এলুম, ভালো করে শহরটা দেখে যাই।

অবনী বললে—কোন্ দিকে যাবে?

পূর্ণিমা বললে—যেদিকে আপনার খুশী। বাড়ীর খাঁচায় থেকে থেকে ভেপ্‌সে উঠেছি···যতক্ষণ বাইরে ঘোরা যায়।

অবনী বললে—চলো, তাহলে এ সংগার ড্রাইভ···ডায়মণ্ড হার্বার? কিম্বা উত্তরে ব্যারাকপুর? কোন্ দিকে যাবে?

পূর্ণিমা বললে—বেগার্স মাষ্ট নট বী চুজার্স! আপনার যেদিকে মর্জ্জি।

হেসে অবনী বললে—কিন্তু নিজেকে বেগার বলে গ্লানি তোলা কেন?

—তা নয় তো কি! পূর্ণিমা বললে—মেয়ে-জাতটা পুরুষের কাছে বেগার ছাড়া আর কি···বিশেষ আমাদের এই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে!

—ভারতবর্ষের উপর টিপ্পনী কেটো না, পূর্ণিমা। অবনী বললে—জানো ভারতবর্ষের সনাতন বাণী—যত্র নার্য্যস্ত পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।

—থাক, ঢের হয়েছে। চালান গাড়ী।

ডায়মণ্ড হার্বারে নয়, সেখানে আর আগেকার সে শ্রী নেই—অবনী চললো বজবজ হয়ে অছিপুরের দিকে। পূর্ণিমাকে বললে—বাঙালী মানুষ, চিরদিন আছো পশ্চিমে··বাঙলা দেশ কেমন, একবার চোখে দেখে প্রত্যক্ষ পরিচয় নাও! রবিবাবু যে লিখে গেছেন—

নমো নমো নমো সুন্দরী মম জননী বঙ্গভূমি
গঙ্গার তীর স্নিগ্ধ সমীর জীবন জুড়ালে তুমি!

সে বাঙলা দেশকে চেনা জানা দরকার!

উচ্ছ্বসিত হাস্যে পূর্ণিমা বললে—সত্যি অবুদা, আপনি এমন কবি মানুষ, তা জানতুম না। গান-বাজনা করেন, আর ফষ্টি-নাষ্টি—এই নিয়ে আপনার কাজ! পিসিমা বলতেন, মানুষ হলো না কোনোদিন···হবেও না, বুঝি! তা—

বাধা দিয়ে অবনী বললে—তুমি তো আমাকে দেখেছো, চিনেছো! কি মনে হয়—আমি মানুষ? না···না···পাগল?

'পাগল' কথাটা অতর্কিতে মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়লো।

পূর্ণিমা হেসে বুঝি গড়িয়ে পড়ে যাবে! পূর্ণিমা বললে—পাগল বলতে

সেই চড়িভাতির দিনের কথা মনে পড়ে! সত্যি, আপনি কি বলে বোকাকে জলে ফেলে দিয়েছিলেন বলুন তো?

—তোমার বিশ্বাস, আমি ওকে ফেলে দিয়েছিলুম?

—ছানিনি? দুচোখে হাসির দীপ্তি ফুটিয়ে পূর্ণিমা করলে মন্তব্য।

অবনী বললে—তুমি দেখেছো নিজের চোখে?

—দেখেছি বৈ কি! আপনি···

অবনী বললে—জানো, মানুষ চর্ম্মচক্ষুর দিব্যদৃষ্টিতেও বহুৎ ভুল দেখে। ছোটদের ম্যাগাজিনে চোখের ভুলের ধাঁধার ছবি দেখেছো নিশ্চয়?

—থাক···থাক। পূর্ণিমা বলে উঠলো—ও নিয়ে আর তর্ক করবেন না··· আমিও চাই না তর্ক করতে। আমার চোখে হয়তো অনেক কিছু ভুল দেখি, দেখেওছি···কিন্তু বোকাকে ফেলে দেওয়া দেখা···তাতে এতটুকু ভুল হয়নি আমার! সেই থেকে বাবার এমন ধারণা যে আপনার মাথার গোলমাল আছে! পিসিমাকে বাবা কতদিন বলেছেন, ভাইপোর মাথার চিকিৎসা করাও, বৌদি।

অবনী বললে—হুঁ···তা তুমি কি বলো? কাশীতে গিয়ে তাঁর সেই উন্মাদ আশ্রমে ভর্ত্তি হবো না কি?

পূর্ণিমা বললে—আমাকে জিজ্ঞাসা করছেন কেন? নিজে যদি বোঝেন মাথার রোগ আছে, মাথার চিকিৎসা দরকার···তাহলে নিজেই সে-ব্যবস্থা করবেন।

বলতে বলতে দূরে বজবজের পেট্রোলের অতিকায় ট্যাঙ্কগুলো দেখে পূর্ণিমা বলে উঠলো—ওগুলো কি? সার-সার কেল্লার মতো?

অবনী বললে—ওগুলোতে পেট্রোল রাখা হয়। জাহাজ এসে নদীর কূলে দাঁড়ায়···জাহাজের খোল থাকে পেট্রোলে ভর্ত্তি···পাইপ লাগিয়ে জাহাজের খোল থেকে ঐ সব বড় ট্যাঙ্কে পেট্রোল চালিয়ে ভরা হয়—তারপর এখান থেকে পেট্রোল নিয়ে নানাদিকে চালান যায়।

—ও···তাহলে দেখা যায় না, কি করে জাহাজ থেকে পেট্রোল ভরা হয় নল দিয়ে !

—না। জাহাজ এখন সে-মাল খালাশ করছে না তো! কি করে দেখবে ?

গাড়ী হু-হু বেগে মোড় ঘুরে গঙ্গার দিকে চললো। পথে কি ভিড়·· পথের দুধারে কত পশারী বসেছে কত জিনিষ নিয়ে।

পূর্ণিমা বললে—এখানে কত লোক থাকে···উঃ।

—হ্যাঁ···এইখানে পেট্রোল গুদামে কাজ করে। তাছাড়া পাটের গুদামও আছে অনেক···এরা বেশীর ভাগ সেই সব জায়গায় কাজ করে।

পূর্ণিমা বললে—আচ্ছা, ঐ ট্যাঙ্কে যদি আগুন লাগে ?

অবনী বললে—লাগে না···এমন নয়, তবে খুব হুঁশিয়ারী ব্যবস্থা আছে। তবু মনে আছে, একবার···আমার বয়স তখন বারো-তেরো বছর··· এখানে আগুন লেগেছিল। সে একেবারে লঙ্কাকাণ্ড! পাঁচ-সাতদিন ধরে সে-আগুন নিবুতে পারা যায়নি।

—আপনি দেখতে এসেছিলেন ?

—না। লোকজনেব মুখে শুনেছি।

পূর্ণিমা কেমন শিউরে উঠলো···বললে—উঃ··বাবারে! মনে করতে ভয় হয়! ধরুন, আমরা ট্যাঙ্কগুলো পেরিয়ে এসেছি···এখন যদি আগুন লাগে, তাহলে আমরা আর ফিরতে পারবো না ?

হেসে অবনী বললে—তা কেন পারবো না! আমরা ও-গণ্ডী পার হয়ে এসেছি···কাছেই নদী···ঝপ করে নৌকো নিয়ে বহুদূরে চলে যাবো। কিন্তু এমন অলক্ষুণে কথা মনে আনতে নেই! ঐ দ্যাখো গঙ্গা···আমরা এসে পড়েছি।

নদীর ধারে বড় বড় কটা গাছ···গাছতলায় কখানা বাস—দুজনে মোটর থেকে নেমে নদীর ধারে এলো।

পূর্ণিমার চমৎকার লাগলো—এমন ফাঁকা জায়গা···ধূ-ধূ জলের প্রসার··· ওপারে ঐ লোকজনের বসতি···আব্‌ছাপানা দেখা যাচ্ছে···যেন স্বপ্নপুরী ! বড় বড় নৌকায় করে মানুষ নদী পার হচ্ছে।

পূর্ণিমা বললে—ওপারেও তো বাঙলা দেশ ?

—নিশ্চয়।

—ওপারে ও-জায়গার কি নাম ?

অবনী বললে—উলুবেড়ে। তুমি এই ঘাসের উপরে বসো—গাড়ীতে ফ্লাস্কে করে কোকো এনেছি আমি···দু-ফ্লাস্ক···আর টিফিন-ক্যারিয়ারে কতকগুলো পেষ্ট্রি···সেগুলোর সদ্ব্যবহার করি।

বিস্ময়ে পূর্ণিমার দুচোখ হলো এত বড় ! সে বললে—কখন নিলেন ? আমি তো দেখিনি।

হেসে অবনী বললে—চোখের ভুল। আমি নিয়েছি তোমার চোখের সামনে···অথচ তুমি দ্যাখোনি।

পূর্ণিমার দুচোখে ভর্ৎসনা, আবদার, অভিমান···সে বললে—যান, কেবলি ঠাট্টা ! সত্যি, কখন নিলেন ?

—বেয়ারাকে বলে দিয়েছিলুম, গাড়ীতে তুলে দিতে···পরীতে এনে দেয়নি। বসো, আমি সেগুলো নিয়ে আসি।

অবনী গাড়ী থেকে নিয়ে এলো পেষ্ট্রি আর কোকোর ফ্লাস্ক এবং দুজনে খেতে খেতে গল্প।

নানা কথায় খাওয়া-দাওয়া চুকলো···তারপর ফ্লাস্ক আর টিফিন-ক্যারিয়ার গাড়ীতে তুলে রাখা। পূর্ণিমা চেয়ে আছে এপারে দক্ষিণদিকে দূরদিকচক্র-রেখার দিকে—গাছপালা···মাঠ···জলা···মাঝে মাঝে লোকের বসতি—ভারী ভালো লাগছে ! কাশী থেকে এদিকে-ওদিকে বেড়াতে বেরিয়েছে···

কিন্তু সেখানে এমন সজীব শ্যামলতা চোখে পড়েনি…কেমন শুষ্ক রুক্ষ ভাব যেন! সে বললে—ঐদিকে খানিক যাই যদি?

—দেখবে? চলো। কিন্তু বেলা পড়ে আসছে…সন্ধ্যা হবার আগেই আমরা অছিপুর ছাড়বো।

—খুব হবে। চলুন।

দুজনে চলেছে মৃদু পদসঞ্চারে। নৌকা থেকে ওপারের যাত্রীরা নেমে উপরে উঠছে…বাস ধরবে। কতরকমের যাত্রী…দোকানী পশারী ঝী বৌ ছেলেমেয়ে। তাদের দিকে চেয়ে কে একজন মন্তব্য করলে—না, না, স্বামী-স্ত্রী…চেহারা দেখে বুঝতে পারছিস না?

কথাটা দুজনেই শুনলো। পূর্ণিমার মাথায় রক্ত ছলাৎ করে উঠলো… অবনী চকিতের জন্য কাঠ! দুজনে কথা কইছিল…চকিতের জন্য তাদের কথা হলো বন্ধ। তারপর অবনী হঠাৎ বললে—একটা কথা ছিল, পূর্ণিমা।

পূর্ণিমার বুকখানা ছঁৎ করে উঠলো…সর্ব্বাঙ্গে শিহরণ…অবনীর দিকে না চেয়েই সে বললে—কি?

অবনী বললে—মনে আছে, কাশীতে থাকতে তোমাকে একদিন বলেছিলুম আমার এক বন্ধুর কথা…তোমাকে সে ভালোবাসে, দেবীর মতো শ্রদ্ধা করে!

পূর্ণিমা কোনো জবাব দিলে না…অবনী বললে—দাঁড়াও! এ-কথা কওয়া দরকার…তোমাকে শুনতে হবে…আমি বলবো।

পূর্ণিমা কোনো জবাব দিলে না…দাঁড়ালো…নতমুখে। অবনী বললে —সে বন্ধু হিমাদ্রি…তোমার ভাইয়ের টিউটর হয়ে চাকরি নিয়েছিল… তোমাকে দেখবে…শুধু এইজন্য। নাহলে ওর পয়সাকড়ি আছে…শিক্ষিত, বোনেদী ঘরের ছেলে…এঞ্জিনীয়ার স্যর বিদ্যুৎবরণের ভাইপো। তোমার বিয়ের জন্য সকলে আকুল…আমাকে যোগ্য পাত্র খুঁজতে বলেছেন…

আমার এই বন্ধু হিমাদ্রিকে আমি তোমার যোগ্য বলে মনে করি! তাকে বিয়ে করতে হবে!

এ-কথার পর মিনিটখানেক দুজনেই নিস্তব্ধ। তারপর পূর্ণিমা চাইলো অবনীর দিকে…বললে—আপনার হুকুম?

—হুকুম নয়। তোমাকে ভালোবাসি…তোমার মঙ্গল চাই…তাই।

পূর্ণিমা হাসলো…মলিন মৃদু হাসি। পূর্ণিমা বললে—আমিও আপনাকে ভালোবাসি…আপনার মঙ্গল চাই…আমার কথা শুনবেন তাহলে যা বলবো?

—বলো। রাখবার হয় যদি, নিশ্চয় রাখবো।

পূর্ণিমা বললে—কাশীতে আপনি দেখেছেন কিনা জানি না, আমার এক বান্ধবী…তার নাম জয়ন্তী…ওখানকাব খুব বড় এক উকিলেব মেয়ে… বি-এ পাশ…আপনাকে তার খুব পছন্দ…বিয়ে করতে চায়। আমাকে সে-কথা বলেছিল। কত ভালো পাত্র আসছে…জয়ন্তী বিয়ে করবে না। সে বাড়ীতে বলেছে, জীবনে বিয়ে করবে না…কোনো কাজ নিয়ে থাকবে। আমাকে বলেছে, যদি আপনি তাকে বিয়ে করেন, তবেই বিয়ে… নাহলে হাসপাতালে নার্শগিরি, কিম্বা কোনো মেয়ে স্কুলে টীচারি, কি, কোন চাকরি করবে। আপনি তাকে বিয়ে করুন…নাহলে জয়ন্তীর জীবনটা…

অবনী কি ভাবলো, তারপর বললে—কিন্তু আমি বিয়ে করবো না, কখ্খনো না!

পূর্ণিমা বললে—আমিও যদি ঠিক করে থাকি, বিয়ে করবো না, কখ্খনো না…আপনি তবু জোর করে…

বলতে বলতে পূর্ণিমার কণ্ঠ হলো রুদ্ধ। অবনী অবাক…প্রায় পাঁচ মিনিট …তারপর পূর্ণিমা বললে—সন্ধ্যা হয়ে আসছে…চলুন, বাড়ী ফিরি।

—তাহলে আমার কথার জবাব?

—না। আমাকে মাপ করবেন, অবুদা।

বলেই পূর্ণিমা চললো গাড়ীর দিকে...অবনীকেও আসতে হলো।
পূর্ণিমা গাড়ীতে উঠে বসলো...অবনী উঠে বসলো তার পাশে.. তারপর
গাড়ী চালিয়ে বাড়ী ফেরা।

পথে কোনো কথা নয়। অবনী যত কথা বলে, পূর্ণিমা তার কোনো
কথার জবাব দেয় না!

অবনী চিন্তাকুল...কিন্তু উপায় কি!

ছয়

পনেরো দিন পরে...

বিন্দুবাসিনীরা এখানেই আছেন। পিসিমা ঘটক লাগিয়েছেন এবং
ঘটকের দৌলতে দু'-তিনটি পাত্র এসে পূর্ণিমাকে দেখে গেছে। মায়ের কথায়,
পিসিমার কথায় এবং অবনীর কথায় পূর্ণিমা এসে তাদেব সামনে বসেছে...
তাদের প্রশ্নাবলীর কয়েকটার জবাবও দিয়েছে...কিন্তু তার মূর্ত্তি তখন যেন...

অবনীর মনে হয়েছে, কাঠের পুতুল হলেও ভিতরে ভিতরে যেন জলন্ত
প্রস্রবণ চলেছে বয়ে!

কাল সন্ধ্যার পর এক ব্যারিষ্টার পাত্র নানাভাবে নিজের বহু গুণপণার
পরিচয় দিয়ে গেছে। ছেলেটির চেহারা ভালো, বাপের অনেক টাকা
এবং তার বচনে যেরকম ফোয়ারা ছুটেছিল...বিন্দুবাসিনী মুগ্ধ!

আজ সকালে চায়ের পর্ব্ব চুকিয়ে অবনী বসেছে তার ঘরে—খবরের
কাগজ নিয়ে...পূর্ণিমা এলো।

কাগজ রেখে অবনী বললে—বসো, পূর্ণিমা।

পূর্ণিমা বসলো। অবনী বললে—কালকের জানোয়ারটিকে কেমন
দেখলে? তোমার জু-য়ে রাখবার মতো?

চারিদিকে চেয়ে পূর্ণিমা বললে—আপনার সঙ্গে আমার কি এমন শত্রুতা
অবুদা, যে, বাড়ীতে পুরে আমাকে এমন করে অপমানে জর্জ্জরিত করছেন!

অবনীর বুক দুললো! তবু সে-ভাব গোপন রেখে অবনী বললে—জানো তো আমাদের দেশের প্রথা ··সেই মান্ধাতার যুগ থেকে চলে আসছে —কন্যা যখন স্বয়ংবরা হতেন, তখন এ-বালাই ছিল না···কিন্তু সে-প্রথা রহিত হয়ে গেছে বহুকাল ··রহিত হয়ে এই প্রথা চলেছে—অবিবাহিতা কন্যা ঘরে থাকলে তার বিয়ের জন্য তাকে এমনি এগজিবিট করে ধরতে হয়!

—তামাসা করবেন না! সব তামাসার একটা সীমা আছে! আপনাদের তামাসা সে-সীমা পেরিয়ে গেছে। বন্ধ করুন এ-এগজিবিশন···নাহলে আমি যা করবো, আপনারা তাতে শিউরে উঠবেন!

উত্তেজনায় পূর্ণিমা কাঁপছে!

অবনী ডাকলো—পূর্ণিমা···

পূর্ণিমার দুচোখে জল···পূর্ণিমা বললে—আপনি আমাকে যত তুচ্ছ-তাচ্ছল্য করুন···মনে রাখবেন, আমি মানুষ। আমার ফীলিংস আছে, সেন্টিমেণ্ট আছে···সেগুলো নিয়ে এমন করে···

কথা শেষ হলো না···অশ্রুর উচ্ছ্বাসে কথা ভেঙ্গে ঝরে গেল। তার পর পূর্ণিমা উঠে ক্ষিপ্র পায়ে চলে গেল।

অবনী কাঠ হয়ে বসে রইলো···যাকে বলে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়, ঠিক তেমনি ভাব!

তার এ-ভাব কাটলো হিমাদ্রির উচ্ছ্বসিত কণ্ঠস্বরে।

হিমাদ্রি ডাকলো—অবু···

অবনী চেয়ে দেখলো···বললে—হিমাদ্রি! এসো।

হিমাদ্রি বসলো···বললে—গুড্ লাক, বন্ধু! কাল আমি বিবাহ করেছি।

—বিবাহ করেছো! অবনীর মনে হলো, সে যেন শূন্যে ঝুলছে!

—হঁ্যা···রেজিষ্ট্রী অফিসে কাল বেলা চারটেয়। তোমাকে খবর দিইনি···কি জানি, যদি লাষ্ট মোমেণ্টে ভেস্তে যায়! আজ সন্ধ্যার পর

আমার ওখানে যাবে···বৌয়ের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবো। তুমি আমি আর বৌ···তিনজনে একটা হোটেলে গিয়ে খাবো।

অবনী বললে—কোন্ ভাগ্যবতীর এ-সৌভাগ্য হলো? সেই সেদিন মিহিরদের ছবির মহরতের দিন যে-মহিলার সঙ্গে তোমার বেশ অন্তরঙ্গতা জমছিল?

—সেই মাহেষ্মতী দেবী! আরে না। দুদিন তাঁর জন্য মনটা খুব··· কিন্তু না, ভালোবাসা জমতে পারলো না···বুদ্‌বুদের মতো ফেটে গেল!

—তাহলে?

হিমাদ্রি বললে—সত্যি অবু, রোমান্স···স্রেফ রোমান্স! মানে—শী ইজ্ দী রিয়াল এঞ্জেল···হ্যাঁ, বলি শোনো।

অবনী বললে—কিছু ফরমাশ করবো? কোকো? চা?

—না, না। হিমাদ্রি বললে—এখন আমি ম্যারেড ম্যান···ঘরে বৌ··· না খাইয়ে ছাড়ে কখনো! বুঝবে না তো ভাই, বিবাহিত জীবনের সুখ··· চিরদিন সলিটারী ফ্লাই রইলে—জানো, স্ত্রী ছাড়া পুরুষমানুষকে যত্ন, আদর আর তোয়াজ করতে আর কেউ জানে না!

অবনী বললে—বৌ নিয়ে আছো কোথায়? কাকার আস্তানায়?

—না। কাকাবাবুর সঙ্গে নো মীটিং! মানে, তিনি ম্যানেজারীতে বহাল রাখবেন, বলেছেন···মানি। কিন্তু মনের অবস্থা যেরকম ছিল···সেই যে তুমি বলেছিলে, বয়স বেড়ে চলেছে···অথচ ফ্রম ওয়ান পোর্ট টু এ্যানাদার পোর্ট ধাক্কা খেতে খেতে চলেছি···কোনো পোর্টে জীবনতরী বাঁধতে পারছি না! ঠিক করেছিলুম, আগে জীবনতরী বাঁধি একটি পোর্টে···তার পর তরী থেকে নেমে কাকাবাবুর ফার্মের ম্যানেজারী—অবশ্য তোমার সাহায্য নিতে হবে। আর জানি, তুমি সাহায্য করবে···ছেলেবেলা থেকে বন্ধুত্ব!

অবনী বললে—হ্যাঁ, এখন বলো তোমার রোমান্স!

—বলি। হিমাদ্রি স্বরু করলো তার কাহিনী। হিমাদ্রি বললে—তোমার মিহিরবাবুর ছবির মহরৎ···সেই ষ্টুডিয়োয় গিয়েছিলুম। ভারী ভালো লেগেছিল ভাই···দী এ্যাটমসফীয়ার···একেবারে আমাদের এ নোংরা দুনিয়া ছাড়া—এ ল্যাণ্ড অফ ড্রীম্‌স্‌!

হেসে অবনী বললে—কি রকম?

—খাশা জায়গা, ভাই। হিমাদ্রি বললে—ফেয়ার উইমেন—নিত্য আসেন···তাঁরা যেচে আলাপ করেন! লোভে লোভে যেতুম—এখান থেকে বেছে নিতে হবে আমার মনের মানুষটিকে! সে-মহিলার উপর থেকে মন সরে আরো দুজনের উপর মন খুবই ঝুঁকেছিল—পর-পর···এ্যাণ্ড দী লাষ্ট অফ দেম···এঁর নাম উত্তরা দেবী···পুশিং ষ্টার—তাঁর সঙ্গে সেদিন অনেকক্ষণ কাটিয়ে ষ্টুডিয়ো থেকে বেরিয়েছি···তাঁর ছিল স্যুটিং···ষ্টুডিয়ো থেকে বেরিয়ে ট্রাম কি ট্যাক্সি একটা ধরবো বলে আসছি···মাথার উপর মেঘ জমেছিল খেয়াল ছিল না···হঠাৎ চড়বড় করে বৃষ্টি! একখানা রিক্‌শ নিলুম। রিক্‌শয় করে আসছি···হঠাৎ দেখি, ইনি···মাই এঞ্জেল···উনিও কোন্ ষ্টুডিয়ো থেকে ফিরছিলেন বুঝি···বৃষ্টিতে গাছতলায় আশ্রয় নিয়েছেন। রিক্‌শ থামিয়ে টক্ করে নেমে পড়লুম। তাঁকে মিনতি, আপনি মহিলা···রিক্‌শয় উঠুন। উনি বসবেন না···বলেন, আপনি ভিজে ভিজে যাবেন! আমি বলি, তাতে কি···আমরা পুরুষমানুষ···ঝড়-জল সহ্য হবে···কিন্তু আপনি লেডি। বহুক্ষণ এমনি কথা কাটাকাটি···শেষে তিনি বললেন, দুজনেই রিকশয় বসে যাবো। আমার শরীরে কেমন কাঁটা দিলে! উনি বললেন, উনি থাকেন টালিগঞ্জের রেলের পুল পার হয়েই প্রতাপাদিত্য রোডে। উঠলুম দুজনে রিক্‌শয়। ওঁর বাড়ীতে এলে উনি নামতে বললেন। বললেন, যে-রকম ভিজেছেন···এ-কাপড় ছেড়ে শুকনো কাপড় পরে যাবেন···বৃষ্টি ধরলে যাবেন!···তাই থেকেই বুঝলে কি না··

অবনী বললে—ডেভেলপ হলো কি করে···বলো।

হিমাদ্রি বললে—একলা মানুষ···ষ্ট্রাগ্‌লিং লাইফ···বাট হাউ নোব্‌ল্‌ এ্যাণ্ড ডিগনিফায়েড! বললেন, বই লিখে চালান। বিয়ে-থা করেননি। বিয়ের ঠিক হয়েছিল···কিন্তু উনি জানতে পারেন, যে বিয়ে করতে চেয়েছিল···সে-মানুষটা স্কাউণ্ড্রেল—ওয়াণ্টেড টু লিভ অন হার ইনকাম! উনি টালিগঞ্জের হার্কুলিস ষ্টুডিয়োতে গিয়েছিলেন। তারা ওঁর একখানা নভেল নিয়ে ছবি করবে···ফিল্ম-রাইটের দরুণ দাম দেবে পাঁচশো টাকা··· সেদিন দলিল লেখাপড়া হয়েছে···চেক পেয়েছেন!

—তারপর?

হিমাদ্রি বললে—বৃষ্টি থামলো রাত দশটায়···ফিরলুম নিজের আস্তানায়··· আলাপ-পরিচয় হলো বেশ। আমার লভ এপিসোডস্‌ বলিনি অবশ্য···তবে কাকাবাবুর পরিচয় দিলুম···বললুম, বুড়ো বয়সে তিনি বিয়ে করেছেন—সেজন্য তাঁর এনকামব্রান্স হয়ে থাকা উচিত হবে না বলে সে-আশ্রয় ত্যাগ করেছি। তার পর রোজই নিমন্ত্রণ। শেষে উনি একদিন বললেন, বিয়ে করেননি কেন? আমি বললুম, মনের মতো মেয়ে কৈ? এবং পরে উনি একদিন দু ছত্র চিঠি লিখে জানালেন—উনি বিবাহ করতে চান···হোম লাইফ-এর জন্য আকুল···যদি আমার আপত্তি না থাকে! এ্যাণ্ড দাস্‌ উই গট ম্যারেড ইয়েষ্টার্ডে।

হেসে অবনী বললে—যাক, শেষ পর্যন্ত তোমার গতি হলো!

হিমাদ্রি বললে—ছেলেবেলায় স্কুলের বইয়ে সেই পোইট্রি পড়েছিলুম··· ট্রাই ট্রাই ট্রাই এগেন! স্যাংস্কৃটে ··পড়েছিলুম—উদ্যোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি

হেসে অবনী বললে—মাই সিনসিয়ারেষ্ট কনগ্রাচুলেসন্স!

হিমাদ্রি বললে—এখন তোমাকে সাহায্য করতে হবে···টু ব্রেক দী আইস! মানে, কাকাবাবুর সঙ্গে আমার হাত মিলিয়ে দেওয়া। তবে

আমি আর আমার স্ত্রী আলাদা থাকবো। স্ত্রীর নিজের বাড়ী…ঐ প্রতাপাদিত্য রোডে…পৈত্রিক…দোতলায় উনি থাকেন…একতলাটা ভাড়া দিয়েছেন। কাকাবাবুর ফার্মে কায়েমি হলে ভাড়াটে তুলে দেবো…গোটা বাড়ী হবে আমাদের। তখন সুখে সংসার-যাত্রা!

অবনী বললে—আজই আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করে সব ব্যবস্থা পাকা করে সন্ধ্যার পর তোমার ওখানে যাবো। তোমার ঠিকানাটা?

—এই যে। হিমাদ্রি একটা কাগজে ঠিকানা লিখে দিলে।

অবনী বললে—বৌয়ের নাম?

হিমাদ্রি বললে—তাঁর নামটা সেকেলে গোছ…নাম জয়দুর্গা দেবী! তা নামে কি এসে যায়…এঁ্যা!

অবনী হাসলো…বললে—কে বলে খারাপ নাম! উঁহু…জয়দুর্গা নাম বলেই শেষ পর্য্যন্ত তুমি জয়দুর্গা বলে ঝুলতে পেরেছো!

হেসে হিমাদ্রি বললে—তা যা বলেছো…জয়দুর্গা বলে ঝুলে পড়া! নাম জয়দুর্গা হলেও চেহারা ভালো…দেখে তুমি খুশী হবে। বুঝলে ভাই, এঞ্জেল যে বলেছি…তা একেবারে অক্ষরে অক্ষরে সত্য।

বৈকালে প্রতাপাদিত্য রোডে জয়দুর্গা দেবীর বাড়ী নিমন্ত্রণে যাবার পথে অবনী এলো স্যর বিদ্যুৎবরণের গৃহে। খবর শুনলো, স্যর এবং লেডি দুজনেই আছেন। তাঁরা বাগানের ওদিককার লনে ব্যাডমিণ্টন খেলছেন!

শুনে অবনী পাগল হবার জো! বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা হলে বৃদ্ধ অনেক কিছু করেন…তা বলে তরুণী ভার্য্যার সঙ্গে ব্যাডমিণ্টন খেলা!

অবনী বললে—গিয়ে খবর দাও, স্বপনবাবু এসেছেন। খুব দরকারী কথা আছে। আমি বসবো'খন…ওঁদের খেলা হলে সে-কথা হবে।

বয় গেল খবর দিতে এবং ফিরে এসে সে জানালো—সাহেব সেলাম দিয়েছেন।

অবনীকে নিয়ে বয় এলো খেলার লনে। স্যর এবং লেডি···দুজনেই হাসিমুখে অভ্যর্থনা করে বললেন—বসো, স্বপনবাবু।

অবনী বসলো। একটা বেতের টেবিলের উপর একখানা বাঙলা বই··· বইখানা তুলে নিয়ে দেখে, বাঙলা নভেল। নভেলের নাম সাহসিনী কমলাবতী···স্বপন বিশ্বাসের লেখা। কৌতূহল হলো। নিজেকে স্বপন বিশ্বাস বলে চালাচ্ছে···অথচ স্বপন বিশ্বাস কি লেখে, সে-লেখার সঙ্গে পরিচয় নেই। লেখে ভালো নিশ্চয়···নাহলে এ-বয়সে তাঁর লেখা বই পড়ে বৃদ্ধ বিদ্যুৎবরণ এমন নবযৌবন লাভ করেন কি করে!

বইখানার পাতা উলটোতে লাগলো। একখানা পাতার কটা ছত্র চোখে পড়লো···ছত্রগুলোর ধারে মার্জিনে নীল পেন্সিলের মোটা দাগ···বুঝলো, এ-ছত্রগুলো স্যর না হয় লেডির খুব ভালো লেগেছে···তাই এ নীল পেন্সিলের মার্কা মারা! অবনী পড়লো ছত্রগুলো:—

কমলাবতীর দুই চোখ ঝকঝক করে জ্বলে উঠলো···যেন ঠিক বজ্রাগ্নি! বৃদ্ধ রাজার উপর দুচোখের দৃষ্টির অগ্নি বর্ষণ করে কমলাবতী বললে—তোমার রাজ্য-ঐশ্বর্য্য আছে···সেনাপতি সৈন্য-সামন্ত আছে ···গারদখানা আছে···লোহার শৃঙ্খল আছে—সেই ভয় দেখিয়ে আমাকে তুমি নিবৃত্ত করতে চাও, রাজা? তোমার তরুণ পুত্রকে আমি ভালোবাসতে পাবো না? ভালোবাসলে আমাকে হাতীর পায়ে ফেলে চূর্ণ করবে? আজীবন তোমার লোহার গারদখানায় বন্ধ করে রাখবে? কিন্তু তা পারবে না, রাজা···আমার এ-ভালোবাসার বেগ···তার বেগে তোমার মোটা হাতী নিপাত যাবে···তোমার লোহার গারদ পাঁকাঠির মতো চূর্ণ হবে! গঙ্গার স্রোতের বেগে একদিন মত্ত ঐরাবত ভেসে গিয়েছিল···আমার এ-ভালোবাসার স্রোতের বেগে তোমার সব শাসন

চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাবে। জেনো, প্রেমের বল এ-জগতে অমোঘ, অপরাজেয়!

পড়তে পড়তে হাসি পাচ্ছিল। মনে হলো, এই লেখার লেখক বলে এঁদের কাছে আমার এমন আদর! হায় রে!

স্যর এলেন···বললেন—নিজের বই পড়া হচ্ছে?

লেডি এসে ঝুঁকে পড়লেন, বললেন—কোন জায়গাটা···দেখি!

নীল পেন্সিলের দাগ দেখে লেডি মালতী বললেন—ও···হ্যাঁ, আমি দাগ দিয়েছি। বেশ তেজের সঙ্গে কথাগুলো বলেছে দুঃখীর মেয়ে কমলাবতী!

বইখানা রেখে দিলে অবনী। স্যর বললেন—হঠাৎ এখানে?

লেডি বললেন—আমাদের সৌভাগ্য! তা কি খাবেন, বলুন···আইস-ক্রীম? দুধ? কোকো? কফি?

অবনী বললে—না, কিছু না। আমি এসেছিলুম একটা দরকারী কথা বলতে।

স্যর বললেন—বলো।

অবনী বললে—হিমাদ্রির কথা আপনাকে সেদিন বলেছিলুম···তাকেও সব কথা বলেছি। সে বিয়ে করেছে···কাল বিয়ে হয়েছে···রেজিষ্ট্রী বিয়ে। বৌয়ের বাড়ী আছে···সেইখানেই আছে। এখন আপান চাকরিটি দিলেই সে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে। বিয়ে যা হয়েছে শুনলুম, মোষ্ট রোমান্টিক ওয়েতে!

হেসে মালতী বললে—নিশ্চয় আপনার লেখা উপন্যাসের ধরণে!

অবনী বললে—এই বয়স···জানেন তো, লাভিং হার্টস···

স্যর বিদ্যুৎবরণের মুখ হলো গম্ভীর···তিনি বললেন—বিয়ে করেছে··· আগে আমাকে ঘুণাক্ষরে জানালো না। দ্যাট মীন্স, আই হ্যাভ বীন ডিফায়েড! ইয়েস, ডিফায়েড!

অবনী বললে—বোঝেন তো, ইয়ং হার্টস···হৃদয়ের আবেগ···আবেগের

আতিশয্যে মানুষ দুনিয়া ভুলে যায়—দায়িত্ব কর্ত্তব্য ভুলে যায়—আপনি কি বলেন? তাই না?

প্রশ্নটা সে নিক্ষেপ করলো লেডিকে উদ্দেশ করে।

লেডি বললেন—তা ঠিক···হৃদয়ের আবেগ!

স্যর তাকালেন লেডির দিকে···বললেন—বেশ···আমি মানুষ···ওঁর ঐ উপন্যাসের বুড়ো রাজা নই···হৃদয়ের আবেগের দাম বুঝি না, তা নয়। তা বেশ, ক্ষমা করলুম। তাকে আপনি বলবেন, বৌ নিয়ে অবিলম্বে সে এখানে আসুক। এবং চাকরিও তার মজুত।

অবনীর কাজ চুকলো। সে বললে—তাহলে আমি এখন উঠি···পরে আসবো। আজ কাজ আছে···মাপ করবেন···বসতে পারলুম না।

লেডি বললেন—কবে আসছেন?

—ওরা এলেই···কেমন?

অবনী চলে আসছিল···স্যর তার হাত ধরে ঝাঁকানি দিলেন—ইউ আর এ জিনিয়াস্! হ্যাঁ, হিমাদ্রিকে আমি কনগ্রাচুলেট করে চিঠি লিখবো আজ। ওর ঠিকানা?

ঠিকানা-লেখা কাগজখানা ছিল অবনীর পকেটে···সে-কাগজখানা স্যর-এর হাতে দিয়ে অবনী বললে—এই কাগজে লেখা আছে তার ঠিকানা।

এখান থেকে বেরিয়ে প্রতাপাদিত্য রোডে···জয়দুর্গার বাড়ী। জয়দুর্গাকে দেখে অবনী নিশ্বাস ফেললো। নাম শুনে ভেবেছিল, সেকেলে কলাবৌ···চওড়া লালপাড় শাড়ী পরা ঘোমটায় ঢাকা জবুথবু মোটা হাঁদা পানা মূর্ত্তি দেখবে! কিন্তু তা নয়···জয়দুর্গার দেহলতা সঞ্চারিণী পল্লবিনীর মতো! মুখে চোখে বুদ্ধির দীপ্তি··এবং আদর-আপ্যায়নে বেশ স্মার্ট! বসবার ঘরখানিতে তেমন আসবাবপত্র না থাকলেও যা আছে, তা বেশ রুচিসঙ্গত এবং পরিপাটি সাজানো।

খাওয়া-দাওয়া বাড়ীতেই হলো। জয়দুর্গা বললেন—ইনি বলেছিলেন, হোটেলে খাওয়া। আমি বললুম, না। বাঙালার মেয়ে, বাঙালীর বৌ আমি···যে কাজই করি, বন্ধুবান্ধবকে নিজের হাতে রেঁধে খাওয়াতে পারবো না···হোটেলে ছুটবো? না, আমি ভারী অপছন্দ করি!

অবনী বললে—ঠিক কথাই বলেছেন। হিমাদ্রিটা গর্দ্দভ···এখন আপনার হাতে মানুষ হবে···আশা হচ্ছে।

উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে হিমাদ্রি বললে—যা বলেছি···এঞ্জেল···কি বলো? কেমন দেখছো?

অবনী বললে—ইয়ং গেহে লক্ষ্মীরিয়ং অমৃতবর্ত্তিনয়নয়োঃ!

সাত

বাড়ী ফিরতে অবনীর বেশ রাত হলো। সে দোতলায় উঠছে, ঘড়িতে বারোটা বাজলো। দোতলায় উঠতেই বিন্দুবাসিনী এবং পিসিমার সঙ্গে দেখা।

পিসিমা বললেন—বাড়ীতে বিভ্রাট!

বিভ্রাট! অবনী চমকে উঠলো। চট করে মনে হলো, পূর্ণিমার জন্য নয় তো? অবনী বললে—কি হয়েছে?

বিন্দুবাসিনী বললেন—আহিরীটোলার সনাতন চৌধুরীর মেয়ে দেখতে আসবার কথা। মস্ত বড় কারবারী মানুষ···ছেলেটি বিলেত থেকে কি সব ব্যবসা-বিদ্যা শিখে এসেছে, বাবা। তা তাঁরা এলেন সন্ধ্যার ঠিক পরেই··· পূর্ণিমা গোঁ ধরে বসলো, সে দোকানের খেলনা পুতুল নয়, জামাকাপড়ও নয় যে, নিত্য যে আসবে, তার সামনে গিয়ে বসতে হবে! সে তা পারবে না, সে বসবে না। কত বোঝালুম, কত বকলুম···তা কিছুতে মেয়ে রাজী নয়। রাত আটটা পর্য্যন্ত বসে বসে তাঁরা চলে গেলেন। বলা হলো, মেয়ে বাথরুমে পড়ে গিয়ে কপাল ছেঁচে রক্তারক্তি ব্যাপার! কিন্তু তাঁরা তা বিশ্বাস করবেন কেন? এত বড় ব্যাপার হলো বাড়ীতে···তা ডাক্তার এলো না,

কোনো গোলমাল নেই! যাই হোক, তাঁরা তো চলে গেলেন…কিন্তু পূর্ণিমা সেই যে বিছানা কামড়ে পড়েছে…উঠবে না, খাবে না, কারো সঙ্গে কথা কবে না। তুমি ছাখো বাবা, যদি বলে কয়ে তাকে খাওয়াতে পারো!

বৃত্তান্ত শুনে অবনী নির্বাক…যেন কাঠ! তার যা মনে হয়েছে সেই কাশী থেকে আসবার সময় থেকে এখানেও…দুদিন! একদিন অছিপুরে বেড়াতে গিয়ে…আর একদিন এই মেয়ে দেখার হিড়িক নিয়ে তার উপর আভাস ইঙ্গিত!

কিন্তু না…তা হতে পারে না! তার সঙ্গে পূর্ণিমার বিয়ে অসম্ভব!

পিসিমা বললেন—দাঁড়িয়ে রইলি কি! ছাখ…মেয়েটাকে বল্…বোঝা—তোর কথা শুনবে, মনে হয়!

অবনী এলো পূর্ণিমার ঘরে। অন্ধকার ঘর…সুইচ টিপে অবনী আলো জ্বাললো। আলো জ্বালতে অবনী দেখে, খাটের বিছানায় উপুড় হয়ে মুখ গুঁজে পূর্ণিমা পড়ে আছে। কাছে গিয়ে সে ডাকলো—পূর্ণিমা…

সাড়া নেই। আবার ডাকলো…আবার…আবার।

তবু কোনো সাড়া নেই। তখন অবনী বললে—তবে রে মেয়ের নিকুচি করেছে! মটকা মেরে পড়ে থাকা…ডাকলে সাড়া দেওয়া নয়! এখনি বুড়োধাড়ি মেয়েকে পাঁজাকোলা করে নামিয়ে নিয়ে যাবো খাবার ঘরে। জানো তো, আমার অসাধ্য কাজ নেই…পাগল মানুষ!

এ-কথা বলে অবনী এসে পূর্ণিমার কাঁধ ধরে সবলে তাকে চিৎ করে শুইয়ে দিলে। পূর্ণিমা চোখ বুজে আছে…চোখ খুললো না…চিৎ হয়ে পড়ে রইলো।

অবনী বললে—ওঠো…নাহলে নেক্সট্ ষ্টেপ…টু ক্যারি ইউ…বিছানার মোটের মতো!

পূর্ণিমার দিক থেকে না কোনো সাড়া, না একটু স্পন্দন!

অবনী তখন তার ঘাড়ের নীচে দিয়ে একখানা হাত দিলে চালিয়ে··· চালিয়ে দিয়ে বললে—এবার···

বলবামাত্র ধড়মড়িয়ে পূর্ণিমা উঠে বসলো···বললে—আপনার বাড়ীতে এসেছি বলে নিজের কোনো স্বাধীনতা নেই? ঘুম পেয়েছে···ঘুমোতে পাবো না?

—না। খেয়ে তারপর ঘুম। যখন যে-কাজ···পারম্পর্য্য রক্ষা করা চাই। ওঠো, খেতে চলো। তোমার জন্য বাড়ীসুদ্ধ মানুষ না খেয়ে রয়েছে ···আর তুমি···ঘুমিয়ে আরাম করবে! বটে! না···নো লাক্সারি, ম্যাডাম!

পূর্ণিমাকে উঠতে হলো। অবনী তাকে নিয়ে এলো খাবার ঘরে··· পূর্ণিমাকে বললে—খেয়ে নাও।

পূর্ণিমা কথা কইলো···বললে—আপনি?

—আমার নেমন্তন্ন ছিল···খেয়ে এসেছি। বিয়ের নেমন্তন্ন···মজার বিয়ে···নাটকে-নভেলে এমন হয় না।···খেয়ে নাও। বলবো সে-কাহিনী।

তরুণ মন···সে মনের কৌতূহল! কোনোমতে খাওয়া-দাওয়া সেরে পূর্ণিমা বললে—চলুন বলবেন সে-গল্প। আমার ঘুম ভাঙ্গিয়ে দিয়েছেন··· ভেবেছেন, মজা করে ঘুমোবেন! তা হবে না·· বলতেই হবে।

অবনীকে বলতে হলো···হিমাদ্রির ভালোবাসার অন্য চ্যাপ্টার বাদ দিয়ে শুধু শেষের চ্যাপ্টারটুকু! শুনে পূর্ণিমা বললে—বোকার মাষ্টার মশাই?

—হ্যাঁ। তোমাকে ভালোবেসে নিরাশ হয়ে অবশেষে এই শ্রীমতী জয়দুর্গা দেবীকে বিবাহ। তা নাম জয়দুর্গা হলেও—দেখতে শুনতে কথায় বার্ত্তায় তোমাদের একালের গীতা-শিপ্রা-চিত্রা-মিত্রা কোম্পানির মতোই—আমার অন্ততঃ মনে হলো! কিন্তু তুমি আজ কি করেছো, শুনলুম!

—বেশ করেছি। আমি স্পষ্টই বলছি, জোর-জবরদস্তি চলবে না আমার সঙ্গে। আমার খুশী—আমি বিয়ে যদি না করি! যাকে আপনারা

এনে সামনে ধরে দেবেন···তাকেই অমনি ? না···নেভার ! এর জন্য আমাকে যদি বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেন, আই ওণ্ট কেয়ার ! এ-কথা বলে আবার তার আগেকার সেই দৃপ্ত ভঙ্গীতে এ-ঘর থেকে প্রস্থান।

পরের দিন বেলা প্রায় এগারোটা···পূর্ণিমার কথা নিয়ে অবনীর মাথায় যেন মৌমাছির গুঞ্জন চলেছে—দু-চারটে হুলও ফুটছে না, এমন নয়, এবং এ-গুঞ্জন আর হুলের যাতনায় অনেক কথাই তার মনে আসছে···নাটক নভেল, রবীন্দ্রনাথের কাব্য···সঙ্গে সঙ্গে পূর্ণিমার চোখের দৃষ্টিতে কখনো বৈশাখী দাহ···কখনো শ্রাবণের মেঘভার !

হিমাদ্রি এসে হাজির···বললে—ইউ আর গন্ !

—আমি ! গন্ ! তার মানে ?

—আর মানে ! হিমাদ্রি বললে—যে স্বপন বিশ্বাসের নভেলের দৌলতে কাকাবাবু নতুন মানুষ···সে স্বপন বিশ্বাস···আসলে কে—জানো ?

—না, জানি না। কে এ-ভদ্রলোক ?

হেসে হিমাদ্রি বললে—ভদ্রলোক নয়···ভদ্রমহিলা এবং তিনি আমার স্ত্রী জয়দুর্গা দেবী !

—তার মানে ?

হিমাদ্রি বললে—আমিই কি জানতুম ! আজ সকালে উঠে চা খাচ্ছি··· হঠাৎ কাকাবাবু আর মালতী মাসি গিয়ে হাজির···জয়াকে দেখে কি আদর —খুব পছন্দ হয়েছে। হবে না ! বলেছি, এঞ্জেল ! আমাদের নিয়ে তখনি নিজের বাড়ীতে এলেন। দুজনেই বললেন—বাড়ীর ছেলে, বাড়ীর বৌ··· বাড়ীতে থাকবে !···

—হুঁ ! তার পর ?

—তার পর ক্যালামিটি ! হিমাদ্রি বললে—বাড়ীতে এসে মালতী মাসির ঘরের টেবিলে স্বপন বিশ্বাসের একগাদা নভেল দেখে জয়া বললেন,

আপনারা এঁর বই পড়েন ? দুজনেই বললেন, নিশ্চয় ! এমন উপন্যাস বাঙলায় আর নেই ! আমাদের ভেঙ্গেচুরে নতুন মানুষ করে গড়েছে এই সব নভেল ! তখন জয়া বললেন, এ-সব বই এত ভালো লাগে ? এ-সব আমার লেখা ! আমার রাশ-নাম স্বপ্নময়ী···নিজের নামটা একালের মতো নয়···এ-নামে লিখলে বিক্রী হবে না···তাই স্বপন বিশ্বাস নামে ছাপাই ।

অবনী একাগ্র মনোযোগে শুনছিল···সে বললে—তাহলে ?

হিমাদ্রি বললে—এ-কথা শুনে কাকাবাবু···ওঃ, হাউ ফিউরিয়স ! আমাকে বললেন, তোমার বন্ধু···সে বলে তার লেখা ! সে বলে, তার নাম স্বপন বিশ্বাস ! স্কাউণ্ড্রেল, ফ্রড···তাকে পুলিশে দেওয়া উচিত ।

অবনী তুললো হুঙ্কার—তোমার জন্য ! শুধু তোমার জন্য ! এখন—তুমি দিয়েছো আমার আসল পরিচয় ?

—পাগল ! তা পারি ? আমি বললুম, কিন্তু ওর নাম স্বপন বিশ্বাস । ওকে জিজ্ঞাসা করতে ও বলেছিল, ওর লেখা উপন্যাস । আমি বললুম, সত্য-মিথ্যা কি করে জানবো ! বাঙলা নভেল আমি পড়ি না, কাকাবাবু ।

—বাঃ, নিজে সাধু সেজে···লাভের মধ্যে তোমার ওখানে যাওয়া বন্ধ ! হায়রে, কাল আমাকে জিনিয়স বলে অত খাতির ! আর আজ ! অর্থাৎ তোমার হলো পৌষ মাস আর আমার সর্ব্বনাশ !

হিমাদ্রি বললে—সত্যি অবনী···বিয়ে করে ফ্যালো । জীবনটা কি বস্তু··· বিয়ে করলে তা বুঝবে । বিয়ের আগে পৃথিবী আমি দেখতুম, শূন্য···কোনো কিছুতেই মন বসতো না । আর এখন···আফটার মাই ম্যারেজ···পৃথিবীকে মনে হচ্ছে, পরম রমণীয় ! রবিবাবুর কবিতার সেই লাইনটা মনে পড়ছে— মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে ! বিয়ে করে ফ্যালো—বিয়ে···এ্যাণ্ড দেন ইউ উড নো লাইফ । একটি মাত্র স্ত্রী পৃথিবীকে স্বর্গ করে তোলে !

—নরকও করতে পারেন এই একটি মাত্র স্ত্রী !

তার পর যা হলো…বাস্তব জীবনে যা হওয়া সঙ্গত, স্বাভাবিক…নাটকে নভেলে অবশ্য এমন হয় না! তার কারণ, যাঁরা নাটক-নভেল লেখেন, তাঁদের কলম সর্ব্বদাই প্যাঁচ লাগাতে চায়…সহজ সিধা পথ ছেড়ে তাঁরা ঐ কলমের যাদুমন্ত্রে সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে চলে! একটা দৃষ্টান্ত দিলে পাঠক-পাঠিকা আমার এ-কথার অর্থ বুঝবেন। নভেলে যখন দেখি, অভিমানভরে নায়িকা বিষ পান করেছেন…তখন নায়ক তাঁর হাত ধরে ঘণ্টাদুই হা-হুতাশ করচেন, বাছা বাছা অনেক কথা বলচেন এবং দুজনের স্খলিত কণ্ঠে আবেগ নিঃশেষে ঝরে যাবার পর নায়িকা 'যাই' বলে মৃত্যুলোকে সরে পড়েন! অথচ বাস্তব জগতে এক্ষেত্রে নায়ক কি করে? বক্তৃতা করবার আগে একজন ডাক্তার আনিয়ে নায়িকাকে সারিয়ে তোলবার চেষ্টা করে…কিন্তু নাটক-নভেলের ক্ষেত্রে এমন সময়েও ডাক্তার ডাকাবার কারো খেয়াল থাকে না!

কিন্তু নাটক-নভেলের কথা থাক…এখানে যা ঘটেছিল, তাই বলি!

স্বপন বিশ্বাসের রহস্য স্যর বিদ্যুৎবরণের কাছে ফাঁশ হয়ে গেছে শুনে অবনীর দুঃখ যেমন হলো, আরামও হলো ঠিক ততখানি! দুঃখ হবার কারণ, তাকে ও-ভদ্রলোক ধাপ্পাবাজ বলে জানলেন! আরাম এই কারণে, স্বপন বিশ্বাসের পালা অভিনয় করতে ভবিষ্যতে তাকে আর গলদঘর্ম্ম হতে হবে না!

সব কথা শুনে জয়দুর্গা দেবীর ভারী মজা বোধ হলো। তিনি বললেন হিমাদ্রিকে—তোমার বন্ধু ভারী মজার মানুষ তো…রসজ্ঞান আছে। স্বপন বিশ্বাস না সাজলে তোমার ভবিষ্যতের পথ, কে জানে, কোনো দিন হয়তো খোলা পেতে না! তাঁর সঙ্গে আলাপ করে আসি ভালো করে…চলো।

এবং এই আলাপ করতে এসেই অভাবনীয় ভাবে অবনীর আর পূর্ণিমার জীবনে ঘটলো মস্ত পরিবর্ত্তন। এ-বাড়ীতে পূর্ণিমার সঙ্গে হলো জয়দুর্গার আলাপ-পরিচয়। বিন্দুবাসিনী এবং পিসিমার কাছে জয়দুর্গা দেবী শুনলেন এ-বাড়ীর সমস্যার কথা। পূর্ণিমার জন্য ভালো ভালো পাত্র আসছে…সে কিন্তু

ধনুর্ভঙ্গ পণ করে বসেছে, তাদের কাকেও না···কাকেও না! অবনীকে এঁদের পছন্দ এবং এঁদের বিশ্বাস, পূর্ণিমা চায় অবনীকে···কিন্তু অবনী কাঠখোট্টার মতো গোঁ ধরে বসে আছে—সে বিবাহ করবে না!

জয়দুর্গা দেবী নভেল লেখেন···বাস্তব জগতে বাস করেও অসঙ্গত অসম্ভব কল্পনা এবং অঘটন ঘটনা নিয়ে তাঁর কারবার। তিনি মনোরথে উঠে কল্পলোকে বিচরণ করলেন। পূর্ণিমার সঙ্গে নানাভাবে নানা কথা কয়ে তিনি জেনে নিলেন পূর্ণিমার অন্তরের কথা এবং জানবামাত্র তাঁর মাথায় যে-দীপ জ্বললো···সে-দীপের আলোয় এ-ব্যাপারের ভবিষ্যৎটুকু জলজলে দেখলেন।

তিনি এসে অবনীকে ডেকে বললেন—জানেন, আপনার জন্য এক নিরীহ তরুণী পলে পলে নিজেকে মরণের পথে এগিয়ে নিয়ে চলেছে?

কথা শুনে অবনী চমকে উঠলো···বললে—তার মানে?

মানে বুঝিয়ে দিলেন জয়দুর্গা। বাস্তবে কল্পনায় মিশিয়ে তিনি বুঝিয়ে দিলেন—জীবনটাকে অবনীর এমন করে কাটিয়ে চলা শুধু গর্হিত নয়··· অপরের পক্ষে অনিষ্টকর। বিয়ে করবার মধ্যে ভয়ের কিছু নেই···বিশেষ স্ত্রী যদি একান্ত অনুগামিনী হয়। পূর্ণিমাকে যদি অবনী বিবাহ করে, তাহলে অবনীর ভালো ছাড়া মন্দ হবে না··বিয়ে না করলে পূর্ণিমার জীবনটা একেবারে চুরমার হয়ে যাবে! তার উপর বিন্দুবাসিনী এবং পিসিমা··· তাঁদের পানে কেন চাইবে না অবনী? সে-চাওয়ায় যখন দেহে-মনে আঁচড় লাগবে না···অথচ নিজের শান্তি, আরাম···

অবনী বুঝলো···বললে—কিন্তু সদাশিব ডাক্তারের বিশ্বাস, আমি পাগল।

হেসে জয়দুর্গা বললেন—সে-পাগলামি সারাবার দাওয়াই তাঁর কন্যা পূর্ণিমা! জয়দুর্গা বললেন—শুনেছি, সেকালে মানুষ অনুরোধে পড়ে ঢেঁকি গিলতো···আর একালে এত লোকের এত অনুরোধে আপনি একটা বিশ-বাইশ বছরের মেয়েকে বিয়ে করতে পারবেন না···বিশেষ সে-মেয়ে যখন

রূপসী, বিদুষী, গান-বাজনায় দখল আছে এবং আপনাকে ভয়ঙ্কর ভালোবাসে —ভাইকে জলে চুবিয়ে মারছিলেন···তবু, তবু ভালোবাসে! এ থেকেও বুঝচেন না ওর হৃদয়ের দাম!

মুখ তুলে অবনী তাকালো জয়দুর্গার দিকে এবং একটা নিশ্বাস ফেলে বললে—পূর্ণিমাকে বিবাহ করতে হবে?

—হ্যাঁ···শক্ত কাজ নয় মোটে।

—সকলে সুখী হবেন?

—নিশ্চয়!

—আমি?

হেসে জয়দুর্গা দেবী বললেন—আপনার সুখশান্তি···তার আর সীমা থাকবে না! আপনার ভূত-ভবিষ্যং-বর্ত্তমান পূর্ণিমার আলোয় উজ্জ্বল হবে! তাহলে···

নিশ্বাস ফেলে অবনী বললে—আপনাদের সক[illegible] যখন ইচ্ছা—বেশ, তাই হোক!

জয়দুর্গা দেবী প্রায় ছুটে বেরিয়ে গেলেন।

অবনী চাইলো ঘরের দরজার দিকে···চোখে পড়লো পূর্ণিমা···দরজার ওদিকে দাঁড়িয়েছিল। অবনী ডাকলো—পূর্ণিমা···

পূর্ণিমা এলো···লজ্জায় তার মুখ রাঙা।

অবনী বললে—তাহলে তাই···এঁ্যা!

অবনী ধরলো তার একখানা হাত। পূর্ণিমা বললে—কি···তাই?

—শেষ পর্য্যন্ত···আমাকে···

হাত ছাড়িয়ে নিয়ে পূর্ণিমা বললে—আঃ···জয়াদি দেখে ফেলবে··· ছাড়ুন।

শেষ